শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.

সিরাত থেকে শিক্ষা

অনুবাদ
আবদুস সাত্তার আইনী

অনুবাদকের কথা

সিরাত থেকে শিক্ষা ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহ.-এর 'আল-ইবরাতু ফিস-সিরাতি' গ্রন্থটির অনুবাদ। এটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক রহমতে প্রকাশিত হয়েছিলো এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। এ-গ্রন্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, বিশেষ করে বদর যুদ্ধ ও ওহুদ যুদ্ধের আলোকে আফগান যুদ্ধের ঘটনাবলি বিবৃত হয়েছে। নবীজীবনের সঙ্গে আফগান যুদ্ধের কাহিনির যে-সাযুজ্য তা এক চমৎকার ভঙ্গিতে লেখক বর্ণনা করেছেন। সিরাতের ব্যাখ্যায় এটি অভিনব সংযোজন।

আমি গ্রন্থটি আরবি থেকে হুবহু বাংলা অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। যেখানে বক্তব্য ছিলো একেবারেই সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য, সেখানে আমি কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছি। বয়ানে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে এবং যেখানে প্রয়োজন মনে করেছি টীকা সংযোজন করেছি। আশা করি, এতে পাঠক উপকৃত হবেন।

আবদুস সাত্তার আইনী
২০ আগস্ট, ২০১৪
abdussattaraini@gmail.com

সূচি

বদর যুদ্ধ : এক ১১
জিহাদে কারামত ১৭
আতিকার স্বপ্ন ২৪
বদর যুদ্ধ : দুই ৩৩
সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ ৩৬
সা'দ বিন মুআয ছিলেন অনন্য দৃষ্টান্ত ৩৯
জিহাদের ময়দানে দোয়া ৪৩
বদর যুদ্ধ : তিন ৫৫
বুদ্ধিমানের পরামর্শ ৫৫
যুবক শ্রেণী ৫৮
মুসলিম সৈনিকের শত্রুর সারিতে ঢুকে পড়া ৫৯
মুখোমুখি লড়াই ৬৫
কাফের হয়েও বিশ্বস্ত ৬৭
ফেরেশতাদের যুদ্ধ ৭১
অহুদের যুদ্ধ : এক ৭৯
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের বের করে দিলেন ৮০
আবু সুফ্য়ানের পৌরুষ এবং বর্তমান মুসলিম শাসকদের পৌরুষ ৮১
আবু সুফ্য়ানের যুদ্ধ-প্রস্তুতি ৮৮
আফগানিস্তানে কারামত ৯০
অহুদ যুদ্ধ : দুই ৯৮
যুদ্ধের ঘটনাবলি ৯৯
নতুন বিপ্লবীদের অবস্থা ১০৫
সিরিয়ার দুর্দশা ১০৬
মিসরের দুর্দশা ১০৭
লিবিয়ার দুর্দশা ১০৯
সিরাত থেকে শিক্ষা : এক ১২৬
দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহর নীতিমালা ১২৬

তায়েফে যাত্রা ১২৮
আফগান জিহাদে আল্লাহর নীতিমালা ১৩৫
মার্কিন ষড়যন্ত্র ১৩৮
আফগান জিহাদের ভয় ১৪১
জিহাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা ১৪৬
মুসলমানরা সবাই এই জিহাদের অধিকারী ১৫১
সিরাত থেকে শিক্ষা : দুই ১৫৭
জিহাদের নিয়তের উপস্থিতি ১৫৯

বদর যুদ্ধ : এক

প্রিয় ভাইয়েরা, আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং বর্ষিত হোক আল্লাহপাকের রহমত ও বরকত। আমরা বদর যুদ্ধের ঘটনাবলি জানি এবং ইসলামের প্রথম যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে থাকি। এই বদর যুদ্ধকে আল্লাহপাক يوم الفرقان বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সকল মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহপাক এই দিনকে নিপীড়িত-নির্যাতিতদের বিজয়ের জন্যে এবং অহঙ্কারী ও প্রতাপশালীদের ধ্বংস করার জন্যে নির্ধারণ করেছিলেন। এই যুদ্ধ ছিলো আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং এর রহস্য ছিলো অনুদ্‌ঘাটিত। আল্লাহপাক এই যুদ্ধকে মানুষের মাধ্যমে সংঘটিত করেছেন। বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহপাক কুরআনে বলেছেন—

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘স্মরণ করো, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে আর তারা ছিলো দূর প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিলো তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে।[১] যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাইতে তবে এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হতো। কিন্তু যা ঘটার ছিলো আল্লাহপাক তা সম্পন্ন করলেন[২]—যাতে যে ধ্বংস হবে সে যেনো সত্যাসত্য প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেনো সত্যাসত্য প্রকাশের পর জীবিত থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’ [সুরা আনফাল : আয়াত ৪২]

আমাদের রবই যুদ্ধের বিষয়গুলো সাজিয়ে দেন। তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাবলি পরিচালনা করেন। আল্লাহপাক তাঁর সৈন্যদেরকে সাহায্য করেন। তাঁদের সঙ্গে থাকে পাথর, সঙ্গে থাকে বৃষ্টি, সঙ্গে থাকে তীর, স্বপ্ন ও তন্দ্রা। আল্লাহপাক এগুলোকে তাঁদের বিজয়ের উপকরণ বানান।

---

[১] বদর উপত্যকার যে-প্রান্তটি মদিনার নিকটবর্তী তা নিকট প্রান্ত। আর বিপরীত দিক, যে-দিকে কাফের দল ছিলো তা দূর প্রান্ত। অন্যদিকে নিম্নভূমি দিয়ে অর্থাৎ লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী পথ দিয়ে মক্কার বিধর্মীদের বাণিজ্যিক কাফেলা চলে যাচ্ছিলো।

[২] অর্থাৎ উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করলেন।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

'স্মরণ করো, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তির জন্যে তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন—তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্যে, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্যে, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্যে এবং তোমাদের পা অটল রাখার জন্যে।' [সুরা আনফাল : আয়াত ১১]

[বদর রণাঙ্গনে কিছু সময়ের জন্যে মুসলিম বাহিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। এতে তাঁদের ক্লান্তি ও ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়। যুদ্ধের শুরুতে বৃষ্টি হয়, ফলে বালুময় মাটি স্থির হয় এবং মুসলমানদের ময়দানে চলাফেরার অসুবিধা ও পানির কষ্ট দূর হয়।]

তন্দ্রা তাহলে স্বস্তি। নামাযের মধ্যে তন্দ্রা নিন্দনীয়, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে তন্দ্রা প্রশংসিত। বোমাবর্ষণ, গোলানিক্ষেপ, কামানের গর্জন আর বোমারু বিমানের চিৎকারে মানুষ কীভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে পারে! এই ধরনের ঘটনা আফগানিস্তানে অনেকবার ঘটেছে। মৌলবি আরসালান এবং আরো অনেকেই যুদ্ধের ময়দানে তাঁদের ঘুমিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার পর প্রতিটি সৈনিক নতুন সাহসে নতুন উদ্দীপনায় জেগে ওঠে। ভাই ওসামা বিন লাদেন জাজি[৩] যুদ্ধের ময়দানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর হাতে ওয়াকিটকি ছিলো। ঘুমিয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর হাত থেকে ওয়াকিটকি পড়ে যায়। সেই মুহূর্তে পুরো দমে যুদ্ধ চলছিলো। গোলাবর্ষণ চলছিলো এবং শত্রু কমান্ডোরা দুইশো কি তিনশো মিটার দূরে ছিলো। সেই মুহূর্তে ওসামা বিন লাদেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং তখন বৃষ্টি পড়ছিলো। আল্লাহপাক কুরআনে কতো সত্যই না বলেছেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন পবিত্র করার জন্যে...। এবং এতে আত্মাও প্রশান্তি ফিরে পায়। কেননা বদর যুদ্ধে কতিপয় সাহাবির ওজুর বদলে ফরয গোসলের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু তাঁদের নিকট পানি ছিলো না। তাই আল্লাহপাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণ করেন। এই কুমন্ত্রণা মানুষের ভেতরের কুমন্ত্রণা যা মানুষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। এবং এই বৃষ্টির পানির মাধ্যমে তিনি তাঁদের পা অটল

---

[৩] পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী একটি এলাকা। এখানে ১৯৮৭ সালের ২০ শে মে থেকে ১৩ই জুন পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। এ-যুদ্ধে মুজাহিদদের পক্ষে নেতা ও কমান্ডার ছিলেন জালালুদ্দিন হক্কানি, মুহাম্মদ আনোয়ার ও আবদুল্লাহ আয্যাম এবং সোভিয়েত বাহিনীর পক্ষে নেতা ও কমান্ডার ছিলেন বরিস গ্রোমভ, গর্ভাচেভ, নাজিবুল্লাহ ও মুহাম্মদ রফি। এখানে বহু রুশ সেনা হতাহত হয়। এই যুদ্ধ জাজির যুদ্ধ নামে পরিচিত।

রাখেন। কেননা দেহ ও মন যখন সব দিক দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকে, তখন মানুষের আত্মার শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। তাঁর সংকল্প সুদৃঢ় হয়ে ওঠে এবং তিনি তা বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যান। আপনি কি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন নি যখন আপনি নামায পড়েন এবং পবিত্র অবস্থায় থাকেন অথবা রাত জেগে আল্লাহর ইবাদত করেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করেন তখন আপনার আত্মার শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যায়? সাধারণ অবস্থায় এই শক্তি আপনার ভেতর থাকে না এবং আপনি এতে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মতো ধৈর্য অর্জন করেন না।

বদর যুদ্ধে ফেরেশতারাও মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

'স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং তোমরা মুমিনদেরকে অবিচল রাখো। যারা কুফরি করে আমি তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দেবো; সুতরাং তোমরা আঘাত করো তাদের কাঁধে এবং আঘাত করো তাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে।' [সুরা আনফাল : আয়াত ১২]

আল্লাহপাক বললেন যে, তিনি নিজেই তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেন। ভয় আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে এক ধরনের আক্রমণ, এক ধরনের গোলা। এই গোলা কাফেরদের অন্তরে আঘাত করে এবং তাদের অভ্যন্তরকে তছনছ করে দেয়। তাদের চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, মগজকে এলোমেলো করে দেয় এবং তা তাদের পরাজয়ের এবং পালিয়ে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহপাক বলছেন, আমি তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দেবো তাহলে তোমরা কী করবে? তোমাদের কাজ হচ্ছে তাদের কাঁধে এবং তাদের আঙ্গুলের ডগায় আঘাত করা। এই আঙ্গুলগুলো, যেগুলো তরবারি ধরে রাখে, তোমরা তাদের সে-আঙ্গুলগুলো কেটে দাও। তোমরা আর কী করবে? হ্যাঁ, যুদ্ধের ময়দানে আরো করণীয় রয়েছে।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করো নি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। আর এটা মুমিনদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করার জন্যে।' [সুরা আনফাল : আয়াত ১৭]

তাহলে কেনো আল্লাহপাক এগুলো করেন? কেনো তিনি যুদ্ধের ঘটনাগুলো মানুষের হাত দিয়ে সংঘটিত করেন? কারণ তিনি মুমিনদেরকে উত্তমরূপে

পরীক্ষা করতে চান। যাতে কেউ না বলে আমিই লড়াই করেছি। যাতে কেউ না বলে আমিই বিজয়ী হয়েছি। আমি এই আমি সেই। বরং এই ঘটনাগুলো মহাপরাক্রমশালী সত্তা মানুষের মাধ্যমে ঘটিয়ে থাকেন। মানুষ এখানে মাধ্যমমাত্র; তার মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত বিষয় বাস্তবায়িত হয়। তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করো নি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ চলাকালে একমুঠো কঙ্কর নিলেন। তিনি কঙ্করগুলো শত্রুদের চেহারায় ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, شاهت الوجوه , شاهت الوجوه বা চেহারা ধূলিধূসরিত হোক, চেহারা ধূলিধূসরিত হোক। ফলে কী ঘটলো? প্রতিটি মুশরিকের চোখে কঙ্কর ও ধুলোবালি প্রবেশ করলো। কীভাবে এটা ঘটলো! একমুঠো কঙ্কর এক হাজার মুশরিকের চোখে কীভাবে প্রবেশ করলো! আর আফগান যুদ্ধে জালাল উদ্দিন হক্কানির জামাতা খিয়াল মুহাম্মদের একমুঠো কঙ্কর কীভাবে আশিটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করলো! আল্লাহপাক কতো সত্যই না বলেছেন, তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করো নি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।

শত্রু বাহিনী আশিটি ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে খিয়াল মুহাম্মদের দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তাঁদের দলে ছিলেন মাত্র চল্লিশ জন মুজাহিদ। তাঁদেরকে জীবিত ধরার জন্যে ট্যাঙ্কগুলো এগিয়ে আসছিলো। খিয়াল মুহাম্মদ বলেন, 'আমরা যোহরের নামায আদায় করলাম। অনেক কান্নাকাটি করলাম। আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করে বললাম, তিনি আমাদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে যেনো বিজয়ী না করেন। আমাদের দিকে তাদের পথকে যেনো সুগম না করেন। আমাদেরকে ধরা তাদের পক্ষে যেনো সম্ভব না হয়।' মুহাম্মদ বলেন, 'তারপর আমি একমুঠো কঙ্কর নিলাম এবং কঙ্করগুলো ধাবমান ট্যাঙ্কগুলোর দিকে ছুঁড়ে মারলাম।' তিনি একমুঠো কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। একমুঠো কঙ্কর কী করবে আশিটি ট্যাঙ্কের? সেগুলোকে বিকল করে দেবে? কী করবে মাত্র একমুঠো কঙ্কর? তিনি বলেন, 'ট্যাঙ্কগুলো যে রাস্তা দিয়ে আসছিলো সেটি ছিলো সরু ও এবড়ো-খেবড়ো। প্রথম ট্যাঙ্কটি এগিয়ে আসছিলো এবং হঠাৎ তা উল্টে গেলো। আমরা বুঝতেই পারি নি কীভাবে তা উল্টে গেলা। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটির ওপর আমরা কাঁচ নিক্ষেপ করলাম। ট্যাঙ্কের চালক ভাবলো ট্যাঙ্কের নিচে মাইন পড়েছে। তাই সে তার ট্যাঙ্ক মাঝপথ থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু মাঝপথ থেকে সরে গিয়ে ট্যাঙ্কটি ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলো না। ফলে ট্যাঙ্কটি রাস্তার পাশে কাত হয়ে পড়লো এবং চলাচলে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। অন্যান্য ট্যাঙ্ক ও

যুদ্ধযানের জন্যে পথ বন্ধ হয়ে গেলো। তখন কী ঘটলো? একটি ট্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য ট্যাঙ্কের সবাই বেরিয়ে এলো, সাদা পতাকা বের করলো এবং আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত উঁচু করলো। কীভাবে এটা ঘটলো? মুজাহিদদের নিকট তো ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কোনো কামান ছিলো না, অস্ত্র ছিলো না এবং কিছু ছিলো না। শুধু একমুঠো কঙ্কর। বিশাল অভিযানের বিরুদ্ধে মাত্র একমুঠো কঙ্কর।

ভাবতে কী আশ্চর্য লাগে! কিন্তু সত্য তো এই-ই। আল্লাহপাক তো অসত্য বলেন না এবং অনর্থক প্রতিশ্রুতি দেন না। খিয়াল মুহাম্মদ বলেন, 'আফগানিস্তানে মুজাহিদদের কাছে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কোনো কামান ছিলো না, গোলা ছিলো না। তখন আমরা একটি ট্যাঙ্কে পঁয়ত্রিশটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী গোলা ও এক হাজারটি বোমা পেলাম।'

এটা কী করে হলো? মানুষ আসলে কী করতে পারে? মানুষ কেবল মাধ্যম; সে মাধ্যম হিসেবেই কাজ করতে পারে। বিশ্বজগতের প্রতিপালক মানুষের মাধ্যমে তাঁর পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেন। আর আল্লাহপাক মানুষকে এভাবেই সম্মানিত করেন। বলা হয় এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, অমুক আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করেছেন, আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করেছেন। অমুক আফগানিস্তানে জিহাদ করেছেন এবং অমুক আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করেছেন। অমুক বিশটা কমিউনিস্টকে হত্যা করেছেন, তাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তারাই কি কমিউনিস্টদের হত্যা করেছেন? না, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহপাক তাদেরকে হত্যা করেছেন। আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ বছর পূর্বে আল্লাহপাক এই সিদ্ধান্ত লিখে রেখেছিলেন। তিনি লিখে রেখেছিলেন যে, কমিউনিস্ট রহমত গুল আবু শাবাবের হাতে নিহত হবে। হ্যাঁ, এমনই লিখিত ছিলো। আপনারা কেবল মাধ্যম এবং সেসব সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নকারী। আল্লাহপাক আপনাদের মাধ্যমেই তাঁর সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপ দেন এবং আপনাদের সম্মানিত করেন। যেহেতু আপনারা ইসলামের পতাকা ধারণ করেন এবং দীনকে সমুন্নত রাখেন। বলা হয়, অমুক বিজয়ী হয়েছেন। আসলে আল্লাহপাকই তাঁকে বিজয়ী করেছেন এবং শত্রুদের ধ্বংস করেছেন।

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

'বিজয় কেবল মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১২৬]

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ

'আল্লাহপাক তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া

আর কে এমন আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে?' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬০]

এবং যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যসংখ্যা কমবেশি মনে হওয়াও আল্লাহপাকের কুদরত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের দৃষ্টিতে কাফেরদের সংখ্যা কম মনে হয়েছে এবং কাফেরদের চোখে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি মনে হয়েছে। আবার উভয় দলই উভয় দলকে কম সংখ্যক দেখেছে। কেনো এমনটি হয়েছে? যাতে আল্লাহপাক তাঁর অঙ্গীকার বাস্তব করতে পারেন।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

'স্মরণ করুন, আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে তারা সংখ্যায় অল্প। যদি আপনাকে দেখাতেন যে তারা সংখ্যায় অধিক তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ-বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত।' [সুরা আনফাল : আয়াত ৪৩]

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

'স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরে সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন, যা ঘটার ছিলো তা সম্পন্ন করার জন্যে। সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।' [সুরা আনফাল : আয়াত ৪৪]

ঘটনাবলি কার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়? হ্যাঁ, আল্লাহর দিকে। চূড়ান্তরূপে কে সব ঘটনা ঘটান? আল্লাহ। অমুক বিচারক, অমুক শায়খ, অমুক আমির, অমুক নেতা—কী করেন তাঁরা? তাঁরা কি আল্লাহপাকের সিদ্ধান্তকে রহিত করতে পারেন? আল্লাহপাক যদি লিখে রাখেন, আপনি তাঁদের কাছে কোনো উচ্চ মর্যাদার পদ পাবেন তাহলে তাঁরা না চাইলেও আপনি আপনার পদ পাবেন। তাঁরা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়েও কোনো কিছু করতে পারবেন না। আল্লাহপাক সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, আপনি মর্যাদাশীল পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং আপনার পদে বহাল থাকবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে আপনার অজান্তেই সব ব্যবস্থাপনা পাল্টে যাবে। আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না কীভাবে কী হচ্ছে। হ্যাঁ, সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। আপনার হাতেও কোনো কিছু নেই, আমার হাতেও কোনো কিছু নেই।

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

'তোমাদের খেয়াল-খুশি ও কিতাবিদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কোনো কাজ হবে না। কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে এবং আল্লাহ ছাড়া সে নিজের জন্যে কোনো অভিভাবক বা সহায় পাবে না।' [সুরা নিসা : আয়াত ১২৩]

সবকিছুর রাজত্ব আল্লাহর হাতে এবং সকল বিষয় তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। সে-কারণেই আফগানিস্তানের এইসব ঘটনা—যা আপনি শুনছেন—বাস্তব ও সত্য। সেখানে যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

জিহাদে কারামত

আফগানিস্তানে জিহাদের ময়দানে এভাবেই কারামত প্রকাশ পেয়েছে। আপনি যদি সেই জিহাদের ময়দানে গিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় কিছু না কিছু দেখেছেন। মৌলবি আরসালান আমাকে বলেছেন, 'আমাদের সঙ্গে একজন ছিলো তার নাম ছিলো বাতুর। আমি তাকে গোলা নিক্ষেপ করতেই দেখতাম। কিন্তু তখন আমাদের কাছে ছয়টির বেশি গোলা ছিলো না। হঠাৎ শত্রু বাহিনীর ট্যাঙ্ক আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসলো। আমরা প্রথম গোলাটি নিক্ষেপ করলাম এবং তা বাতাসে বিস্ফোরিত হলো, দ্বিতীয় গোলাটি নিক্ষেপ করলাম এবং সেটিও বাতাসে বিস্ফোরিত হলো । এভাবে তৃতীয়টি... চতুর্থটি এবং পঞ্চমটি। আল্লাহপাক আমাদেরকে প্রতিদান দিয়েছেন; আমাদের পাঁচটি গোলাই বিফলে গেলো।'

আসলে আমাদের সঙ্গে যারা ছিলো তাদের অধিকাংশরই যুদ্ধের ভালো প্রশিক্ষণ ছিলো না। তারা কেউ সামরিক কলেজ থেকে আসে নি। মসজিদের ইমাম ক্যাপ্টেন হয়েছেন, জেনারেল হয়েছেন। হ্যাঁ, আহমদ শাহ মাসউদ[৪]

---

[৪] আহমদ শাহ মাসউদ ১৯৫৩ সালের ২রা জানুয়ারি পানশিরের জানকালাক এলাকার বাজারাক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা দোস্ত মুহাম্মদ খান আফগান রয়্যাল আর্মিতে কর্নেল ছিলেন। আহমদ শাহ কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশলবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পশতু ছাড়াও ফরাসি, ফার্সি, উর্দু ভালো বলতে পারতেন এবং ইংরেজি ভালো পড়তে পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাককালীন জমিয়তে ইসলামির ছাত্র সংগঠন সযমান-ই জোওয়ানান-ই মুসলমান (Organization of Muslim Youth)-এ যুক্ত হন। তখন জমিয়তে ইসলামির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক বুরহান উদ্দিন রব্বানি। ১৯৭৫ সালের দিকে জমিয়তে ইসলামি ও গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন হিযবে ইসলামির মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এ-সময় হিযবে ইসলামির কর্মীরা আহমদ শাহকে হত্যা করার চেষ্টা করে। ১৯৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব আফগানিস্তান (মার্ক্সবাদী) এবং সেনাবাহিনীর একটি দল প্রেসিডেন্ট দাউদ খানকে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। তারা

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলবিদ্যার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। এখন তিনি রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। 'ইঞ্জিনিয়ার' বশির প্রকৌশলবিদ্যার প্রথম বর্ষ শেষ করে রুশদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। হেকমতিয়ার কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলবিদ্যা বিভাগে মাত্র দেড় বছর

সমাজতন্ত্রের বিস্তার এবং সেভাবে নীতি নির্ধারণ করতে চাইলে দেশের ইসলামি দলগুলোর সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ-সময় সমাজতন্ত্রী সেনাদের হাতে সারাদেশে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ মানুষ নিহত হয়। ১৯৭৯ সালে ২৪টি প্রদেশে সংঘাত শুরু হয়। অর্ধেকের বেশি সৈনিক সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যায়। ৬ই জুলাই আহমদ শাহ মাসউদ পানশিরে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সম্মুখ যুদ্ধে সফল না হয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। এ-বছরেই ২৪ শে ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগান সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সেনা প্রেরণ করে। সরকারবিরোধীদের তারা নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। আহমদ শাহ সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং প্রতিরোধ যুদ্ধের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৮৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রুশ বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগ করে। তারপরও পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সরকার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। আহমদ শাহ মাসউদ সরকারবিরোধী লড়াই অব্যাহত রাখেন। দেশে চরম দুরবস্থা বিরাজমান রেখে ১৯৯২ সালে ১৭ই এপ্রিল এ-সরকার ক্ষমতা ত্যাগ করে। ২৪ শে এপ্রিল পেশোয়ারে সমাজতন্ত্রবিরোধী দলগুলোর মধ্যে শান্তি ও ক্ষমতাবণ্টন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ-চুক্তিতে আহমদ শাহ মাসউদকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু হেকমতিয়ার এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন। পরে অবশ্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৭ শে সেপ্টেম্বর তালেবান ক্ষমতা দখল করে। এ-সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন জমিয়তে ইসলামির বুরহান উদ্দিন রব্বানি এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হিযবে ইসলামির গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার। তালেবান ক্ষমতা দখলের পর প্রেসিডেন্ট হন মোল্লা মুহাম্মদ উমর এবং প্রধানমন্ত্রী হন মোল্লা বুরহান উদ্দিন। আহমদ শাহ মাসউদ তখনো প্রতিরক্ষামন্ত্রী। কিন্তু হেকমতিয়ার ও তালেবান নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ অব্যাহত ছিলো এবং তিনি তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। যদিও তাঁরা উভয়ই তালেবান সরকারবিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটে ছিলেন।

২০০১ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর (টুইন টাওয়ারে হামলার মাত্র দুই দিন আগে) উত্তর আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশে খাজা বাহাউদ্দিন এলাকায় এক আত্মঘাতী হামলায় আহমদ শাহ মাসউদ নিহত হন। এই হামলার জন্যে আল-কায়েদাকে অভিযুক্ত করা হয়। কারণ ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিলো। এর আগে বহুবার কেজিবি, আইএসআই, আফগান কমিউনিস্ট কেএইচএডি, তালেবান ও আল-কায়েদা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সেসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর জন্মস্থান বাজারাকেই তাঁকে দাফন করা হয়।

কমিউনিস্টবিরোধী যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার জন্যে তাকে 'শেরে পানশির' বা পানশিরের সিংহ নামে ডাকা হয়। তিনিই একমাত্র আফগান নেতা যিনি কখনো আফগানিস্তানের বাইরে থাকেন নি। ২০০১ সালে হামিদ কারজাইর সরকার তাঁকে 'আফগানিস্তানের জাতীয় বীর' উপাধিতে ভূষিত করে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক। তাঁর স্ত্রী সাদিকা মাসউদ ২০০৫ সালে ফরাসি ভাষায় রচিত তাঁর *Pour l'amour de Massoud* (মাসউদের ভালোবাসার জন্যে) গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এতে তিনি প্রিয়তম স্বামীর ব্যক্তিজীবনের বর্ণনা দেন।

ছিলেন। তারপর তিনি রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাঁদের কেউ কি সামরিক কলেজ থেকে বেরিয়েছেন? না, তাঁরা কেউ সামরিক কলেজ থেকে পাশ করেন নি। শায়খ জালাল উদ্দিন কোন সামরিক কলেজ থেকে পাশ করেছেন? তিনি তো মসজিদ থেকে এসেছেন। তিনি কোনো এক মসজিদের ইমাম ছিলেন। এঁরা সবাই দীনি মাদরাসার শিক্ষক বা ছাত্র ছিলেন। আল্লাহপাক তাঁদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাঁরা রুশ বাহিনীর মোকাবেলা করবে। তাই তাঁরা এখন জেনারেল হয়ে গেছেন। এখন তাঁদের কাউকে কাউকে রুশ সেনাবাহিনী জেনারেল বলে সম্বোধন করে। জেনারেল অমুক, জেনারেল তমুক।

আরসালান বলেন, 'আমাদের পাঁচটি গোলাই বাতাসে বিস্ফোরিত হলো এবং বিফলে গেলো। একটি মাত্র গোলা আমাদের হাতে রইলো এবং আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমি বাতুরকে বললাম, তুমি এই গোলাটি নিক্ষেপ করবে না, এটি রেখে দাও। আমরা দুই রাকাত 'সালাতুল হাজাত' পড়ে *আল্লাহর কাছে দোয়া করবো। তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর করো। তারপর* আমরা দুই রাকাত নামায আদায় করলাম এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। বাতুর আমাকে জিজ্ঞেস করলো, বহরের কোন গাড়িটির ওপর এই গোলা নিক্ষেপ করবো। আমি তাকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, তুমি ওই বেসামরিক গাড়িটির ওপর গোলাটি নিক্ষেপ করো। সে বললো, কেনো? আমি বললাম, আমরা ঐ বেসামরিক গাড়িটিকে জ্বালিয়ে দেবো। গাড়ির মালিক গাড়িটিকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয় এতে রহস্য রয়েছে। বাতুর গোলাটি রিক্ষেপ করলো এবং তা ঐ বেসামরিক গাড়িটির ওপর গিয়ে পড়লো। আসলে ঐ বেসামরিক গাড়িটির সঙ্গে একটি লরি ছিলো এবং তাতে বোঝাই করা ছিলো গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক। গোলা নিক্ষেপের ফলে গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক দ্রব্য একসঙ্গে জ্বলে উঠলো এবং ভয়াবহভাবে বিস্ফোরিত হলো। লরির গোলাবারুদ ছিটকে গিয়ে অন্যান্য জায়গায় পড়তে লাগলো।' আপনি ভাবুন তো এতে কতোটি ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রবাহী যান ধ্বংস হয়েছে? আরসালান আমাকে বলেছেন এবং তিনি সত্যই বলেছেন, 'একটি গোলার আঘাতে আশিটি ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রবাহী যান ধ্বংস হয়েছে।' এটা তো মানুষের কাজ নয়।

এক মুহূর্তে শত্রু দলটির সব শক্তি ধ্বংস হয়ে গেলো। আরসালান আমাকে বলেন, 'ট্যাঙ্কগুলো আমাদেরকে জীবিত ধরার জন্যে এগিয়ে আসছিলো। তখন আমরা আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করলাম, কান্নাকাটি করলাম। আমরা দোয়া করলাম, তিনি যেনো আমাদের ওপর শত্রুদেরকে চাপিয়ে না দেন এবং তারা যেনো আমাদেরকে জীবিত ধরতে না পারে।' আরসালান বলেন, 'আফগান যুদ্ধের ময়দানে আমরা শত্রু বাহিনীর ট্যাঙ্কের ওপর গোলা

বিস্ফোরিত হতে দেখতাম। কিন্তু সেগুলো কোন ধরনের গোলা ছিলো তা আমরা জানতাম না। আমরা ছাড়া সেখানে আর কোনো মানুষও ছিলো না। কারা এইসব গোলা নিক্ষেপ করতো তাও আমরা জানতাম না। জিহাদের শুরুর দিকে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। আমরা ছাড়া ময়দানে আর কেউ নেই, অথচ শত্রু বাহিনীর ট্যাঙ্কের ওপর গোলা বর্ষিত হচ্ছে।'

আল্লাহপাকই শত্রুদের ট্যাঙ্কগুলো ধ্বংস করেছেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেছেন। মুজাহিদদের কাছে একটিও ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান নেই, অথচ তাঁরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। কীভাবে এটা সম্ভব হলো? হ্যাঁ আল্লাহ তো সত্যই বলেছেন, 'তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করো নি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।' কখনো কখনো একটিমাত্র গুলি ট্যাঙ্কের দেয়াল ভেদ করে ট্যাঙ্কের ভেতর চালককে আঘাত করেছে এবং চালক নিহত হয়েছে। ফলে ট্যাঙ্কটি মুজাহিদদের হস্তগত হয়েছে। একটি গুলি কীভাবে ট্যাঙ্কের দেয়াল ভেদ করলো? কী আজিব! হায় আল্লাহ, কীভাবে এটা সম্ভব!

গুল মুহাম্মদ একবার রাতের বেলা মুজাহিদদের ঘাঁটিতে ফিরছিলেন। রাতের অন্ধকারে তিনি পথ হারিয়ে ফেললেন। হঠাৎ তিনি এক জায়গায় আলো দেখতে পেলেন এবং সেখানে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। আসলে সেটা ছিলো কমিউনিস্ট রুশ সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। রুশ সেনা কমান্ডার তাঁকে ধরে ফেললো এবং বললো, আমরা তোমাকে হত্যা করবো। গুল মুহাম্মদ বললেন, করো হত্যা! রুশ কমান্ডার বললো, তার আগে আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। গুল মুহাম্মদ বললেন, সমস্যা নেই, প্রশ্ন করো। রুশ কমান্ডার বললো, কীভাবে তোমাদের ছোটো একটি গুলি আমাদের ট্যাঙ্ক ভেদ করে? গুল মুহাম্মদ বললেন, শুধু একটি গুলিই নয়, আমরা যদি তোমাদের ট্যাঙ্কের ওপর একটি পাথরও নিক্ষেপ করি তবু তা তোমাদের ট্যাঙ্ক ভেদ করবে। রুশ কমান্ডার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় নি। সে বললো, ঠিক আছে। এখানে ট্যাঙ্ক আছে, দেখি তুমি কী করতে পারো। সে সৈনিকদের একটি ট্যাঙ্ক নিয়ে আসার জন্যে নির্দেশ দিলো। সৈনিকরা ট্যাঙ্ক বাইরে নিয়ে এলো। রুশ কমান্ডার গুল মুহাম্মদকে বললো, এবার যাও, পাথর নিক্ষেপ করো, আমরা দেখি কীভাবে তোমার পাথর ট্যাঙ্ক ভেদ করে। গুল মুহাম্মদ বললেন, আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দাও। রুশ কমান্ডার বললো, ঠিক আছে, নামায পড়ে নাও। গুল মুহাম্মদ দুই রাকাত নামায পড়লেন এবং অনেকক্ষণ সেজদায় পড়ে থাকলেন। তিনি দোয়ায় বললেন, হে রব, হে আল্লাহ, তুমি জানো আমাদের গুলি ট্যাঙ্ক ভেদ করতে পারে না, আমাদের মাটির ঢিল বা পাথরও ট্যাঙ্ক ভেদ করতে পারে না। আমরা তোমার শত্রুদেরকে ভয় দেখানোর

জন্যেই এই কথা বলেছি। হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে লজ্জা দিয়ো না, আমাদেরকে হেয় করো না। হে আল্লাহ, তুমি মুজাহিদদেরকে হেয় করো না। তিনি আরো অনেক কিছু বললেন, কাকুতি-মিনতি করলেন এবং দোয়া দীর্ঘ করলেন। তারপর সালাম ফেরালেন। একমুঠো কঙ্কর ও মাটি নিলেন। তিনবার বিসিমিল্লাহ পড়লেন এবং হাতের কঙ্কর ও মাটি ট্যাঙ্কের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঙ্কে আগুন ধরে গেলো। হ্যাঁ, সত্যসত্যই ট্যাঙ্কে আগুন ধরে গেলো। রুশ কমান্ডার বললো, ঠিক আছে তুমি এখন নিরাপদে চলে যাও, তা না হলে ট্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদেরকেও জ্বালিয়ে দিতে পারো। সম্মানের সঙ্গেই তারা গুল মুহাম্মদকে ছেড়ে দিলো। আমি জানি না, তারা তাঁকে কালাশনিকভ দিয়েছিলো কি-না এবং অভিবাদন জানিয়েছিলো কি-না। তারা তাঁকে বললো, তুমি নিরাপদে চলে যাও। আমরা যেভাবে আছি সেভাবেই থাকবো। আমরা শিরকের সঙ্গেই থাকবো। শিরকই আমাদের জন্যে যথেষ্ঠ। আল্লাহ তো সত্যই বলেছেন, 'তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করেছেন।'

আমার ভাইয়েরা, আসলে আফগানিস্তানে যা ঘটেছে, মানবমস্তিষ্ক তা কবুল করবে না। আসলে আফগান যোদ্ধাদেরকে কেউ সহায়তা করে নি। আরবরা তাদেরকে চার বছর পর চিনেছে। ১৯৮২ বা ১৯৮৩ সালের পর আরবরা তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছে। আরবরা তাদেরকে কী দিয়েছে? কী দিয়েছে আরবরা তাদেরকে? আমার মনে হয়, ১৯৮৩ সালের দিকে তাদেরকে দশ মিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছিলো। কী মূল্য আছে দশ মিলিয়ন ডলারের? যেখানে রুশ বাহিনী প্রতিদিন খরচ করেছে ৪৩ মিলিয়ন ডলার। আর মুজাহিদরা পাঁচ বছরে পেয়েছেন মাত্র দশ মিলিয়ন ডলার। এটা কেমন ব্যাপর? আপনি যদি রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের বিজয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর কুদরত ও তাঁর বড়ো বড়ো কারামত—যা এই শতাব্দীতে আফগানিস্তানে ঘটেছে—বুঝতে চান, তাহলে আপনাকে আফগান যুদ্ধকে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করতে হবে। ইরাক-ইরান যুদ্ধ আরবের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। তারা যখন যুদ্ধে যোগ দেয় তখন তাদের কাছে ছিলো প্রায় ৫৫ বিলিয়ন ডলার। আরবরা তাদেরকে প্রদান করে প্রায় ৫৪ বিলিয়ন ডলার। আর এখন তাদের ওপর ঋণ রয়েছে ৫৩ বিলিয়ন ডলার। টাকার এই অঙ্ক কি আপনার বিশ্বাস হয়? গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এখন পর্যন্ত ইরাক-ইরান যুদ্ধে যে কাল্পনিক অঙ্কের টাকা খরচ হয়েছে তা এক লাখ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। কী তারা করেছে? ব্যর্থতা ছাড়া তো তাদের কিছু অর্জিত হয় নি। কুয়েতের জন্যে অবশ্য দুটি আনন্দের বিষয় আছে। ইরাকের বিজয়ও তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কী তারা করেছে?

নয় বছর যুদ্ধ করার পরও কেউ নয় কিলোমিটারও এগিয়ে যেতে পারে নি। এরাও পারে নি, ওরাও পারে নি। পশ্চিমাদের এমন কোনো অস্ত্র নেই যা তারা তাদের ভূমিতে ব্যবহার করে নি। কেনো তারা এটা করেছে? ইরাক-ইরানের যুদ্ধ গোটা পৃথিবীর অর্থনীতিকে নাড়া দিয়েছে। আর এই আফগান মুজাহিদরা আল্লাহর মিসকিন। তাঁদের তো কিছুই নেই। তাদেরকে একটা মিসাইল বা একটা ক্ষেপণাস্ত্র দিলে সারা দুনিয়ার কী ক্ষতি হয়ে যায়? একটিমাত্র মিসাইল, একটিমাত্র ক্ষেপণাস্ত্র দিলে কী ক্ষতি হয় তাদের? এতে কি দুনিয়ার অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায়? একটা ক্ষেপণাস্ত্রের দাম কতো? ৭০ হাজার ডলার।

আল্লাহর মুজিযা বা বড়ো কারামত—যেগুলো আফগানিস্তানে সংঘটিত হয়েছে—মানুষের জ্ঞানের পক্ষে কবুল করা সম্ভব নয়। রাশিয়া পরাজিত হয়ে আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে না যেতো, গোটা দুনিয়া যদি রাশিয়ার লাঞ্ছনা, বিপর্যয়, পরাজয় আর ব্যর্থ হয়ে হয়ে পালিয়ে যাওয়া না দেখতো তাহলে তারা এইসব মুজিযা আর কারামত বিশ্বস করতো না। আল্লাহই নির্ধারিত বিষয় বাস্তবায়িত করেন। যার সঙ্গে আল্লাহ নেই সেই বড়ো মিসকিন। আল্লাহর কসম, আল্লাহপাক কতো সত্যই না বলেছেন—

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ

'আল্লাহপাক তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া আর কে এমন আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে?' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬০]

আল্লাহপাক তাঁদেরকে সাহায্য করলে কে তাঁদেরকে পরাজিত করবে? আমেরিকা, রাশিয়া না-কি অন্যকেউ? আর আল্লাহপাক সাহায্য না করলে কারো সাহায্য কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু মুমিনরা তো আল্লাহর ওপরই ভরসা করেন। আল্লাহই তাঁদের সহায়। সুতারাং মীমাংসা আল্লাহরই হাতে, শুরুতেও এবং শেষেও।

বদরের যুদ্ধই এই সাক্ষ্য বহন করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে এক দূতকে দেখতে পেলেন। দূত তাঁকে বললেন, আপনারা যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ুন। আল্লাহপাক আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, দুইটি কল্যাণের একটি কল্যাণ অথবা দুইটি দলের একটি দল আপনাদের আয়ত্তাধীন হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনতে পেলেন আবু সুফ্য়ানের কাফেলা শাম থেকে ফিরে আসছে। তারা মদিনার নিকট এলাকা দিয়ে মক্কায় যাবে। এই কাফেলায় রয়েছে ত্রিশ জন বা চল্লিশ জন লোক এবং তাদের সঙ্গে রয়েছে কিশমিশ ও অন্যান্য সামগ্রী বোঝাই এক হাজারটি

উট। এই কাফেলায় মক্কার সমস্ত কুরাইশ অংশীদার। এমন কোনো কুরাইশ নারী-পুরুষ ছিলো না যার অংশ এই কাফেলায় ছিলো না। তারা কাফেরদের সরদার আবু সুফ্য়ানের নের্তৃত্বে এগিয়ে আসছে। কুরাইশদের এই বাণিজ্য আর বাণিজ্যিক পুঁজিই ছিলো তাদের মূল শক্তি। এই শক্তির কারণেই তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিদের উৎপীড়ন করে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছিলো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন, 'তোমরা বের হও, আল্লাহপাক হয়তো এইসব মাল তোমাদের হস্তগত করে দেবেন।' কোনো কোনো সাহাবি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের সোয়ারি তো মদিনার বাইরে গ্রাম এলাকায়। আমরা কীভাবে তাদের মোকাবেলায় বের হবো?' কিন্তু সে-সময় মদিনার বাইরে থেকে সওয়ারি এনে আবু সুফ্য়ানের কাফেলার মোকাবেলায় বের হওয়ার সময় ছিলো না। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যাদের সোয়রি এখানে উপস্থিত আছে তারা আমাদের সঙ্গে বের হও, আর যাদের সোয়ারি এখানে নেই তারা আমাদের সঙ্গে বের হয়ো না।' যাঁরা সেই সময়ে প্রস্তুত হতে পারলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে নিয়ে আবু সুফ্য়ানের বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবেলায় বের হলেন। আবু সুফ্য়ান 'আইনে যুরকা' নামক স্থানে পৌছলে এক ব্যক্তি তাঁকে এই সংবাদ দিলো যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ-কাফেলার অপেক্ষা করছেন। আবু সুফ্য়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর সামনে গুপ্তচর নিয়োগ করলেন। এদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাসবাস বিন আমর ও অন্য এক ব্যক্তিকে সেই এলাকার গোপন সংবাদ আনার জন্যে পাঠালেন। তাঁরা এক ব্যক্তিকে পেলেন যার নাম ছিলো মাজদি বিন আমর। তারপর আবু সুফ্য়ান যখন মাজদি বিন আমরের পাশ দিয়ে গেলেন, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এই এলাকায় কোনো লোক দেখেছো?' মাজদি বিন আমর বললো, 'না, তবে দুইজনকে তাদের পাত্রে পানি পান করতে দেখেছি।' আবু সুফ্য়ান ছিলেন চতুর ও বুদ্ধিমান। তিনি মাজদিকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা তাদের উটকে কোথায় বসিয়েছিলো? মাজদি বললো, ঐ তো ওখানে। আবু সুফ্য়ান এগিয়ে গেলেন এবং উটের বসার চিহ্ন ও উটের মল দেখতে পেলেন। তিনি সেখানে খেজুরের বিচি পেলেন। এসব দেখে বললেন, 'আল্লাহর কসম, এটা ইয়াসরিবের খাদ্য। তাহলে এটা সত্য যে মুহাম্মদ আমাদের কাফেলার মোকাবেলা করতে চায়।' তিনি কাফেলার গতিপথ ঘুরিয়ে দিলেন। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এলাকার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং অন্য পথ ধরলেন। ফলে তিনি কাফেলা নিয়ে বেঁচে গেলেন।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, কাফেলা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে তিনি যখন জানতে পারলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসছেন তখন তিনি দমদম বিন আমর নামক এক বেদুইনকে বিশ মিসকাল সোনার বিনিময়ে ভাড়া করলেন। তিনি দমদমকে এই ব্যাপারে রাজি করালেন যে, সে মক্কায় কুরাইশ গোত্রকে গিয়ে বলবে, তোমাদের কাফেলা বিপদে পড়েছে। এই বদমাইশ দমদম করলো কি, ভয়াবহ বিপদের সঙ্কেতসরূপ তার উটের নাক-কান কেটে ফেললো, হাওদাটি উল্টো করে উটের পিঠে বসালো এবং তার পরিধেয় বস্ত্রের সামনে ও পিছনে ছিঁড়ে ফেললো। যখন সে মক্কায় প্রবেশ করলো– গোটা নগরীতে হইচই পড়ে গেলো। সে উপত্যকায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলো, 'হে কুরাইশ গোত্র, ভয়াবহ বিপদ! ভয়াবহ বিপদ! মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা তোমাদের কাফেলাকে পাকড়াও করতে চায়।'

আতিকার স্বপ্ন

আতিকা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। এই ঘটনার কয়েক দিন আগে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, জনৈক ব্যক্তি উটে আরোহণ করে এলেন। তারপর তিনি আবু কুবাইস পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালেন। আবু কুবাইস মক্কার উপকণ্ঠে একটি লম্বা পাহাড়, এটার ওপর এখন মক্কা প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে। আতিকা বলেন, লোকটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে সম্প্রদায়, তোমরা তিন দিনের ভেতর লড়াইয়ের জন্যে বের হও।' আতিকা বলেন, 'তারপর আবু কুবাইস পাহাড় থেকে একটি বড়ো পাথর খসে পড়লো এবং তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। মক্কার কোনো ঘর বাকি থাকলো না যে ঘরে এই পাথরের টুকরো প্রবেশ করলো না।' আতিকা এই স্বপ্নের কথা গোপনে তাঁর ভাই আব্বাস রা.-কে বললেন। তিনি তাঁকে সতর্ক করে দিলেন যে, 'তুমি এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না।'

হযরত আব্বাস রা. উতবা বিন রবিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন এবং বন্ধু হিসেবে তাঁকে ঘটনাটি জানালেন। উতবা যদিও কাফের ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসেবে মুসলমানদের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিলেন, কাফেরদের নিকটও গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তিনি মক্কার একজন নেতাও ছিলেন। উতবা এই স্বপ্নের ঘটনা অন্যদেরকে জানালেন। শেষ পর্যন্ত এই স্বপ্নের খবর কার নিকট পৌছলো? হ্যাঁ, আবু জাহ্লের নিকট। সে হন্তদন্ত হয়ে আব্বাসের নিকট এলো। সে ক্রোধের সঙ্গে বললো, 'শোনো আব্বাস, তোমাদের পুরুষেরা নবুওয়ত দাবি করছে, এটাই কি যথেষ্ঠ নয়? এখন কি তোমাদের নারীরাও নবুওয়ত দাবি করা শুরু করেছে? শোনো, আমরা আতিকার স্বপ্নের শেষ দেখার জন্যে তিন দিন অপেক্ষা করবো। যদি সে সত্য বলে থাকে তাহলে যা হবার তাই হবে। আর যদি সে মিথ্যা বলে থাকে তাহলে আমরা লিখে

দেবো, তোমাদের পরিবারের চেয়ে মিথ্যাবাদী পরিবার এই আরবে আর একটাও নেই।' আবু জাহল ছিলো বদমাশ। হে আল্লাহ তুমি তার চোখ অন্ধ করে দাও। সে ছিলো দাম্ভিকতা আর নিষ্ঠুরতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে সত্যকে অস্বীকার করেছে।

হযরত আব্বাস রা. তাঁর বোন আতিকার কাছে এলেন এবং যা ঘটেছে সব বললেন। এ-সময় আব্বাসের অন্য বোনেরাও একত্র হলেন। আতিকা বললেন, 'হায় আব্বাস! আবু জাহ্ল তোমাদের অপমান করার জন্যে, তোমাদের পুরুষদের অপমান করার জন্যে যা করেছিলো তাই কি যথেষ্ঠ ছিলো না? এখন সে তোমাদের নারীদেরকেও অপমান করা শুরু করেছে। তারপরও কি তোমরা চুপ করে থাকবে? কী হয়েছে তোমাদের?' এসব কথা শোনার পর আব্বাস রা.-এর দুঃসাহস জেগে উঠলো। তিনি সোজা কাবায় চলে গেলেন। ঘোষণা করলেন, আবু জাহ্লের সঙ্গে এবার বোঝাপড়া হবে। সে যদি আমাকে বাধা দেয় তাহলে অবশ্যই আমি প্রতিশোধ নেবো। তিনি এই অভিপ্রায়ে কাবায় গেলো যে কয়েকটি যুবক মিলে আবু জাহ্লের ঘাড়গোড় ভেঙে দেবে। আবু জাহ্ল ছিলো হালকা-পাতলা। কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি ছিলো তীক্ষ্ণ। সে প্রচণ্ড সাহসী ছিলো, শক্তিশালীও ছিলো বটে। সে ছিলো দাম্ভিকতার দৃষ্টান্ত। আল্লাহপাক আমাদেরকে হেফাযত করুন। আব্বাস রা. কাবাগৃহে প্রবেশ করলেন। আবু জাহ্ল কাবাগৃহেই ছিলো। আব্বাস রা.-কে দেখামাত্রই সে কাবাঘর থেকে বের হয়ে পড়লো। সে অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করলো, আব্বাসের কী হয়েছে? আব্বাস রা. বলেন, 'সে হয়তো আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলো যে, আমি তার ক্ষতি করার জন্যে এসেছি। সে চিৎকার দিয়ে উঠলো, হে কুরাইশ, তোমরা এলে না, বিপদ! বিপদ!' তার এই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে দমদম বিন আমরের চিৎকার শোনা গেলো—'হে কুরাইশ গোত্র, ভয়াবহ বিপদ! ভয়াবহ বিপদ! মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা তোমাদের কাফেলাকে পাকড়াও করতে চায়।'

মক্কার লোকেরা যখন দমদমের অবস্থা দেখলো; তার কাপড়ের সামনে ও পেছনে ছেঁড়া, উটের নাক-কান কাটা, হাওদা উল্টা করে বসানো, তারা চিৎকার দিয়ে উঠলো। তাদের তীব্র জেদ জেগে উঠলো। তারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তৈরি হলো। মক্কার এমন কোনো ঘর বাকি ছিলো যে ঘর থেকে কোনো পুরুষ বের হয় নি বা তার স্থলে অন্য কাউকে পাঠায় নি। আবু লাহাব ঘরে বসে থাকতে চাইলো এবং বেশ অর্থকড়ি দিয়ে তার প্রতিনিধি হিসেবে আরেকজনকে পাঠালো। উমাইয়া বিন খাল্‌ফও ঘরে বসে থাকতে চাইলো। সে ছিলো অতিশয় বৃদ্ধ আর অতিশয় মোটা। তাই সে যুদ্ধে বের না হয়ে ঘরে বসে থাকতে চাইলো। এই খবর শুনে তার বন্ধু উকবা বিন আবু মুয়িত একটি ধূপদানি নিয়ে এলো। সে উমাইয়াকে উপহাস করে বললো, 'এই নাও ধূপদানি। মেয়েদের মতো বসে থাকো আর ধূপের গন্ধ শোঁকো।'

এভাবেই তারা একজন আরেকজনকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। উকবা বিন আবু মুয়িত তার বন্ধু উমাইয়াকে বদর যুদ্ধে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো; সে আসলে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো জাহান্নামের আগুনে ফেলার জন্যে। এদের ব্যাপারে একটি ঘটনা আছে। উকবা বিন আবু মুয়িত কোনো সফর থেকে ফিরে এলে নগরীর মান্য ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত করতো। একবার সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও নিমন্ত্রণ করলো। খাবার সামনে উপস্থিত হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না। ওকবা কালিমা উচ্চারণ করলো এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন। উকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু উমাইয়া বিন খাল্‌ফ এই ঘটনা শুনে খুব ক্রুদ্ধ হলো। উকবা বললো, 'সে ছিলো সম্মানিত অতিথি। আমি তার মনোরঞ্জনের জন্যে কালিমা উচ্চারণ করেছি।' উমাইয়া বললো, 'তোমার এই অজুহাত আমি মানি না। তুমি এর প্রতিবিধান করো।' এরপর তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে এনে কষ্ট দিলো। আরেক হাদিসে এসেছে, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে আনলো এবং উমাইয়া উকবাকে রাসুলের মুখে থুথু নিক্ষেপ করতে বললো। বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে উকবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি মক্কার বাইরে তোমাদের মাথার ওপর তরবারির আঘাত দেখতে পাচ্ছি।' আল্লাহপাক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষদ্বাণীকে সত্য করেছিলেন। বদর যুদ্ধে ওকবা ও উমাইয়া নিহত হয়। আলি রা. তাদের হত্যা করেন। উমাইয়া বিন খাল্‌ফ ও উকবা বিন আবু মুয়িতের ঘটনায় কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহপাক বলেন—

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا () يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

'জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস, আমি যদি রাসুলের সঙ্গে পথ অবলম্বন না করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম![সুরা ফুরকান : আয়াত ২৭-২৮]
যাই হোক, উকবা উমাইয়াকে বললো, 'থাকো তুমি নারীদের সঙ্গে। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক। আল্লাহ তোমার চেহারা কুৎসিত করুক।' উমাইয়া বললো, 'তাহলে তোমরা আমার সওয়ারির ব্যবস্থা করো।' তারা এই বুড়ার জন্যে সোয়ারির ব্যবস্থা করলো।

আসলে এইসব বুড়ারা নিজেদের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে গোটা দুনিয়া বিক্রি করে দিতে রাজি। বস্তুত এরা জাতির জন্যে আপদ ছাড়া কিছু নয়। এরা এদের সম্প্রদায়ের বিপদাপদ আর ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। এরা চারপাশের

লোকদেরকে মৃত করে রেখে নিজেরা বেঁচে থাকে। এখনো এই ধরনের গোত্র আপনারা আফগানিস্তানে অনেক পাবেন। এইসব গোত্রের নেতারা মেঘের ওপরে বাস করে আর গোত্রের অন্য লোকেরা বাস করে মাটির নিচে। তারা রুটিও খেতে পায় না। আপনি দেখবেন, রাস্তা করে দিতে চাইলে, বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে চাইলে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে চাইলে এইসব গোত্রপতিরা পাকিস্তান সরকারকে বাধা দেয়। কেনো বাধা দেয়? কারণ তারা মনে করে, সরকার আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়, আমাদের গোত্রের ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়। কেনো বাধা দেয়? কেননা তারা চারপাশে হাশিশের [মাদকদ্রব্য] আস্তানা বানিয়ে রাখতে চায়—যদিও সেখানে প্রতি বছর শত মিলিয়ন রুপি খরচ হয় এবং চারাপাশের মানুষ এখন পর্যন্ত একটি রুটিও পায় না। আপনি এইসব গোত্রের ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন হাঁটবেন, কিন্তু এমন একটি জায়গাও খুঁজে পাবেন না যেখানে কোনো গাড়ি চলতে পারে। কেনো? কারণ, সরকার যদি রাস্তা করে দেয় তাহলে রাস্তা হবে সরকারের। সরকার যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে তাহলে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের কর্তৃত্ব থাকবে সরকারের হাতে। সরকার যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে তাহলে সেটা হবে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তারা ভাবে, তাহলে তো সরকার আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে। অথচ আমরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে চাই। আসলে এরা স্বাধীন জীবনযাপন করতে চায় না; বরং নিজেরা বেঁচে থেকে পুরো গোষ্ঠীকে মৃত বানিয়ে রাখতে চায়। একারণেই গোত্রের লোকেরা থাকে মৃত, জীবিত থাকে শুধু নেতারা। ফলে তারা হাশিশের [মাদকদ্রব্য] ব্যবসা করে এবং হাশিশের বিনিময়ে বেগার খাটে।

আমাদের এক বন্ধু ছিলেন, জারদ-জান্দালে ডাক্তারি করতেন। জারদ-জান্দাল কান্দাহারের সীমান্তে কুয়িতা এলাকায় একটি জায়গার নাম। তিনি বলতেন, জারদ-জান্দাল মানুষের জন্যে নিকৃষ্ট এলাকা। মানুষের বসবাসের জন্যে ভয়াবহভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। জারদ-জান্দাল কেনো এরকম? তিনি বলেন, এই অঞ্চলে হাশিশ [মাদকদ্রব্য] ও আফিমের রাজত্ব। বিশাল এলাকা জুড়ে আফিম চাষ করা হয়। কেউ যদি সাহস করে আফিম-খেতের ভেতর দিয়ে যায় তাহলে সে নির্ঘাত মারা পড়বে। জারদ-জান্দাল আফগানিস্তানের ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকা। আফিম ও হাশিশের কেন্দ্রস্থল এটি। সমস্ত এলাকা থেকে আফিম ও হাশিশ এনে এখানে জমা করা হয়। তারপর তা চালান করা হয় ইরানে। ইরান থেকে পাচার করা হয় তুরস্কে। তুরস্ক থেকে পাচার করা হয় ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। ফ্লোরিডাতেও যায় মাদকদ্রব্য। দিনরাত চলে এই পাচার। আমেরিকার ডুবোজাহাজ, মার্কিন যুদ্ধজাহাজ, মার্কিন পুলিশ টহল দিচ্ছে, পিছু ধাওয়া করছে কিন্তু কোনো মাদকদ্রব্য পাচারকারীকে ধরতে পারছে না। আর মাদকদ্রব্যে আসক্তির কারণে জারদ-জান্দালে বহু লোক মারা যাচ্ছে।

তাহলে বোঝাই গেলো এইসব নেতারা কতোটা খতরনাক। অর্থাৎ, আমি বলতে চাচ্ছি যেসব নেতারা আল্লাহকে ভয় করে না তাদের জাতির জন্যে বড়োই ক্ষতিকারক ও বিপদজনক। আপনারা তাকালেই দেখতে পাবেন, ইরাকি জাতির ওপর সাদ্দাম বিপদের কী বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনি ইরাকি জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছেন। তিনি চিন্তা করেছেন যে দু-তিন দিনের ভেতরে তেহরান পৌঁছে যাবেন। এভাবেই তাঁর অন্তর তাঁকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং তিনি গোটা আরবের একনায়ক হয়ে বসেছেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষে ইরানে আক্রমণ করেছেন এবং সেখানে ইরাকি সেনা নিয়োজিত রেখেছেন। তারা ইরানের কিছু ভূমি দখল করতে পেরেছে এবং ইরানিদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। ওদিকে খামিনিও একই চরিত্রের। আর ইরানি লোকদের বিশ্বাস হলো তারা এই যুদ্ধে নিহত হলে শহীদ হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। পুনর্জাগরণবাদীরা এটাকে কীভাবে নিয়েছে? খামিনি তাদেরকে বলেছেন, আমরা যুদ্ধের জন্যে এক লাখ চাই, তারা দিয়েছে দুই লাখ।

সাদ্দাম সবাইকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করেছেন। কেউ যদি যুদ্ধ পালিয়ে এসেছে বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাকে দশটি বা বিশটি গুলি ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছে। পরিবারের লোকজন যখন লাশ নিতে এসেছে, গুলির দাম পরিশোধ করা ব্যতীত লাশ হস্তান্তর করা হয় নি।

গোটা দেশকে তিনি ধ্বংস করেছেন। এক মূর্খের মূর্খতার কারণে গোটা প্রাচ্য ধ্বংস হয়েছে। এই সাদ্দম ব্যাটা ছিলো ডাকাত। ১৯৬৪ সালে তিনি ইরাকি সেনাবহিনীতে সার্জেন্টের পদ পান। সার্জেন্ট থাকা অবস্থায় সাদ্দাম সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যান। বিচারকার্য সম্পন্ন করার জন্যে আদালতে হাজির হতে সমন জারি করা হয়। তবুও সাদ্দাম পলাতক থাকেন। এভাবে অনেকদিন কেটে যায়। এরপর মিশেল আফলাক তাঁকে ধরে আনেন এবং দেখাশোনা করেন। মিশেল আফলাকের সহায়তার ব্রিটেনের সংবাদপত্রের সঙ্গে সাদ্দামের যোগাযোগ ঘটে। তাদের মাধ্যমে সাদ্দাম আবার ইরাকে প্রতিষ্ঠিত হন। মিশেল আফলাক তাকে আহ্বান জানায়, সাদ্দাম তুমি কিছু দিনের জন্যে তোমার চাচাতো ভাই আহমদ আল বকরের স্থলাভিষিক্ত হও। তারপর আমরা তাকে অপসারণ করবো এবং তোমাকে রাফেদিনদের নেতা বানাবো। তারপর বানাবো আরবের নেতা। তুমি শুধু অপেক্ষা করো। একারণেই সাদ্দাম যখন মিশেল আফলাক সম্পর্কে আলোচনা করতেন, বলতেন, 'তিনি ছিলেন মহান পথপ্রদর্শক ও মহান নেতা। আমি যখন তাঁর সামনে মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে বসেছি, আমি ছয়মাসের জন্যে ইলহাম [দিকনির্দেশনা] গ্রহণ করেছি।' পাঠক খেয়াল করুন, সাদ্দাম কার থেকে ইলহাম [দিকনির্দেশনা] গ্রহণ করেছেন? মিশেল আফলাক থেকে। হায়রে

ইলহাম! মিশেল আফলাক ছিলেন ইংরেজদের এজেন্ট। একারণেই তিনি যখন ইরাকে দ্বিতীয় বার ফিরে এসেছিলেন, একটি ইরাকি দৈনিক পত্রিকা শিরোনাম করেছিলো : 'প্রভুর প্রত্যাবর্তন'। ভাবুন একবার, 'প্রভুর প্রত্যাবর্তন'। শুধু তাই নয়, এক ইরাকি কবি মিশেল আফলাক সম্পর্কে লিখেছেন—

يا سيدي ومعبدي والهي

حسبي ألم فتاتكم حسبي

'হে নেতা, হে দেবতা, হে প্রভু, দুঃখ-বেদনা আমার জন্যে যথেষ্ট, তেমনি আমার জন্যে যথেষ্ট তোমাদের তরুণীরা।'

আর শায়খ সাদ্দাম! তিনি ইসলামি সম্মেলনের ব্যবস্থ করতেন এবং লোকেরা সেখানে যেতো। বাগদাদের সেইসব ইসলামি সম্মেলনে লোকেরা পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা করতো। একজন একবার বললো, 'আপনি আমাদের দ্বিতীয় উমর। না, না, আপনিই উমর।'

যাই হোক। ইরাকি কবি শফিক কামালি সাদ্দামের প্রশংসায় কবিতা রচনা করলেন—

تبارك وجهك القدسي فينا

كوجه الله ينضح بالجلال

'আমাদের মাঝে তোমার পবিত্র অস্তিত্ব কল্যাণময় হোক; আল্লাহর অস্তিত্বের মতো মহিমায় হোক উজ্জ্বল!'

কী ভয়ঙ্কর! আল্লাহর মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সাদ্দামের অস্তিত্ব! যে-জিব থেকে এই কবিতা বেরিয়েছিলো কী ঘটেছিলো তার ভাগ্যে? মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাদ্দাম নিজের হাতে সেই জিব কেটেছিলেন। আপনারা কি জানেন, কেনো কবির জিব তিনি কেটেছিলেন? যখন প্রচণ্ড-রূপে যুদ্ধ শুরু হলো— বিপর্যয় বাড়তেই থাকলো এবং অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পতিত হলো, তখন ইরাকিরা খামিনিকে জানালো, আমরা যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে চাই। খামিনি বললেন, আমরা এক শর্তে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে রাজি আছি, সাদ্দামকে ক্ষমতা থেকে সরতে হবে। এই খবর শুনে কবি শফিক কামালি মন্তব্য করলেন, 'এই শর্ত অনুযায়ী নেতা সাদ্দাম যদি তার আরশ থেকে নেমে যায়, তাহলে এ-যাত্রায় দেশ বেঁচে যায়।' কামালির এই মন্তব্য সাদ্দামের কানে পৌছলো।

সাদ্দাম ছিলেন ডাকাত, কুখ্যাত অপরাধী ও ঘাতক। তিনি শিয়াদের ষোল বছর বা এরকম বয়সী এক তরুণ নেতাকে খুন করেছিলেন। এই খুনের পর এক-দুই ঘণ্টার ভেতরে পুলিশ সাদ্দামকে গ্রেপ্তার করেছিলো এবং বিচারকদের সামনে উপস্থিত করেছিলো। তারপর মনোচিকিৎসককে ডেকে

আনা হলো। তারা মনোচিকিৎসককে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলুন একি খুনি না-কি খুনি নয়?' মনোচিকিৎসক তার চেহারার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সে হয়তো তাকে খুন করে নি। তবে খুন করা তার জন্যে কোনো কঠিন কাজ নয়। খুন করা তার কছে জলপান করার মতো ব্যাপার।'

আলহামদুলিল্লাহ। স্বাভাবিকভাবেই আমরা খামিনিকে অপছন্দ করি এবং আমরা চাই না যে ইরাকের পতন ঘটুক। আল্লাহর কসম, শিয়াদের হাতে ইরাকের পতন ঘটুক এটা আমরা কিছুতেই চাই না। কারণ ইসলামি বিশ্বে শিয়ারা সবচেয়ে বিপজ্জনক, এমনকি সাদ্দামের চেয়েও বিপজ্জনক। সাদ্দামের অবশ্যই পতন ঘটবে। তিনি জালেম ও উৎপীড়ক। কেননা তিনি ইসলামি উম্মাহর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন। সাদ্দামের পতন ঘটিয়ে আল্লাহপাক মুসলিম উম্মাহর এই ক্ষতকে সুস্থ করবেন, ইনশাআল্লাহ।

অপরদিকে খামিনি ইসলামি বিশ্বকে পদানত করার জন্যে নীল নকশা তৈরি করেছেন। খামিনি স্বপ্ন দেখেন তিনি পাকিস্তানের একটা অংশ দখল করবেন। তিনি পাকিস্তানের পশ্চিম অংশটি দখল করতে চান। কারণ, তাদের ভাষ্যমতে সে-এলাকায় দশ বা তেরো মিলিয়ন শিয়া বসবাস করে। পাকিস্ত ানের সেনাবাহিনীতেও শিয়াদের অংশগ্রহণ রয়েছে। অর্থনীতিতেও তাদের ভূমিকা বেশ বড়ো। তিনি মনে করেন ইরাকের নাগরিকদের শতকরা পঞ্চাশ জন শিয়া এবং দু-তিন বছরের ভেতরেই সাদ্দামের পতন ঘটবে। তারপর তারা ইরাককে পদানত করবেন এবং আরব উপসাগর নিজেদের দখলে নেবেন। এতে তাদের একটির বেশি দুইটি আঘাতের প্রয়োজন পড়বে না। খামিনি মনে করেন, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চল আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। কারণ সেখানে সবাই শিয়া। সিরিয়াও আমাদের সঙ্গে রয়েছে, কারণ সেখানকার নাসিরিয়া শিয়ারা আমাদের সমর্থক। তাছাড়া হাফিজ আল-আসাদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে। লেবাননের মুসলমানেরা শিয়া এবং খুবই শক্তিশালী। সুতরাং তারাও আমাদের সঙ্গে রয়েছে। দক্ষিণ তুরস্কও আমাদের সঙ্গে আছে। সে এলাকায় নাসিরিয়া শিয়ারা বিরাট শক্তি। সেখানে রয়েছে প্রায় তিন মিলিয়ন নাসিরিয়া শিয়া। খামিনি এবং ইরানের শিয়ারা ভাবে তারা একদিন ইসলামি বিশ্বে শিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। কোম নগরীকে কেন্দ্র করে এই সাম্রাজ্য পরিচালনা করা হবে।

একারণেই আমরা চাই না যে, সাদ্দামের পতন ঘটুক। যদিও আমরা তাঁর কুফরির ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

যাই হোক। সাদ্দাম যখন খামিনির এই ঘোষণার কথা শুনলেন, তিনি মন্ত্রিপরিষদ ও দলের নেতাদের সভা আহ্বান করলেন। সাদ্দাম সভায় তাঁর ভাষণে বললেন, 'খামিনি যুদ্ধবিরতি চুক্তির জন্যে শর্ত দিয়েছেন। সেই শর্ত

হচ্ছে আমাকে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করতে হবে। আমার মতামত হলো, আমি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে চাই। এতে রক্তপাতও বন্ধ হবে এবং আমাদের দেশও রক্ষা পাবে। আমার ক্ষমতা ত্যাগের মাধ্যমেই আমি রক্তপাক বন্ধ ও দেশকে রক্ষা করতে চাই। এখন আপনাদের মতামত জানতে চাচ্ছি। দয়া করে আপনাদের মতামত পেশ করুন।' কপট চাটুকারেরা বললো, 'আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। একি বললেন আপনি! আপনিই তো দেশ। আপনিই তো ইরাক। আপনি চলে গেলে তো ইরাকও চলে যাবে।' যাদের ভেতরে সামান্য মানবিকতা ও পৌরুষ ছিলো তারা বললো, 'আপনি দেশের কল্যাণের জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আপনি যদি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান তাহলে দেশের কল্যাণে ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপারে আপনার সমকক্ষ কেউ হবে না।' এই গোত্রের লোকদের মধ্যে কবি শফিক কামালিও ছিলেন। তারপর সদ্দাম বললেন, 'যাঁরা মনে করেন আমার ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত তাঁরা এখানে থাকুন আর বাকিরা চলে যান।' যাঁরা সাদ্দামের ক্ষমতা ত্যাগের ব্যাপারে একমত পোষণ করে সভাকক্ষে থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা কেউ জীবিত ফিরতে পারেন নি। সাদ্দাম তাঁদের সবাইকে হত্যা করেছিলেন। আর শফিক কামালির ভাগ্যে কী ঘটেছিলো? সাদ্দাম কামালিকে বললেন, 'তুমি তোমার জিব বের করো।' কামালি জিব বের করলেন এবং সাদ্দাম নিজ হাতে তাঁর জিব কাটলেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে সাদ্দাম জীবিতদের নির্যাতন করে সুখ পান। শত্রুদেরকে ধরে তাঁর কাছে আনা হয় এবং তিনি তাদের হত্যা করার পূর্বে নাক কাটেন, কান কাটেন এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেলেন।

হ্যাঁ, যা আমি বলতে চাচ্ছিলাম। আমি বলতে চাচ্ছিলাম এইসব নেতা হলেন মসিবত। তাঁরা তাঁদের জাতির জন্যে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক। এই উমাইয়া বিন খাল্‌ফ, আবু জাহ্‌ল, আবু লাহাব ও অন্যরা মক্কাকে ধ্বংস করে ফেলেছিলো। যাই হোক, আমরা আগের আলোচনায় ফিরে যাই। আবু সুফ্‌য়ান যখন কাফেলা নিয়ে বিপদমুক্ত হলেন, তিনি আরেকটি লোককে মক্কায় পাঠালেন। লোকটি গিয়ে বললো, 'কাফেলা এখন বিপদের আশঙ্কামুক্ত। তোমরা ফিরে যাও।' কুরাইশরা ততক্ষণে মক্কা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিলো এবং এক জায়গায় সমবেত হয়েছিলো। লোকটির কথা শুনে আবু জাহ্‌ল দাঁড়িয়ে গেলো। সে ঘোষণা করলো, 'লাতের কসম, আমরা বদর প্রান্তে উপনীত না হয়ে কিছুতেই ফিরে যাবো না। আমরা সেখানে মদ পান করবো। গায়িকারা সেখানে গান গাইবে এবং নর্তকীরা নাচবে। আমরা উট জবাই করবো এবং ভোজ করবো। গোটা আরব আমাদের উল্লাস শুনবে। আমাদের এই দম্ভ কখনো শেষ হবে না।' কিন্তু দলটি এগিয়ে গেলো কী জন্যে? কেননা এই পরিস্থিতিতে এমন কেউ থাকে যে সবাইকে উত্তেজিত

করে। কেননা সব জ্ঞানী ব্যক্তি মানুষের উত্তেজনাকে প্রমশন করতে পারে না। কিন্তু যেকোনো মূর্খ নাদান গোটা দলকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে পারে। কুরাইশ দল এগিয়ে গেলো এবং বদর উপত্যকায় উপনীত হলো। তারা ছিলো মদিনা থেকে বদর উপত্যকার দূরবর্তী প্রান্তে মানে উঁচু ভূমিতে আর মুসলমানরা ছিলেন মদিনা থেকে বদরের নিকটবর্তী প্রান্তে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করতে শুরু করলেন। তিনি আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন না কুরাইশরা কোথায় পৌছেছে। যুদ্ধ হবে কি হবে না তাও তিনি জানতেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এক বৃদ্ধকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে শায়খ, কুরাইশরা কোন্ পর্যন্ত পৌছেছে?' বৃদ্ধ বললো, 'তোমরা কারা তা আমার কাছে বলার আগে আমি তোমাদেরকে কিছু বলবো না।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি আমাদেরকে বলো তাহলে আমরাও তোমাদেরকে বলবো।' বৃদ্ধ বললো, 'আমি শুনেছি কুরাইশরা অমুক দিন মক্কা থেকে বের হয়েছে। যদি তারা সত্যসত্যই বেরিয়ে থাকে তাহলে এখন অমুক জায়গা পর্যন্ত পৌছেছে। আমি আরো শুনেছি মুহাম্মাদ অমুক দিন মদিনা থেকে বের হয়েছে। সে যদি সত্যসত্যই বের হয়ে থাকে তাহলে এখন অমুক জায়গা পর্যন্ত পৌছেছে।' এসব কথা বলার পর বৃদ্ধ বললো, 'আমি তো সব বললাম, এখন বলো তোমরা কারা।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমরা 'পানি' থেকে এসেছি।' তারপর হাঁটা শুরু করলেন। অতিশয় বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি ইরাকের পানি থেকে না-কি অন্য কোনো জায়গার পানি থেকে এসেছো? কোন্ দেশের পানি থেকে তোমরা এসছো?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোনো উত্তর না দিয়েই চলে এলেন। যুদ্ধের ক্ষেত্রে কথাবার্তায় এই ধরনের কৌশল করা বৈধ। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃদ্ধকে সত্যই বলেছেন। কেননা আল্লাহপাক কুরআনে ইরশাদ করেন, أَلَمْ نَخْلُقكُّمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ 'আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করি নি?' [সুরা মুরসালাত : আয়াত ২০]

কুরাইশরা কিছু লোককে তাদের জন্যে পানি সংগ্রহ করতে পাঠালো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হযরত আলি রা., হযরত যুবাইর রা. ও হযরত মিকদাদ রা.—এই তিনজনকে খবর সংগ্রহের জন্যে পাঠালেন। তাঁরা কুরাইশের কয়েকজন পানি-সংগ্রাহককে দেখতে পেলো। আজকে এ পর্যন্তই। আমার জন্যে এবং আপনাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আগামী কাল ইনশাআল্লাহ বদর যুদ্ধের বাকি ঘটনা আলোচনা করা যাবে।

বদর যুদ্ধ : দুই

আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরিফে বলেছেন—

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

'তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে আছে শিক্ষা।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ১১১]

তাই আমরা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিরাত অধ্যয়ন করবো, সাহাবায়ে কেরামের জীবন-কাহিনি পাঠ করবো, আমরা সেসব থেকে ইনশাআল্লাহ শিক্ষা গ্রহণ করবো, উপদেশ গ্রহণ করবো, অনুকরণ করবো এবং সান্ত্বনা লাভ করবো। আমরা এখনো বদর যুদ্ধের ছায়াতলে আছি। সেটা ছিলো সত্য-মিথ্যার মীমাংসাকারী দিবস। বদর যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পতাকা ছিলো সাদা রঙের। তাঁর সঙ্গে আরো দুইটি কালো রঙের নিশান ছিলো। একটি বহন করছিলেন হযরত আলি রা. আর অপরটি বহন করছিলেন হযরত সা'দ বিন মুআয রা.। পতাকা ও নিশানের (اللواء ও الراية) মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—এই পার্থক্যের বিষয়টি কতিপয় আলেম ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের ভাষায়—পতাকা মেলে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয়। আর নিশান বর্শার মাথায় বহন করা হয় এবং তার ওপর একটি গিঁট থাকে। তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পতাকার রঙ ছিলো সাদা আর নিশান ছিলো কালো। মনে হয় মক্কা বিজয়ের সময়েও একই রঙের পতাকা ও নিশান ছিলো। অপর দিকে মুশরিকদের পতাকা বহন করছিলো নদর বিন হারেস। সে রুস্তম ও ইসফানদিয়ারের কাহিনি সংকলন করেছিলো। এসব গল্প সংগ্রহ করে মক্কায় নিয়ে এসেছিলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন, নদর সবাইকে ডেকে বলতো, 'তোমরা আমার কাছে আসো, আমি তোমাদেরকে রুস্তমের গল্প শোনাবো।' সে লোকদেরকে রুস্তমের গল্প শোনাতো এবং গল্পের শেষে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতো, 'কোনটা ভালো গল্প? মুহাম্মদ যেটা বলে সেটা না-কি আমারটা?' লোকেরা তাকে বলতো, তোমারটাই ভালো গল্প।

এ-প্রসঙ্গে আল্লাহপাক কুরাআনে আয়াত নাযিল করেছেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ-প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।' [সুরা লুকমান : আয়াত ৬]

এই ছিলো নদর বিন হারেস। নদর বিন হারেস বন্দি হওয়ার পর তাদের পতাকা বহন করলো আবু আযিয। আবু আযিয ছিলো মুসআব বিন উমায়েরের ভাই। তিনিও পতাকা বহন করছিলেন। মুসআব বিন উমায়ের বহন করছিলেন মুসলমানদের পতাকা আর তাঁর ভাই আবু আযিয বহন করছিলো মুশরিকদের পতাকা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সত্তরটি উট ও দুইটি ঘোড়া ছিলো। একটি ঘোড়া যুবাইর রা.-এর জন্যে, আরেকটি ঘোড়া মিকদাদ রা.-এর জন্যে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিযানে বের হয়ে যাওয়ার সময় আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমকে মদিনায় রেখে যান। আমর বিন উম্মে মাকতুম-এর এক বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম নামায পড়ানোর জন্যে থেকে গিয়েছিলেন। তিনি লোকদের নামায পড়াতেন। বদরের দিকে রওয়ানা হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু লুবাবাকে রাস্তা থেকে মদিনায় ফিরিয়ে দেন এবং তাঁকে মদিনার আমির নিযুক্ত করেন।

আগের আলোচনায় আমি সা'দ রা.-এর কথা বলি নি। মিকদাদ রা.-এর কথা বলেছি। কিন্তু বিন হিশামের বর্ণনায় সা'দ রা.-এর কথাও আছে। তাঁরা গিয়ে আসলাম ও আরিদকে ধরে ফেললেন। তারা কুরাইশদের জন্যে পানি সংগ্রহ করছিলো। তাঁরা এই দুইজনকে ধরে মুসলমানদের কাছে নিয়ে এলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নামায পড়ছিলেন। মুসলমানরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু সুফ্য়ানের কাফেলা কোথায়?' আসলাম ও আরিদ বললো, 'আমরা কুরাইশের পানি-সংগ্রাহক। দলের লোকদের জন্যে পারি সংগ্রহ করি।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে থেকে তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। এরা মিথ্যা বলছে মনে করে মুসলামানরা এদেরকে খুব পেটালেন। এমনকি তাদের গায়ে দাগ পড়ে গেলো। মার খেয়ে তারা বললো, 'আমরা আসলে আবু সুফ্য়ানের লোক।' এই কথা বলার পর মুসলমানরা তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। ইতোমধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করলেন। তিনি বললেন, 'তারা যখন সত্য বলেছে তখন তোমরা তাদেরকে পিটিয়েছো। আর যখন মিথ্যা বলেছে তখন ছেড়ে দিয়েছো। তারা তো সত্যই বলেছে। তারা আসলে কুরাইশের লোক।' এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোক দুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কুরাইশ সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দাও।' তারা বললো, 'আপনরা বদরের দূরবর্তী প্রান্তে যে বালির টিলা দেখছেন, কুরাইশরা তার পেছনে আছে। বালির এই টিলাকে বলা হয় আকানকাল।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কুরাইশরা সংখ্যায় কেমন?' লোক দুটি বললো, 'অনেক।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সংখ্যায় তারা কতো জন হবে?' লোক দুটি বললো, 'আমরা জানি

না।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তারা দিনে কয়টা উট জবাই করে?' লোক দুটি বললো, 'নয়টা বা দশটা।' তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এদের সংখ্যা নয়শো বা এক হাজার হবে।' তারপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাদের মধ্যে নেতারা কে কে আছে?' লোক দুটি বললো, 'উতবা বিন রবিয়া, শায়বা বিন রবিয়া, আবুল বুখতুরি বিন হিশাম, হাকিম বিন হিযাম, নাওফাল বিন খুয়াইলিদ, হারেস বিন আমের, তায়িমা বিন আদি, সুহাইল বিন আমর, নদর বিন হারেস এবং তারা আরো অনেকের নাম বললো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলো তোমাদের সামনে পরিবেশন করেছে।'

বদর যুদ্ধ কুরাইশের জন্যে ছিলো চরম আঘাত আর মুসলমানদের জন্যে ছিলো আল্লাহ তায়ালার বড়ো নেয়ামত। কারণ শিরকের সরদাররা ও কফুরের নেতারা সবাই বা অধিকাংশ বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো এবং মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছিলো। বাস্তব পরিস্থিতিটা ছিলো সেরকম যেমন আল্লাহপাক কুরআনে বলেছেন—

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ () وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ () لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ()

'সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়। মনে হচ্ছিলো ওদেরকে যেনো মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো আর ওরা মৃত্যুকে দেখছিলো। স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর চাচ্ছিলেন যে, তিনি তাঁর কালিমা দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদেরকে নির্মূল করেন। এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা তা পছন্দ করে না।' [সুরা আনফাল : আয়াত ৬-৮]

আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই নির্ধারিত ছিলো যে, এদের সবাইকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আর এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধরিত ছিলো যে আবু জাহল মক্কায় ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানাবে। এইসব নেতাদের ধ্বংস হওয়ার জন্যে এবং মুশরিকদের শত্রুতা থেকে মুসলমানদের স্বস্তির জন্যে দল দুটির মুখোমুখি হওয়ার বিকল্প ছিলো না। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলো তোমাদের সামনে পরিবেশন করেছে।' তিনি এই কথার দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, আল্লাহপাক মক্কার শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে তোমাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

বনি মুত্তালিব গোত্রের জাহিম বিন সালত বিন মুখরিজাহ বিন আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, একজন লোক উটে আরোহণ করে এলো। লোকটি মক্কার উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলো, আমর বিন হিশাম নিহত হয়েছে, উতবা বিন রবিয়া নিহত হয়েছে, শায়বা বিন রবিয়া নিহত হয়েছে, আবুল বুখতুরি বিন হিশাম নিহত হয়েছে। তারপর লোকটি উট থেকে নামলো এবং উটের পিঠে আঘাত করলো। উটটি এগিয়ে একটি তাঁবুতে প্রবেশ করলো। এভাবে উটটি প্রত্যেক তাঁবুতে প্রবেশ করলো এবং তার শরীরের সব রক্ত শুকিয়ে গেলো। এই কাহিনি আবু জাহ্‌লকে বলা হলো। সে বললো, 'আরে এও দেখছি আবদুল মুত্তালিবের বংশে নবী বনে গেছে। আতিকা নবী হলো। মুহাম্মাদ নবী হলো। এখন দেখা যায় এই ব্যাটাও নবী বনে গেছে। আগামী কালই আমরা জানতে পারবো কে নিহত হয়।' আবু জাহ্‌ল তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাম্ভিকতা, রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতা ও অহংকার বজায় রেখেছিলো।

সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ

এখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দূরবর্তী প্রান্তরে বালুর টিলার পেছনে কুরাইশদেরকে দেখতে পেলেন। তাই তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাঁরা যুদ্ধে জড়াবেন না-কি জড়াবেন না। তিনি ঘোষণা করলেন, 'হে লোকেরা, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।' এই ঘোষণা শুনে আবু বকর ও উমর রা. উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা ভালো ভালো কথা বললেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে রইলেন এবং তাঁদের জন্যে কল্যাণের দোয়া করলেন। তারপর মিকদাদ বিন আমর উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, বনি ইসরাইল মূসা আ.-কে যে-ধরনের কথা বলেছিলো আমরা আপনাকে সে ধরনের কথা বলবো না। তারা বলেছিলো— فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 'বরং তুমি এবং তোমার রব যাও এবং তোমরা যুদ্ধ করো আর আমরা এখানেই বসে থাকবো।' [সুরা মায়িদা, আয়াত-২৪] বরং আমরা আপনাকে বলবো, আপনি এবং আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো।

তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললে, 'হে লোকেরা, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।' এবার সা'দ বিন মুআয রা. উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ যেনো আপনি আনসারদেরকে চাইছেন।' আসলে রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন যে, 'আনসাররা আমাদেরকে বলেছিলো, আমরা আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আপনারা মদিনায় আসেন, আমরা আপনাদের নিরাপত্তা দেবো ও হেফাজত করবো। আর এখন আমরা মদিনার বাইরে। সুতরাং এখানে তো প্রতিশ্রুতি কার্যকর নয়।' হযরত সা'দ রা. এবার বললেন, 'আল্লাহর কসম ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাদেরকেই চাচ্ছেন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।' সা'দ রা. বললেন, 'আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য। এসব ক্ষেত্রে আনুগত্য ও অনুসরণের ব্যাপারে আমরা আপনার কাছে অঙ্গীকার করেছি, প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সুতরাং ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা বাস্তবায়িত করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আগামীকাল আপনি আমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হলে আমরা বিষয়টি অপছন্দ করবো না। যুদ্ধে আমরা ধৈর্যশীল এবং লড়াইয়ে আমরা সত্যবাদী। আল্লাহ তাআলা হয়তো আমাদের থেকে তাই চাচ্ছেন যার দ্বারা তিনি আপনার চক্ষু শীতল করবেন। আল্লাহর বরকতে আপনি আমাদেরকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ুন।'

সা'দ রা.-এর কথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, 'তোমরা বেরিয়ে পড়ো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহপাক আমাকে দুটি দলের যেকোনো একটি আমাদের আয়ত্তাধীন হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর কসম, যেনো আমি এখন কুরাইশের নিহতদেরকে দেখতে পাচ্ছি। এখানে আবু জাহ্ল নিহত হবে, এখানে উতবা নিহত হবে, এখানে শায়বা নিহত হবে, এমনিভাবে আরো অনেকে নিহত হবে।' বর্ণিত আছে, জনৈক আনসার সাহাবি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-স্থানটির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, সে-স্থানটিকে কেউ অতিক্রম করতে পারে নি। আর আমরা সা'দ বিন মুআযের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম।'

সা'দ বিন মুআয ছিলেন ইসলামি মনীষা ও জ্ঞান, দাওয়াহ ও আকিদার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। আল্লাহপাক তাঁকে ভালোবেসেছিলেন এবং তাঁর জাতিও তাঁকে ভালোবেসেছিলো। বনি আবদুল আশহালের প্রতিটি ঘরে ইসলাম পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যম ছিলেন তিনি। তিনি সত্যসত্যই নেতা ছিলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলামের বাণী নিয়ে তাঁর জাতির কাছে গিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'হে আবদুল আশহালের সম্প্রদায়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে আমার এবং তোমাদের মুখ দেখাদেখি হারাম।' তাঁর

এই ঘোষণার পর বনি আবদুল আশহালের প্রতিটি ঘর ইসলামে প্রবেশ করেছিলো।

হ্যাঁ, এইসব নেতা তাঁদের জাতির কল্যাণসাধনে নিবেদিত থাকেন। তাঁরা যখন সরল ও শুদ্ধ পথে চলেন, তাঁদের জাতিও সরল ও শুদ্ধ পথে চলেন। আফগানিস্তানে আমাদের সঙ্গে একজন নেতা ছিলেন, তাঁর নাম ছিলো শায়খ সালেহ্। শায়খ সালেহ্ সানাহ্ সম্প্রদায়ের গোত্রগুলোর নেতা ছিলেন। অবশ্য আমরা তাঁকে শায়খ সাইয়াফ বলে ডাকতাম। গত বছর শাওয়াল মাসে অথবা রমযানের শেষে ও শাওয়ালের শুরুতে আমরা জাজি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম। একদিন দুপুরে আমরা তাঁকে বললাম, শায়খ সাইয়াফ, আপনি আমাদেরকে দুপুরের খাবার দেরি করে দিচ্ছেন।' তিনি বললেন, 'আমাদের কাছে রুটি নেই। শিয়াদের একটি দল ডাকাতি করে আমাদের সব নিয়ে গেছে।' যুদ্ধের সময় শিয়ারা একটি এলাকায় [এটি ছিলো পাকিস্তানের সীমান্ত বর্তী এলাকা] রাস্তা বন্ধ করে দিলো। তারা ঘোষণা করলো, আমরা মুজাহিদদের গাড়ি চলাচল করতে দেবো না। শায়খ সালেহ্ তখন পাকিস্তান সরকারকে সতর্কবার্তা পাঠালেন। তিনি পাকিস্তান সরকারকে জানালেন, শিয়ারা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। আপনারা যদি রাস্তা খুলে না দেন তাহলে আমরা এগারোশো সশস্ত্র যোদ্ধা শক্তিবলে রাস্তা খুলে নেবো।' পাকিস্তান সরকার তাঁকে জানালো, আমাদেরকে একদিন সময় দিন। পাকিস্তান সরকারকে একদিনের সুযোগ দেয়া হলো। দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক নামলো এবং শক্তি প্রয়োগ করে রাস্তা খুলে দিলো। এই ঘটানার পর জামাল শিয়া পালিয়ে গেলো। শিয়াদের নেতা জামাল সরকারের মুখোমুখি না হয়ে পালিয়ে গেলো এবং পথ খুলে দিলো। ঈদুল আযহার সময় শিয়ারা আবার ফিরে এলো এবং পথ বন্ধ করে দিলো। শায়খ সালেহ্ তখন হজে ছিলেন। সানাহ্ সম্প্রদায়ের অন্যান্য নেতার চেয়ে শায়খ সালেহ্ ছিলেন অনন্য। তিনি সচ্চরিত্র ও সংযমী ছিলেন। তাঁর যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিলো। তবে আমরা আল্লাহর ওপরে কাউকে পবিত্র বলতে চাই না। তিনি মুজাহিদদেরকে খাওয়াতেন। তিনি শুধু আমাদেরকে এই কারণে ভালোবাসতেন যে আমরা মুজাহিদ। তিনি আমাদের থেকে কিছুই দাবি করতেন না। একদিন আমরা তাঁকে বললাম, 'এই বছর আমরা আপনাকে হজের দাওয়াত দিচ্ছি।' মানে গত বছর। তিনি বললেন, 'আমি চেয়েছিলাম, আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হবে শুধু আল্লাহর জন্যে। আমি আপনাদের কাছে দুনিয়ার কিছু দাবি করি নি। তবে আপনারা আমাকে যে-উৎসের সন্ধান দিয়েছেন তা আমি বন্ধ করতে পারবো না। হজের মধ্য দিয়ে আপনারা আমার কাছে এসেছেন। তাই আপনাদের এই দাওয়াতকে আমি গ্রহণ না করে পারি না।' যাই হোক তিনি সে-বছরই হজে গেলেন। এদিকে শিয়ারা দ্বিতীয় বার পথ বন্ধ করে দিলো।

তাঁর পুত্র সালিম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সালিম ছিলেন 'জামায়াতে ইসলামি'র সদস্য। আমি উসতাদ আবুল আলা মওদুদির 'জামায়াতে ইসলামি'র কথা বলছি। শায়খ সালিম ছিলেন অন্ধ। শিয়াদের সঙ্গে এক যুদ্ধে তিনি তাঁর চোখ হারিয়েছেন। তিনি হজের সময়ই তাঁরা বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তিনি জানালেন, 'শিয়ারা আবার মুজাহিদদের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।' শায়খ জানালেন, 'তোমরা শিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করো।' এই যুদ্ধ লাঠির যুদ্ধ ছিলো না।

বিএম ১২ সক্রিয় হয়ে উঠলো। বুলেট, রিকয়েললেস রাইফেল, আরবিজি ও কালাশনিকভ গর্জন করে উঠলো। এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত শিয়া ও সানাহ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের রূপ নিলো। আল্লাহপাক শিয়াদেরকে পরাস্ত করলেন। সানাহ সম্প্রদায় বারোটি গ্রাম দখল করলো এবং সেগুলো গুঁড়িয়ে দিলো। আল্লাহপাক শিয়াদেরকে লাঞ্ছিত করলেন এবং তাদের শক্তি ও দম্ভ চূর্ণ করে দিলেন। সেই দিন থেকে শিয়ারা গর্ত ও সুড়ঙ্গে আত্মগোপন করলো। এখন সেটাই তাদের আশ্রয়স্থল। সেই আশ্রয়স্থল থেকে তাদের খুব কম সংখ্যকই বের হতে পেরেছে।

আপনি যদি জাজিতে যান এবং সেই এলাকা পরিদর্শন করেন তাহলে প্রতিটি গ্রামকে বিধ্বস্ত দেখবেন। শায়খ সালেহ এবং তাঁর সন্তানেরা সেইসব গ্রামকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সে-সময় সেখানে কাওসে আবয়াদের কাছে একজন শিয়া সামরিক কর্মকর্তা ছিলো। সে মুজাহিদদের জন্যে বিভিন্ন সঙ্কট সৃষ্টি করতো। শায়খ সালেহ তাকে বললেন, 'তুমি আরবদের জন্যে সঙ্কট সৃষ্টি করবে না। এবং সেটাই তোমার জন্যে ভালো হবে। তাছাড়া আমি ভালো করেই জানি তোমার ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নিতে হবে।' সেই দিন থেকে তারা আমাদের জন্যে রাস্তা খুলে দেয়। আমরা পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে আসতাম।

সা'দ বিন মুআয ছিলেন অনন্য দৃষ্টান্ত

বাস্তব সত্য এই, নেতা ও সরদাররা যখন সত্যবাদী ও সৎ হন, আল্লাহপাক তাদের মাধ্যমে ঈমান ও আকিদা এবং আদর্শ ও চেতনার অনেক কল্যাণ করেন। সা'দ বিন মুআয রা. পৌরুষ, আত্মসম্মানবোধ, মর্যাদা ও মানবিকতার প্রতীকরূপে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভাস্বর ছিলেন। বনু কুরায়যার সঙ্গে তাঁর ঘটনা একজন সৎ ও সত্যবাদী নেতার ঘটনা। বনু কুরায়যাকে অবরোধ করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, তোমার আমার নির্দেশমত দুর্গ থেকে নেমে আসো। তারা বললো, না, আমরা সা'দ বিন মুয়াযের নির্দেশমত নেমে আসবো। জাহেলি যুগে সা'দ বিন মুআয রা. তাদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ ছিলেন। তাই তারা আশা করেছিলো, সা'দ রা. তাদের ব্যাপারে লঘু নির্দেশ দেবেন।

খন্দকের যুদ্ধে সা'দ বিন মুআয রা. কী বলেছিলেন? সে-যুদ্ধে আহত হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি যদি আমাদের ও কুরাইশের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি টেনে থাকো তাহলে আমাকে তোমার কাছে উঠিয়ে নাও।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার চোখ শীতল করার আগে আমার মৃত্যু দিও না।'[৫] খন্দকের যুদ্ধই ছিলো শেষ যুদ্ধ যেখানে কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছিলো। খন্দক যুদ্ধের পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, الآن نغزوهم ولا يغزونا। 'এখন থেকে আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করবো, তারা আমাদের ওপর আক্রমণ করবে না।'[৬]

আল্লাহপাক সা'দ রা.-এর দোয়ার প্রথম অংশ—'কুরাইশের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমাকে উঠিয়ে নিন।'—কবুল করেছিলেন। আর দোয়ার দ্বিতীয় অংশ—'বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল করুন।'—কবুল হওয়ার ঘটনা এমন : বনু কুরায়যা বললো, আমরা সা'দ বিন মুআযের নির্দেশমত নামবো। তারা তাঁকে নিয়ে এলো। তখন তাঁর যখমের বিষয়টি গোপন ছিলো। অর্থাৎ আল্লাহপাক তাঁর যখমের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ রেখেছিলেন। সা'দ রা. তখন মসজিদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি আওস গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হলে একদল আওস তাঁর দিকে এগিয়ে গেলো এবং বললো, 'হে সা'দ, আপনি আপনার অধীনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করুন। এরা আমাদের সঙ্গী ছিলো। আপনি তাদেরকে ভুলে যাবেন না।' সা'দ রা. ঘোষণা করলেন, 'এখন সা'দের [শেষ] সময় ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহর ব্যাপারে কারো তিরস্কার তাকে স্পর্শ করবে না। আমি বনু কুরায়যার ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছি, তাদের পুরুষদের হত্যা করা হোক, নারী ও শিশুদের বন্দি করা হোক এবং তাদের ধন-সম্পদ গনিমতে পরিগণিত করা হোক।'[৭] হযরত সা'দের ফয়সালা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাত আসমানের ওপরে আল্লাহপাকের যে-রায় ছিলো, তুমি সে-রায়ই ঘোষণা করেছো। এটাই ছিলো আল্লাহপাকের সিদ্ধান্ত।

---

[৫] খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ দলের ইবনুল আরাকা সাদ বিন মুআযকে তীর ছুঁড়েছিলো। সে তাঁকে বলেছিলো, 'তুমি এটি ধরো। আমি ইবনুল আরাকা।' তখন সাদ বিন মুআয বলেছিলেন, 'আল্লাহ তোমার চেহারাকে আগুনে ঝলসাবেন।' তারপর তিনি এই দোয়া করেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে বনু কুরায়যা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো। দেখুন : তাফসিরে বিন কাসির, সুরা আহযাব।

[৬] মুসনাদে আহমাদ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬২; সহিহুল বুখারি, হদিস নং ৪১০৯।

[৭] আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা, আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম (মিসর : মাতবাআ মুস্তফা আলবাবি, ১৯৫৫) পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪০; সহিহু মুসলিম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭।

মানুষ ইবাদত ও সৎকাজের মধ্য দিয়ে পবিত্রতা, স্বচ্ছতা ও সততার বিভিন্ন স্তরে উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে। অবশেষ সে এমন পর্যায়ে পৌছে, যখন সে আল্লাহর নামে শপথ করে আল্লাহপাক তার শপথ পূরণ করেন। আল্লাহপাক তাকে ভালোবেসে ঘোষণা করেন, 'যদি সে আমার কাছে চায়, অবশ্যই আমি তাকে দিই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, অবশ্যই তাকে আমি আশ্রয় দিই।' এই রায় ঘোষণার পর হযরত সা'দ রা.-এর যখম থেকে তীব্র রক্তক্ষরণ হলো এবং তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। সাহাবাগণ তাঁর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যবান বিশাল দেহের অধিকারী। তাঁরা বললেন, সা'দকে তো হালকা মনে হচ্ছে। তাঁদের কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

إن له حملة غيركم، لَقَدِ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ معاذ

'তোমরা ছাড়া তাঁর আরো বহনকারী রয়েছে। সা'দের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে।'[৮]

সুবহানাল্লাহ! মাটির তৈরি একজন সাধারণ মানুষ; দুর্গন্ধময় তরল থেকে যাঁর সৃষ্টি, তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে! কী সম্মান ছিলো তাঁর? কোন উচ্চতা ছিলো তাঁর? এই দীন ও বিশ্বাসকে ধারণ করে এই মাটির সৃষ্ট মানুষটি কোন উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিলেন? কার জন্যে রহমানের আরশ কেঁপে উঠেছে? হযরত সা'দ রা.-এর মৃত্যুতে। ফেরেশতারা তাঁর রুহকে পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছেন। কবরের শাস্তি থেকে কেউ যদি মুক্তি পেয়ে থাকেন, তিনি হলেন হযরত সা'দ রা.।

সা'দ বিন মুআয রা.—আল্লাহপাক তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন— ছিলেন এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। মদিনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁদের ওপর নির্ভর করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন হযরত সা'দ রা.। তিনি ছিলেন তাঁর প্রধান খুঁটি। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন, 'আল্লাহপাক হয়তো আমার থেকে এমন বিষয় প্রকাশ করবেন যা আপনার চক্ষুকে শীতল করবে।' তিনি বলেন নি, হে সমুদ্রের মৎসকুল, তোমরা ক্ষুধার্ত হও, আমরা তাদেরকে নিক্ষেপ করবো, আমরা তাদেরকে নিক্ষেপ করবো। আমরা অচিরে ইহুদিদেরকে সমূলে বিনাশ করবো। বরং তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহপাক হয়তো আমার থেকে এমন বিষয় প্রকাশ করবেন যা আপনার চক্ষুকে শীতল করবে।

সাহাবাগণ রাদিয়াল্লহু আনহুম বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি ছিলেন ন্যায়বান ও নিষ্ঠাবান। তাঁরা আগেভাবে কোনোকিছু জানার চেষ্টা করতেন

---

[৮] আল-আসমা ওয়াস সিফাত, আল-বাইহাকি, হাদিস ৮১০, ৮১১; সহিহু মুসলিম, হদিস ১৯১৫।

না। কারণ তাঁরা জানতেন, মানুষের হৃদয়সমূহ আল্লাহর জ্ঞানাধীন রয়েছে। তাঁরা জানতে চেষ্টা করতেন না, কীভাবে কার ভাগ্যলিপি রচিত হচ্ছে। আনাস বিন আন-নাদার রা. বদর যুদ্ধ থেকে চলে গিয়েছিলেন। এ-কারণে তিনি অনেক তিরস্কারের শিকার হন। তখন তিনি কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'যদি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে থাকি, তবে আল্লাহপাক অবশ্যই দেখেন আমি কী করি। অবশ্যই আল্লাহপাক দেখেন আমি কী করি।' সাহাবিগণ তাঁর শরীরে আশিটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন পেয়েছিলেন। সা'দ বিন মুআয রা. বলেন, 'আমি আনাস বিন নাদারের সঙ্গে ওহুদ প্রাঙ্গণে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "হে আবু আমর, ওহ্ আবু আমর, জান্নাত। আমি জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। আমি ওহুদ প্রান্তর থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পচ্ছি।"' তিনি জান্নাতের ঘ্রাণ পেয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি দুনিয়াতেই জান্নাতের ঘ্রাণ পেয়েছিলেন। হে লুকমান [একজন আরব মুজাহিদ], তুমি এখানে ঘুমিয়ে আছো। অথচ আনাস বিন নাদার বলেছেন, 'আমি ওহুদের প্রান্তর থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি।'

মুজাহিদরা সফিউল্লাহ আফযালি সম্পর্কে আমাকে বলেছেন। তিনি আফগানিস্তানে হেরাত এলাকার কমান্ডার ছিলেন। তিনি শাহাদাত বরণ করার আগে যখন তাঁর গাড়িতে প্রবেশ করলেন, বললেন, 'আমি আশ্চর্য এক ঘ্রাণ পাচ্ছি। সম্ভবত সেটা শাহাদাত আর জান্নাতের ঘ্রাণ।' এই কথা বলার প্রায় দুই ঘণ্টা পরেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত সা'দ বিন মুআয রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর জন্যে একটি আরিশ [ছাপ্পর বা তাঁবু] নির্মাণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৯] তিনি তাঁকে বলছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল.. হে আল্লাহর নবী.. আমরা কি আপনার জন্যে একটি আরিশ নির্মাণ করবো না? আপনি তাতে অবস্থান করবেন। আমরা সেখানে আপনার বাহন প্রস্তুত রাখবো। তারপর শত্রুদের মোকাবিলা করবো। আল্লাহপাক যদি আমাদের সম্মানিত করেন এবং কাফেরদের ওপর আমাদের বিজয় দান করেন, তাহলে আমরা যা ভালোবাসি তাই হবে। আর অন্যকিছু ঘটলে আপনি আপনার বাহনে আরোহণ করে আমাদের পশ্চাদ্‌বর্তী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হবেন। কিছু মানুষ তো [যুদ্ধ থেকে

---

[৯] বদরের পুরনো কূপের নিকট একটি উচ্চ স্থান ছিলো। এখানে দাঁড়ালে পুরো রণাঙ্গন দৃষ্টিগোচর হতো। সাহাবিগণ এই জায়গায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্যে একটি ছাপ্পর নির্মাণ করেছিলেন। এটাকেই আরিশ বলা হয়। এই আরিশের ভেতর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে আবু বকর রা. ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। হযরত সাদ বিন মুআয রা. রাসুলের দেহরক্ষী হিসেবে আরিশের দরজায় নগ্ন তরবারি হাতে পাহারায় ছিলেন। সিরাতে ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬২০-৬২১।

বিরত থেকে] আপনার পশ্চাতে রয়েই যাবে। হে আল্লাহর নবী, আমরা কি আপনাকে তাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসি না? তারা যদি ধারণা করতো আপনি যুদ্ধে মুখোমুখি হচ্ছেন, তাহলে তারা পেছনে থেকে যেতো না। আল্লাহপাক যদি তাদের মাধ্যমে আপনাকে রক্ষা করতেন, তারা আপনার মঙ্গল কামনা করতো এবং আপনার সঙ্গে জিহাদ করতো।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ রা.-এর এসব কথা শুনে তাঁর প্রশংসা করেন। তাঁর জন্যে কল্যাণের দোয়া করেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্যে একটি আরিশ বানানো হয়।

জিহাদের ময়দানে দোয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন মক্কার কুরাইশ বাহিনী আকন্‌কল টিলার আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। এই দেখে তিনি আরিশের ভেতর দোয়ায় মগ্ন হলেন। তিনি দোয়া করলেন—

اللهم هذه قريشٌ قد أقبلت بخيلائها ، وفخرها تُجادل وتُكذِّب رسولك ، اللَّهُمَّ فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحِنهم الغداة.

হে আল্লাহ, এই কুরাইশ বাহিনী অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এগিয়ে আসছে। তারা তোমার নবীর সঙ্গে বিতণ্ডা করেছে এবং তাকে অস্বীকার করেছে। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সাহায্যের যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা পূর্ণ করো। হে আল্লাহ, প্রত্যুষেই তাদেরকে ধ্বংস করো।'[১০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা তন্ময়-বিভোর হয়ে দোয়া করেই যেতে লাগলেন। সেটা ছিলো জুমআর রাত। রমযান মাসের সতেরো তারিখের রাত। এক পর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেলো। তিনি টেরও পেলেন না। আবু বকর রা. তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন— **بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك** 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার প্রতিপালকের কাছে মিনতি-অনুনয় জানানোয় ক্ষান্ত হোন। আল্লাহপাক আপনাকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন।' সুবহানাল্লাহ! আবু বকর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি নিজের ওপর দয়া করুন। আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন। তিনি আপনাকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। আপনার প্রতিপালকের কাছে অনুনয়-মিনতি জানানোয় ক্ষান্ত দিন।

---

[১০] তাফসির ফি যিলালিল কুরআন, সুরা আনফাল, শহীদ সাইয়িদ কুতুব রা.।

রাসুলের দেহ থেকে চাদর পড়ে গিয়েছিলো। তিনি কিছুই টের পান নি। তিনি দোয়ায় মগ্ন-বিভোর ছিলেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা কর্তৃক শক্তি ও সাহায্যপ্রাপ্ত নবী ছিলেন। তিনি এই দীনের বিজয়ের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত নবী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্ব-প্রতিপালকের হেফাযতে রক্ষিত নবী। অথচ তিনি সারারাত দোয়ায় মগ্ন ছিলেন। কোন রাত? রমযান মাসের সতেরো তারিখের রাত। তিনি কী করেছিলেন সে-রাতে। সারারাত মহান আল্লাহর কাছে দোয়ায় মগ্ন ছিলেন।

মিসরীয় সেনাবাহিনী জুন মাসের পঞ্চম রাতে কী করছিলো? চারশো সেনা কর্মকর্তা সারারাত নোংরামি, নির্লজ্জতা ও মদে নিমজ্জিত ছিলো। নষ্টা নর্তকী তাদের জন্যে নেচেছিলো। বারুখ নাদিল — এই ইহুদি বারুখ নাদিল ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মিসরীয় বিমানবাহিনীর উপদেষ্টা ছিলো। একটি মুসলিম দেশের বিমানবাহিনীর উপদেষ্টা ছিলো একজন ইহুদি!—তার *تحطمت الطائرات عند الفجر* /প্রত্যুষে বিমানগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে গ্রন্থে সে বলেছে, 'আমি রাতের বেলা একটি পার্টির আয়োজন করলাম। নর্তকী তাতে নেচেছিলো। রাত দুটোর সময় এই পার্টি শেষ হয়। আমি আশঙ্কা করি, যদি এখন তারা বাড়িতে ফিরে যায় তাহলে ভোর পাঁচটায় প্রথম যে-বিমান-হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই হামলার সময় তারা জেগে যাবে। আমি দ্রুত চিন্তা করি এবং পার্টিকে অতিরিক্ত সময়ে গড়িয়ে দেয়ার একটা বুদ্ধি পেয়ে যাই। আমি সেনাকর্মকর্তাদের দুই দলে ভাগ করি; পুরুষ কর্মকর্তাদের একদল, নারী কর্মকর্তাদের আরেকদল। পুরুষ কর্মকর্তাদের বলি, তোমরা হলে মিসরীয় মিগ আর নারী কর্মকর্তাদের বলি, তোমরা হলে ইসরাইলি মিরাগ। আমি এখন দেখতে চাই মিগ কীভাবে মিরাগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মিগ মিরাগের ওপর মানে পুরুষ কর্মকর্তারা নারী কর্মকর্তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ভোর চারটা পর্যন্ত মউজ ও মাস্তিতে নিমজ্জিত থাকে।' বারুখ নাদিল আরো বলে, 'নর্তকীর ব্যাপারে আমার আর সিদকি মাহমুদের মধ্যে মতভেদ ঘটে। সিদকি মাহমুদ বিমানবাহিনীর বড়ো কর্মকর্তা।' সে বলে, 'ভোর চারটার সময় সেনাকর্মকর্তারা মাতাল ও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে যায়। তারা নিজেদের বিছানায় ছুঁড়ে দেয় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। কায়রোর সব বিমানবন্দর ও বিমান জ্বালিয়ে দেয়ার আগে তারা জাগতে পারে না।' বারুখ নাদিল এই বলে তার কাহিনি শেষ করে, 'মিসরীয় বিমানবন্দর আর বিমানগুলো কীভাবে পুড়ছে তা দেখার জন্যে আমি একটি বিমানে চড়ে কায়রোর আকাশে চক্কর দিই। আমার দেখতে কোনা ভুল হয় না যে জ্বালিয়ে দেয়া বিমান ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানবন্দর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে।'

আবদুন নাসেরের ভূমিকা কী ছিলো? মার্কিন রাষ্ট্রদূত—বিদায়ি পত্রে—তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। বারুখ নাদিল বলে, 'সন্ধ্যা সাতটায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত আবদুন নাসেরের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাকে অনুরোধ করে, আপনি কোনো আক্রমণের নির্দেশ দেবেন না। ইসরাইলি আক্রমণের দুই ঘণ্টা আগে রুশ রাষ্ট্রদূত আবদুন নাসেরের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং বলে, আপনি কোনো আক্রমণ চালাবেন না। ফজরের নামায আদায়ের জন্যে তারা তাকে ভোরেই জাগিয়ে দেয়!'

যুদ্ধের রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারারাত ইবাদত করার কারণে, দোয়ায় তন্ময়-নিমগ্ন থাকার কারণে এতোটাই আত্মবিস্মৃত ছিলেন যে, তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেলেও তিনি টের পান নি। আবু বকর রা. রাসুলের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার প্রতিপালকের কাছে মিনতি-অনুনয় জানানোয় ক্ষান্ত হোন। আল্লাহপাক আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন।' আর এদিকে যুদ্ধের আগের রাতে মিসরের সমারিক কর্মকর্তা সিদকি মাহমুদ ইহুদি বারুখ নাদিলের সঙ্গে এক নর্তকীর [সম্ভোগের?] ব্যাপারে তর্কবিতর্ক করে।...

যাই হোক। আল্লাহপাক বলেছেন—

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

'যারা তা [কিয়ামত] বিশ্বাস করে না তারাই তা তরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা তা ভয় করে এবং জানে তা সত্য। জেনে রাখো, কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।' [সুরা শূরা, আয়াত ১৮]

হ্যাঁ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। আর আবু খালেদ ও তার দলের একটিই আহ্বান ছিলো, আল্লাহর কসম, তোমরা বের হবে না। এই আহ্বানই তাদের ছিলো। মিসরীয় সেনাবাহিনীর প্রথম ট্যাঙ্কবহর যেটি সিনাই পর্বতে প্রবেশ করে তাতে লেখা ছিলো : ناصرنا ناصر.. ناصرنا عبد الناصر 'আমাদের সাহায্যকারী নাসের.. আমাদের সাহায্যকারী আবদুন নাসের।' আর ইসরাইলের প্রথম ট্যাঙ্কবহরে তাওরাতের কিছু পঙ্‌ক্তি লেখা ছিলো। মোশে দায়ান (Moshe Dayan)[১১]-এর কন্যা Yaël Dayan তাঁর Israel Journal : June

---

[১১] موشي دايان (জন্ম ১৯১৫, মৃত্যু ১৯৮১) : ইসরাইলি ইসরাইলি রাজনীতিবিদ ও সামরিক কর্মকর্তা। ১৯৫৬ সালের যুদ্ধে ইসরাইলি বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। মিসর, সিরিয়া

1967[১২] গ্রন্থে বলেন—এই মেয়ে ইসরাইলি সেনাবাহিনীতে সশস্ত্র সৈনিক ছিলেন—'দক্ষিণ ফ্রন্টের খবর যখন আমাদের কাছে পৌঁছে, ভয়ে আমাদের কাঁধের মাংস কেঁপে ওঠে। সেখানে মিসরীয় বাহিনী আক্রমণ করেছে। এর কিছুক্ষণ পরেই হাখাম [র‍্যাবাই বা ইহুদি ধর্মগুরু] আমাদের কাছে আসেন এবং তাওরাত থেকে কিছু পঙ্ক্তি পাঠ করে শোনান। তাওরাতের পাঠ শুনে আমাদের ভয় শান্তিতে এবং শঙ্কা স্বস্তিতে পরিণত হয়।' হ্যাঁ, ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রকে ধর্মগুরুরাই পরিচালনা করেন। ডেভিড বেন গুরিয়ন ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করেছিলো। সে বিরাট ধর্মগুরু ছিলো এবং ইসরাইলের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলো। তাঁর স্ত্রী ইহুদি ছিলো না। গুরিয়ন তার মেয়েকে এক ইহুদি পাত্রের কাছে বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু হাখাম এই বিবাহ-বন্ধনে বাধ সাধে। সে বলে, আমাদের ইহুদি ধর্মানুসারে আপনার মেয়ে ইহুদি নয়। কারণ, তার মা ইহুদি নয়।

১৯৬৫ সালে চার্চিল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জানাযায় ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী অংশ গ্রহণ করে। চার্চিলের জানাযা হয়েছিলো শনিবারে। ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী সেদিন ছয় কিলোমিটার হেঁটেছিলো এবং গাড়িতে চড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। কারণ তাদের ধর্মে শনিবারে গাড়িতে চড়া নিষিদ্ধ।

যেদিন তারা মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে, মসজিদের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত জর্ডান সেনাবাহিনীর পাঁচ সৈনিক কোনো লড়াই করে নি। প্রতিরোধ করে নি। মসজিদে প্রবেশের পর ডেভিড বেন গুরিয়ন বলে, ইসরাইলে প্রবেশের পর আজকের দিনটি আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ দিন। সে ঘোষণা করে—আমি তখন পশ্চিমতীরে ছিলাম এবং রেডিও শুনছিলাম—আমি ইসরাইলি সৈন্যদের রেডিওতে বলতে শুনলাম, মুহাম্মদ মারা গেছে। সে মারা গেছে আর কিছু অবলা রেখে গেছে। এভাবে তারা বলতে থাকে। দায়ান ঘোষণা করে, জেরুজালেম থেকে মদিনা পর্যন্ত আমাদের কর্তৃত্বের অধীন থাকবে। আর এদিকে আবু খালেদ ২৭ শে মে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। বিশ্বের সাংবাদিকরা সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তার

ও জর্ডানের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৭ সালে ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ইসরাইল ও আরবের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছেন না মনে করে ১৯৭৯ সালে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত কৃষিমন্ত্রী এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনদখল যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

[১২] Israel Journal: June 1967 (also known as A Soldier's Diary) - 1967

হাতে ছিলো সিগারেট। সে বলছিলো, আমরা ইহুদিদের সঙ্গে লড়াই করবো এবং যারা তাদের সহায়তা করে তাদের সঙ্গেও লড়াই করবো। আমরা আমেরিকার সঙ্গেও লড়াই করবো। এবং তার হাতে সিগারেট পুড়ছিলো।

কুরাইশের নেতারা উমাইর বিন ওয়াহিব আল-জাহমিকে মুসলমাদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্যে পাঠালো। তারা তাকে বললো, তুমি যাও এবং মুসলমানদের সংখ্যা নির্ণয় করে এসে আমাদেরকে বলো। সে একটি ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম বাহিনীর চারপাশে ঘুরে নিজেদের শিবিরে ফিরে এলো। কুরাইশ নেতারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, মুসলমানদের সংখ্যা কতো হবে? উমাইর বললো—

ثلاث مئة يزيدون أو يقلون قليلا ، لكن يا معشر قريش رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب البلايا تحمل المنايا

'তাদের সংখ্যা হবে তিনশো। তবে তার চেয়ে সামান্য কমবেশিও হতে পারে। কিন্তু হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমি বিপদকে মৃত্যু বহন করতে দেখেছি। ইয়াসরিবের উটগুলো ভয়াবহ বিপদ, সেগুলো মৃত্যু বহন করে নিয়ে এসেছে।'

البلايا-এর অর্থ কী? এটি البلية শব্দের বহুবচন। البلية অর্থ হচ্ছে জাহেলি যুগের সেই উট বা চতুষ্পদ জানোয়ার যাকে তার মালিকের মৃত্যুর পর তার কবরের পাশে বেঁধে রাখা হতো এবং খাওয়ার জন্যে কোনো ধরনের দানাপানি দেয়া হতো না। পশুটি শেষ পর্যন্ত না খেয়ে মারা পড়তো। [بلية-এর সাধারণ অর্থ বিপদ, পরীক্ষা, দুর্যোগ।] نواضح শব্দটি ناضح-এর বহুবহন। এর অর্থ এমন উট যা শস্যখেতে দেয়ার জন্যে পানি বহন করে নিয়ে যায়। সে আরো বলে, 'সেই উটগুলো ভয়ঙ্কর মৃত্যু বহন করে আছে। তরবারি ছাড়া আত্মরক্ষার জন্যে তাদের কাছে আর কোনো উপকরণ নেই। তাদের কেউ-ই অন্তত অন্য একজনের প্রাণ হরণ করা ব্যতীত নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবে না। তারা যদি তাদের সমসংখ্যক কুরাইশকে হত্যা করে তাহলে—আল্লাহর কসম—এরপর আমাদের জীবনে আর কোনো কল্যাণ থাকবে না।' তারা উমাইরকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী মনে করো? সে জবাব দিলো, আমি মনে করি বুদ্ধিমানেরা এই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে এবং আমরা মক্কায় ফিরে যাবো।

হাকিম বিন হিযাম বসেছিলো। হাকিম বিন হিযাম বিন খুয়াইলিদ ছিলো হযরত খাদিজা রা.-এর ভাতিজা। খুয়াইলিদ খাদিজা রা.-এর পিতা এবং হিযাম খাদিজা রা.-এর ভাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন

তার ফুফা। তাই হাকিম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসতো। সে কুরাইশ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে গেলো। কুরাইশের সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলো উতবা বিন রবিয়া। উতবা মুশরিকদের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিলো, মুসলমানদের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিলো। তাই হিজরতের আগে মক্কার মুশরিকরা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে কোনো দাবি পেশ করতে চাইতো, তারা উতবাকে তাঁর কাছে পাঠাতো। উতবা ছিলো বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সম্মানিত ও চরিত্রবান। সে বাস্তবিকই ঈমান আনতে যাচ্ছিলো। হাকিম বিন হিযাম উতবা বিন রবিয়াকে[১৩] বললো, 'হে উতবা.. হে আবুল ওয়ালিদ, আপনি কুরাইশের প্রধান ব্যক্তি এবং তাদের নেতা। আপনি ইচ্ছে করলে এমন সুনাম অর্জন করতে পারেন, যা আপনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। আপনি দৃঢ়তার সঙ্গে আপনার জাতিকে এই অন্যায় যুদ্ধ থেকে বিরত রাখুন।' উতবা বললো, 'এজন্যে আমি প্রস্তুত আছি; কিন্তু আবু জাহ্ল আমার সঙ্গে একমত হয় কি-না সন্দেহ। তুমি তাকে বুঝিয়ে বলো।'

মক্কার মুশরিকরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে উতবা বিন রবিয়াকে তাঁর কাছে পাঠাতো। সে একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, 'ভাতিজা, শোনো, তুমি যদি সম্পদ চাও, আমরা তোমার জন্যে সম্পদ জমা করতে প্রস্তুত। তুমি যদি রাজত্ব চাও, আমরা তোমাকে রাজত্ব প্রদানেও প্রস্তুত। এবং তুমি যদি আরো কিছু চাও...। আর তোমার কাছে যদি জিনের মন্ত্রণা এসে থাকে, আমরা সম্পদ জমা করে তার চিকিৎসা করাতেও প্রস্তুত।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আবু ওয়ালিদ, শুনুন।'— এই বলে সুরা হা-মীম আস-সাজদা থেকে তিলাওয়াত করলেন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম—

حم () تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ () كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ()
بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ()

'হা মীম। এটা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ণ। এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ—আরবি ভাষায় কুরআন—জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তা শুনবে না।' এভাবে তেলাওয়াত করে তিনি তেরোতম আয়াত () فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ 'তবু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক

[১৩] উতবা বিন রবিয়া বদর যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর সেনাপতি ছিলো।

করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আদ ও সামুদের শাস্তির অনুরূপ।'—পর্যন্ত পৌঁছলে উতবা রাসুলের মুখে হাত রাখে এবং বলে, 'তুমি যে-পঙ্ক্তিমালা আবৃত্তি করেছো, তাই যথেষ্ট; আবৃত্তি পূর্ণাঙ্গ করার দরকার নেই।' এই বলে উতবা উঠে গেলো। সে দেখলো আবু জাহ্ল এগিয়ে আসছে। আবু জাহ্ল তাকে দেখেই বললো, 'আবুল ওয়ালিদ যে চেহারা নিয়ে মুহাম্মদের কাছে গিয়েছিলো, সে ভিন্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে। হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমার মত হচ্ছে, তোমরা এই লোকটিকে ত্যাগ করো। আল্লাহর কসম, আমি তার মুখে নতুন কথা [কুরআনের আয়াত] শুনতে পাচ্ছি। আমি মনে করি, তোমরা তাকে ত্যাগ করো।' আবু জাহ্ল আশঙ্কা করলো, উতবা ইসলমান গ্রহণ করে ফেলবে। উতবা যদি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে তাহলে কুরাইশ সম্প্রদায়ের অর্ধেক লোকই ইসলাম গ্রহণ করবে। আবু জাহ্ল উতবার কাছে গিয়ে বললো, 'হে আবুল ওয়ালিদ?' উতবা বললো, 'হ্যাঁ।' আবু জাহ্ল বললো, 'তুমি তোমার জাতিকে ত্যাগ করেছো, তারা তোমার জন্যে খাদ্য বা রুটি কেনার জন্যে অর্থ-সম্পদ জমা করছে।' উতবা বললো, 'ছি ছি, আবু জাহ্ল, এগুলোর কি আমার কোনো প্রয়োজন আছে?' আবু জাহ্ল বললো, 'তারা শুনেছে, তুমি টাকা-পয়সা দাবি করার জন্যে মুহাম্মদের কাছে গিয়েছো।' এসব কথা শুনে উতবা শপথ করলো, সে কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে কথা বলবে না।

আল্লাহর শত্রুদের চরিত্র এখন পর্যন্ত এমনই রয়ে গেছে। তারা যদি আপনার সঙ্গে লড়াই করতে চায়, একটা না একটা অজুহাত তারা বের করবে এবং আপনার সঙ্গে লড়াই শুরু করে দেবে। আপনি কোথায় কাজ করছেন? আপনি কি সৌদি আরবে কাজ করছেন? আপনি কি ওখানকার কোনো কর্মচারী? আপনি যেখানেই কাজ করেন আপনার পেছনে লোক লাগানো থাকবে এবং কোনো না কোনো অজুহাত দেখিয়ে আপনাকে ফাঁসানো হবে। আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন? আপনি কি কুয়েত থেকে এসেছেন? আপনি যদি কুয়েতে কাজ করে থাকেন তাহলে মুদির হেলালকে চেনার কথা। সে সরকারি কর্মচারী; তার কাজ হচ্ছে রিপোর্ট তৈরি করে রাষ্ট্রের কাছে পেশ করা। আপনারা তাকে কখানো বিশ্বাস করবেন না। তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের পানির চেয়েও পবিত্র। সে আপনাদের চেয়ে একশো গুণ বেশি কাজ করে। সে একা যে-কাজ করে, আপানারা একহাজার জন তার অর্ধেক কাজ করেন না। তার এই কর্মক্ষমতা ও কর্মস্পৃহা বোধগম্য নয়। সে যতোদিন রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করবে রাষ্ট্র তাকে ততোদিন রাখবে। মানুষ তার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে।

এখন আফগানিস্তানেও মৌলবি টাইপের কিছু লোক আছে, যারা তথ্য পাচার ও মানুষের মধ্যে ফেতনা বাঁধিয়ে অর্থ উপার্জন করে। আরবরা যদি তাদেরকে টাকা-পয়সা না দেয়, তারা স্থানীয় লোকজন ও আরবদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে ছাড়ে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে। এরা লোকজনের মধ্যে বলে বেড়ায়, ওরা হচ্ছে আরব। ওরা ওহাবি। ওরা তোমাদের হানাফি মাযহাবকে ধ্বংস করতে এখানে এসেছে। এভাবে তারা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে এবং মুসলমানদের মধ্যেই সম্পর্ক ছিন্ন করে। এটা হচ্ছে তাদের ফেতনা ছড়িয়ে দেয়ার সংক্ষিপ্ত পথ। আমি একবার শায়খ রব্বানি ও আরো প্রায় একশো বা দুইশো কমান্ডারের সামনে তাদের সম্পর্কে [তাদেরকে লক্ষ্য করেও বটে] কথা বলেছি। আমি বলেছি, 'এখানে কিছু লোক আছে যারা আমাদের ও আপনাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। এই জিহাদ ও বিশ্বজুড়ে তার সহায়তাকারীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়। তারা বলে বেড়ায়, আরবরা ওহাবি। ওরা তোমাদের হানাফি মাযহাব ধ্বংস করার জন্যে এখানে এসেছে। কিন্তু তাদের কথা সত্য নয়। আমরা আপনাদের সেবা ও সহায়তা করার জন্যে আফগানিস্তানে এসেছি। আমরা আপনাদের মাযহাব ধ্বংস করতে এখানে আসি নি। ইসলামের চার মাযহাব সম্পর্কেই আপনারা ভালো জানেন। ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফি রহ., ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. সম্পর্কেও আপনারা জানেন। আরব বিশ্বে ওহাবি মাযহাব বলে কোনো মাযহাব নেই। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ছিলেন একজন সংস্কারপন্থী ব্যক্তি; তিনি চিন্তা-চেতনা, আকিদা ও বিশ্বাস এবং ফিক্হ ও ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর অনুসারী ছিলেন।' আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কি আহমদ বিন হাম্বল রহ.-কে গ্রহণযোগ্য মনে করেন? তিনি কি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য?' তাঁরা সবাই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আহমদ বিন হাম্বল রহ. আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য।' আমি তাঁদের বললাম, 'আমরা চার মাযহাবকেই সম্মান করি। আমরা ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে সম্মান করি, ইমাম শাফি রহ.-কে সম্মান করি, ইমাম মালেক রহ.-কে সম্মান করি এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-কে সম্মান করি। আপনারা যদি আহমদ বিন হাম্বল রহ. কে সম্মান না করেন এবং তাঁকে গ্রহণযোগ্য মনে না করেন, তাহলে আপনারাই ওহাবি। আমরা ওহাবি নই। চার মাযহাবকে যে গ্রহণযোগ্য মনে করে না তাকেই তো তারা ওহাবি বলে, নয় কি?'

আমার ভাইয়েরা, ওহাবি মতবাদ সম্পর্কে যে-বইটি এখানে প্রচলিত, তা ইংরেজদের আমল থেকেই চালু হয়ে আছে। ইংরেজদের আমল থেকেই এই বইটি আফগানিস্তানে বিরতণ করা হয়। এই বইয়ে মুদ্রিত আছে, ওহাবিরা

সহোদর বোন ও মাকে বিবাহ করা বৈধ মনে করে। এই বইগুলো এখনো আফগানিস্তানে পঠিত হয় এবং যারা পাঠ করে তারা সে-বিষয়ে কিছুই জানে না। তারা একেবারেই মূর্খ। ইংরেজরা উসমানি সাম্রাজ্যের ভেতরও এভাবে ফেতনা ছড়িয়ে দিয়েছিলো। যারা কম জানে বা সহজ সরল তারা ওহাবি মতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো। ওহাবি মতবাদের বিরুদ্ধে তিনশো বছরের এই যুদ্ধে মুসলমানদেরকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।

আমার ভাইয়েরা, পবিত্র কাবা শরিফের ইমাম আবদুল্লাহ বিন সাবিল চার বছর আগে এখানে এসেছিলেন এবং ইমামতি করেছিলেন। তিনি যখন ইসলামাবাদ ও করাচিতে ছিলেন তখন লোকদের নামায পড়িয়েছেন। মুসল্লিদের অনুরোধেই তিনি নামায পড়িয়েছিলেন। শুজা আলি কাদেরি—ইসলামাবাদের একটি আদালতের উচ্চ পর্যায়ের বিচারক —ফতোয়া দেন, কেউ আবদুল্লাহ বিন সাবিলের পেছনে নামায পড়লে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে—ভালো, কিন্তু কেনো সে তালাক হয়ে যাবে? এ-ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কী? নামায বাতিল হয়ে যাবে, সেটা না-হয় ঠিক আছে। কিন্তু স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, কী কারণে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, তার কী দোষ? এই ফতোয়া প্রদান এখনো অব্যাহত আছে। আমি নিজে আহমদ বেরলবির কিতাবে পড়েছি, কুকুরও ওহাবিদের চেয়ে ভালো। ইহুদি-খ্রিস্টানরাও ওহাবিদের চেয়ে কম অনিষ্টকর। এটা এখনো তাদের মাথায় রয়ে গেছে। তারা একেবারেই মূর্খ, কিছুই জানে না।

এ-ব্যাপারে আমার এই বক্তব্যের পর শায়খ রব্বানি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, আসুন, এই বিষয়টি আপনার কাছে ব্যাখ্যা করি। আমি বললাম, ঠিক আছে, তাহলে তো ভালোই হয়। তিনি বললেন, আমাদের এই জাতির অজ্ঞতা বিদিত; তারা কোনো জ্ঞান রাখে না, ওহাবি মতবাদ সম্পর্কেও তারা জানে না, অন্যদের সম্পর্কেও তারা জানে না। রব্বানি বলেন, পির গোত্রীয় এক লোক—আপনারা পির গোত্রীয় লোকদের চিনবেন, তারা মাথার চুল পাকিয়ে সামনের দিকে নিয়ে আসে এবং দাড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখে। আমি সম্ভবত তাদের সম্পর্কে আপনাকে বলেছি। তোর পির গোত্রীয় এক লোক কাবুলে একটি দোকান খোলে। তার পাশে এক ব্যবসায়ী থাকে, সে হলো মৌলবি গোত্রের, বুঝতে পারছেন? এসব মৌলবিকে কখনো কখনো আলেমও বলা হয়। এরা আল্লাহর দীনকে নিয়ে ব্যবসা করে। এই ব্যবসায়ী মৌলবি সেই পির গোত্রীয় লোক থেকে ঋণ নেয়। এক সময় ঋণের পরিমাণ অনেক হয়ে দাঁড়ায়। এক সময় দোকানে৭র মালিক পির ব্যাটা মৌলবিকে ঋণ পরিশোধ করতে বলে। পির গোত্রীয় লোকটাও কাফের; সে ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমেই কাফের। পির ব্যাটা ঋণ পরিশোধ করতে বলায় মৌলবি

ক্ষেপে যায়। সে বলে, আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই। দোকানের মালিক পির বলে, আজকে আমার ঋণ পরিশোধ না করলে আর কখনো তোমাকে ঋণ দেবো না। মৌলবি বলে, আমি বললাম তো, আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই। পির বলে, ঠিক আছে, তুমি যখন আমার ঋণ পরিশোধ করবে না, আজকের পর থেকে আমি তোমাকে কখনো আর ঋণ দেবো না। মৌলবি বলে, আমি আগেই বলেছি, আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই। তুমি কেনো জোরাজুরি করছো? আমি কীভাবে ঋণ পরিশোধ করবো? পির বলে, আমার কাছে তুমি কাউকে পাঠাবে না; টাকার জন্যেও না, সওদার জন্যেও না। মৌলবি বলে, ঠিক আছে, তোমার চিকিৎসা আমি করবো।

পরের শুক্রবার একটি ঘটনা ঘটে। মৌলবি জুমআর নামাযের পর ঘোষণা করে, লোকসকল, আপনারা শুনুন, আমি আপনাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিতে চাই। এই যে আপনাদের এখানে এক পির থাকে, দোকানের মালিক, সে ওহাবি মতাদর্শ গ্রহণ করেছে এবং ওহাবি হয়ে গেছে। আপনার কেউ তার কাছে যাবেন না। লোকেরা তার কথা শুনলো এবং পির ব্যাটার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। তারা কেউ তার দোকানে যায় না এবং সওদাও কেনে না। কেউ কেউ তার দোকানে গেলে সে জিজ্ঞেস করে, কেনো আপনারা আমাকে এড়িয়ে চলছেন? আপনারা তো আমার দোকানে আসেন না। লোকেরা বলে, তুমি তো ওহাবি হয়ে গেছো। এই জন্যে আমরা তোমার কাছে আসি না। পির জিজ্ঞেস করে, আপনারা কোত্থেকে শুনেছেন, আমি ওহাবি হয়ে গেছি? লোকেরা বলে, মৌলবি শুক্রবার মসজিদে ঘোষণা করেছে, তুমি ওহাবি হয়ে গেছো। পির বলে, ঠিক আছে, আমি দেখছি। সে পরে মৌলবির কাছে আসে। তাকে বলে, ভাই, আমার ঋণ আমি ছেড়ে দিলাম। তোমাকে কিছু দিতে হবে না। আর এই নাও, এটা হচ্ছে তোমার জন্যে একটা ভালো উপহার। মৌলবি বলে, তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি ভালো কাজ করেছো। আগামী শুক্রবার তোমার ব্যাপারে কথা হবে। পরের শুক্রবার জুমআর নামাযের পর মৌলবি ঘোষণা করে, ভাইসকল, শুনুন, আমি আপনাদের একটা বিরাট সুসংবাদ দিতে চাই। ওই যে পির, সে আর ওহাবি নেই, সে আবার পির হয়েছে। আপনারা তার দোকানে যাবেন। এই ঘোষণার পর লোকেরা আবার পীরের দোকান থেকে সওদা কিনতে শুরু করে।

এখন আরবদের সঙ্গে লড়াই বাঁধাবার একটা ভালো কৌশল হলো তাদের বলা : এরা ওহাবি। স্থানীয় লোকেরা শুরুতে খুবই অজ্ঞ ছিলো; যা শুনতো তাই বিশ্বাস করতো। ওহাবি মতাদর্শ কী, ওহাবি কারা—সে-সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিলো না। তারা কিছুই জানতো না। কিন্তু আরবরা যখন

তাদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে, স্থানীয় লোকেরা আরবদের দেখছে, তাদের সম্পর্কে জানছে—স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের ভালোবাসতে শুরু করেছে। তারা এখন আরবদের যথেষ্ট সম্মান করে এবং নিজেদের প্রাণের চেয়েও তাদের বেশি ভালোবাসে। এখন মার্কিন ও ফরাসিরা আফগানিস্তানের ভেতরে যখন আফগানদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তারা বলে, তোমাদের এখানে কি ওহাবি আছে? ওহাবি বলতে তারা আরবদের বোঝায়। কারণ আফগানিস্তানে আরবরাই মার্কিন ও ফরাসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তাদের মোকাবিলা করছে।

বদর যুদ্ধের ঘটনায় ফিরে যাই। হাকিম বিন হিযাম উতবাকে বললো, আপনি কুরাইশের প্রধান ও তাদের নেতা। কুরাইশে আপনার অনুগত লোকের সংখ্যা অনেক। শেষ পর্যন্ত যা কল্যাণকর হবে, তা তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে আপনার কি কোনো আগ্রহ নেই? উতবা জিজ্ঞেস করলো, হাকিম, সেই কাজটা কী? হাকিম বললো, আপনি লোকদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আর আপনার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ আমর বিন আল-হাযরামির বিষয়টিও আপনিই দেখুন। আবদুল্লাহ বিন যাহাশ রা.-এর একটি অভিযানের ফলে আমর বিন আল-হাযরামি নিহত হয়েছিলো। উতবা বললো, আমি তা করেছি। আমিই তার রক্তপণ দেবো। তুমি যা বলেছো, সে ছিলো আমার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ; সুতরাং তার রক্তপণ দেয়ার দায়িত্ব আমার। আর তার সম্পদের ব্যাপারটি মনে করো ইবনুল হানাযালিয়্যাই দেখা-শোনা করে। ইবনুল হানযালিয়্যা মানে আবু জাহ্ল। তার মায়ের নাম ছিলো হানযালিয়্যা। উতবা বলে, আমি আশঙ্কা করি, লোকদের আর কেউ নয়, আবু জাহ্লই গণ্ডগোল বাঁধাবে। উতবা বিন রবিয়া ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে গেলো। সে কুরাইশ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললো, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের মোকাবিলা করে ভালো কিছু করতে পারবে না। তোমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করো, তবে যে-লোকেরা তার দিকে তাকাতে ঘৃণাবোধ করতো, তারাই তার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে। কারণ তারা তাদের চাচাতো ভাই বা মামাতো ভাই বা তাদের গোত্রের একজনকে হত্যা করেছে। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও আর গোটা আরব ও মুহাম্মদের মধ্যে রাস্তা খুলে দাও। তারা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করে তবে তাই তো তোমরা চেয়েছো। তোমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে। আর যদি অন্য কিছু ঘটে তবে সে তোমাদের দেখবে এবং তোমরা যা চাও তা তার থেকে আদায় করতে পারবে না।'

হাকিম বিন হিযাম আবু জাহ্লের কাছে যায় এবং উতবা বিন রবিয়ার বক্তব্যের বিষয়ে বলে। উতবার এমন বক্তব্যের কথা শুনেই আবু জাহ্ল বলে

ওঠে, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের দেখে উতবার ফুসফুস ফুলে উঠেছে। অসম্ভব, আমরা কিছুতেই ফিরে যাবো না। আল্লাহ আমাদের মধ্যে আর মুহাম্মদের মধ্যে ফয়সালা করার আগে আমরা মক্কায় ফিরবো না।' সঙ্গে সঙ্গে সে আমর বিন আল-হাযরামির ভাই আমির বিন আল-গাযরামিকে ডেকে বললো, 'তুমি যাও, তুমি গিয়ে তোমার ভাইয়ের প্রতিশোধ দাবি করো। তুমি তোমার ভাইয়ের মৃত্যু ও মৈত্রীচুক্তির কথা ঘোষণা করো।' এই কথা শোনামাত্রই আমির বিন আল-হাযরামি উঠে গেলো এবং আর্তনাদ করে বলতে লাগলো, হায়, আমার ভাই আমর! হায়, আমার ভাই আমর! তার এই আর্তনাদ শুনে লোকদের ভেতর ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে। তারা উতবার বিরোধিতা শুরু করে। উতবা বিন রবিয়ার সব পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়। কুরাইশের যোদ্ধা বাহিনী কঠিন হয়ে ওঠে। তারপর কী ঘটে? আগামীকাল ইনশাআল্লাহ নবুওয়তের পবিত্র দস্তরখানে আমরা মিলিত হবো। এই আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহপাক অবশ্যই আমাদের উপকৃত করবেন। তিনি আমাদের খুবই নিকটে আছেন; তিনি সবকিছু শোনেন এবং সাড়া দেন। আপনাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

বদর যুদ্ধ : তিন

আমরা বদর যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। এই যুদ্ধই মানবেতিহাসের দিকচিহ্নকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। বাস্তবিকই মুসলমানরা যদি সেদিন পরাজিত হতো, পৃথিবীর বুক থেকে ইসলাম শেষ হয়ে যেতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই দোয়া করেছেন—

اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض

'হে আল্লাহ, তুমি যদি এই দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তবে জমিনে কিছুতেই তোমার ইবাদত হবে না।'

বুদ্ধিমানের পরামর্শ

আমরা বলেছিলাম, হাকিম বিন হিযামের পরামর্শ শোনার পর উতবা বিন রবিয়া ফাটল মেরামত করার চেষ্টা করেছিলো এবং লোকদের নিয়ে মক্কায় ফিরে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি যে নষ্ট করে দেয় সে হচ্ছে আবু জাহ্ল। সে আমির বিন আল-হাযরামিকে উসকে দেয় এবং সে তার ভাই আমর বিন আল-হাযরামির হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে আর্তনাদ করতে থাকে। বদর যুদ্ধের দেড় মাস আগে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ রা.-এর নেতৃত্বে একটি দল আমর বিন আল-হাযরামিকে হত্যা করে। আমরা বলেছিলাম, উতবা বিন রবিয়া একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। কিন্তু বিপর্যয়ক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমানের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। এ-ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে একজন বক্রচিন্তার লোক অনেক বুদ্ধিমানের উপদেশ-পরামর্শ বিনষ্ট করে দেয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—إن كان فيهم خير ففي صاحب الجمل الأحمر 'তাদের মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ থাকে তবে তা আছে লাল উটের মালিকের মধ্যে।' লাল উটের মালিক বলতে তিনি উতবা বিন আমরকে বুঝিয়েছিলেন। যখন আমির বিন আল-হাযরামি 'হায়, আমার ভাই আমর! হায়, আমার ভাই আমর!' বলে আর্তনাদ করতে থাকে, তার এই আর্তনাদের নিচে উতবা বিন রবিয়া, হাকিম বিন হিযাম ও অন্যদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে। তারা লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আরিশে দোয়া করলেন। দোয়ার পর বললেন, إذا اكتنفوكم فاكثبوهم بالنبل 'তারা যখন তোমাদের কাছাকাছি আসবে, তোমরা তাদের দিকে তীর ছুঁড়ে আঘাত

হানবে।' যুবকেরা খুব উত্তেজিত ছিলো। সব মানুষই উত্তেজিত ছিলো। এই প্রথম কাফেররা মুসলমানদের মুখোমুখি হচ্ছে।

আবু জাহ্ল তখন যুদ্ধের ময়দানে। তার চারপাশে কাফের যোদ্ধাদের দেয়াল। তারা তাকে বেষ্টনি দিয়ে আছে। যেনো ঘন বৃক্ষরাশি একটি মাত্র কাঠামোকে চারদিক থেকে আড়াল করে আছে। তারা চিৎকার করে বলছে, কিছুতেই কেউ আবুল হাকামের[১৪] কাছাকাছি ঘেঁষতে পারবে না। কিন্তু আবদুর রহমান বিন আওফ বলেন, 'বদর প্রান্তরে আমি যুদ্ধে রত আছি, এমন সময় আমার দুই পাশে দুই আনসার তরুণকে দেখতে পেলাম। আশা করেছিলাম, আমি তাদের একজন থেকে বা তাদের উভয়জন থেকে অধিক শক্তিশালী। তাদের প্রথমজন আমাকে বললো, "চাচা, আবু জাহ্ল কোথায় আছে? আমি বললাম, তাকে দিয়ে তোমার কী দরকার? তরুণটি বললো, আমি শুনেছি সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি-গালাজ করে। আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, যদি আমি তাকে দেখতে পাই, আমার ছায়া তার ছায়া মাড়ানোর আগেই আমাদের একজনের মৃত্যু ঘটবে।"' [তাকে যেখানেই দেখবো সেখানেই হত্যা করবো নতুবা তার সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দেবো।]

তার বয়স কতো হবে তখন? এই সতেরো বছর। হযরত হুযায়ফা রা. থেকেও ছোটো হবে। দ্বিতীয় তরুণটিও আবদুর রহমান বিন আওফের কাছে একই কথা জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন, 'কিছুক্ষণ পর আমি আবু জাহ্লকে দেখতে পেলাম। আমি তাদেরকে বললাম, ওই যে আবু জাহ্ল। তারা বাজপাখির মতো তার ওপর উড়ে পড়লো।' তাঁরা ছিলেন পুরুষ, তরুণ। তাঁরা মৃত্যুকে গ্রহণ করার জন্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিলেন। তাঁদের গন্তব্য ছিলো জান্নাত। হযরত মুআয রা. বলেন, —এটা বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা—তাঁরা হলেন মুআয বিন আমর বিন আল-জামুহ ও মুআয বিন আফরা। অপর বর্ণনা, সিরাতে বিন হিশামের বর্ণনায় আছে, তাঁরা হলেন, আফরার দুই পুত্র মুআয ও মুআউয়ায। মুআয রা. বলেন, 'আমি তাকে দেখতে পেয়েই তার পায়ে আঘাত করি এবং তার টাখনুর অর্ধাংশ উড়ে যায়।' খেজুরের বিচির ওপর হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে যেমন হাতুড়ির নিচ থেকে বিচির অর্ধাংশ বেরিয়ে যায় তেমনি তরবারির নিচ থেকে আবু জাহ্লের টাখনুর অর্ধাংশ বেরিয়ে গেলো। যেনো তা বিনষ্ট খেজুরের বিচি। মুআয রা. বলেন, 'আবু জাহ্লের পেছনে ছিলো তার ছেলে ইকরামা। সে আমার হাতে আঘাত করে। তার আঘাতে আমার বাহু ছিন্ন হয়ে গেলেও চামড়ার সঙ্গে

---

[১৪] আবু জাহ্লের নাম ছিলো আবুল হাকাম (জ্ঞানের পিতা); রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরোধিতার কারণে তার নাম হয় আবু জাহ্ল (মূর্খতার পিতা)।

ঝুলতে থাকে। ছিন্ন বাহুটি চামড়ার সঙ্গে ঝুলছিলো আর আমি এভাবেই যুদ্ধ করছিলাম। কাটা স্থান থেকে রক্ত ঝরছিলো। অবশেষে আমি বললাম, এই হাত তো আমাকে ক্লান্ত করে ছেড়েছে। তারপর ছিন্ন বাহুটি পায়ের নিচে চেপে ধরে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম।'

আমরা কেমন পুরুষ? আমাদের কারো পায়ে যদি একটি কাঁটা বেঁধে, সারাদিন এটা তাকে কাতর করে রাখে। তাঁরাও পুরুষ ছিলেন! কর্তিত বাহু, চামড়ার সঙ্গে ঝুলন্ত। সেই ঝুলন্ত বাহু নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তাঁরা তরবারির আঘাতে আবু জাহ্লকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললেন। সে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে রইলো কিন্তু মরলো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, من يتفقد لنا أبا جهل بين القتلى 'কে মৃতদের মধ্য থেকে আবু জাহ্লকে খুঁজে আনতে পারবে?' আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, 'আমি বের হলাম এবং মৃতদের মধ্যে আবু জাহ্লকে খুঁজতে লাগলাম। এক সময় তাকে পেয়ে গেলাম। সে তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসগুলো নিচ্ছিলো।' তিনি বলেন, 'আমি তার বুকের ওপর বসলাম। তাকে বললাম, "হে আল্লাহর শত্রু, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন।" সে আমাকে বললো, "তুই কি মক্কায় আমাদের তুচ্ছ রাখাল ছিলি না?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, ছিলাম, হে আল্লাহর দুশমন।"'

আবু জাহ্ল শুধু রাখাল (راعي) বলে নি, বলেছে তুচ্ছ রাখাল (رويعي)। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, 'সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, "আজ কার বিজয় হয়েছে?"' চিন্তা করুন, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণের সময়ও সে জিজ্ঞেস করছে, কে বিজয়ী? তিনি বলেন, 'আমি বললাম, "বিজয় হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের।"' তিনি বলেন, 'এরপর আমি তার মাথা ধরে ঝাঁকি দিই। তাকে আমি বহন করে নিয়ে আসি এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে রাখি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে বলেন—

الله الذي لا إله غيره ، إن لكل أمة فرعون وهذا فرعون هذه الأمة، "আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, —এটা ছিলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কসম; অর্থাৎ সেই আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।—প্রত্যেক উম্মতের একটি ফেরাউন আছে। এ হলো এই উম্মতের ফেরাউন।"'

একটি বর্ণনায় আছে : —আমার মনে হয় না বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থে বর্ণনাটি আছে এবং কাহিনিকারেরাও বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোকপাক করেন নি।—মক্কায় আবু জাহ্ল একবার আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-কে শাস্তি দিয়েছিলো। সে তাঁকে ধরে বেঁধে রেখেছিলো এবং কঠিন যন্ত্রণা দিয়েছিলো। বিন মাসউদ রা. চিকন-চাকন ও দুর্বল ছিলেন। মানে তাঁর ওজন আমার

ধারণা পঁয়ত্রিশ কেজির বেশি ছিলো না। সিরাতের গ্রন্থে আমরা এমনই তথ্য পেয়েছি। যাই হোক, আবু জাহ্ল বিন মাসউদকে বেঁধে রাখে এবং কানে-মাথায় আঘাত করে তাকে শাস্তি দেয়। বদর যুদ্ধে বিন মাসউদ রা. আবু জাহ্লের মাথা বহন করতে পারছিলেন না। তার মাথা ছিলো খুব বড়ো। উতবা বিন রাবিয়ার মাথাও বড়ো ছিলো। সে তার মাথায় পরার জন্যে একটি শিরস্ত্রাণ খোঁজাখুজি করে; কিন্তু তার মাথার মাপের কোনো শিরস্ত্রাণ পায় নি। উতবা ছিলো ضخم الجثة والهامة / বিশাল দেহী ও বড়ো মাথার অধিকারী। ضخامة الهامة বা মাথা বড়ো হওয়া আরবে পৌরুষের নিদর্শন ছিলো। কারো প্রশংসা করা হলে বা কারো সদগুণ বর্ণনা করা হলে বলা হতো فلان ضخم الهامة / অমুকের বিশাল মাথা। তারা যখন রাসুল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসা করতো, বলতো, তিনি বিশাল মাথার অধিকারী। আবু জাহ্লও ছিলো বিশাল মাথার অধিকারী। তাই আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. যখন তার মৃতদেহ বহন করতে যান—আমার মনে হয় না এই বর্ণনাটির কোনো ভিত্তি আছে—বহন করতে পারেন নি। তাই কানের ভেতর ছিদ্র করে বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে দেখলেন, বললেন—أذن بأذن والرأس زيادة—'কানের বদলে কান আর মাথাটা বাড়তি।' কিন্তু কোনো সিরাতগ্রন্থে এই ঘটনা আমি পাই নি এবং কোনো হাদিসের কিতাবেও পড়ি নি।

যুবক শ্রেণী

রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধের সময় যুবক শ্রেণীর ওপরই নির্ভর করে। বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন গেরিলা অভিযানের জন্যে আঠারো থেকে বিশ বছর বয়সী তরুণদের বেছে নিয়েছিলো। যেসব অভিযান আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা ও চরম সাহসিকতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হয় সেসব অভিযানের জন্যেই এমন তরুণদের বেছে নেয়া হয়। এই বয়সের তরুণেরা মৃত্যুকে কিছু মনে করে না, গণনার মধ্যেই আনে না তারা মৃত্যুকে; মৃত্যু তাদের কাছে তুচ্ছ। বিশেষ করে যখন তাদের আকিদা ও বিশ্বাসের ওপর দীক্ষিত করে তোলা হয়। বয়স্করা এ-ব্যাপারে অনেক বিবেচনা করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

يَشِيبُ ابْنُ آدَمَ وَيَبْقَى مَعَهُ خَصْلَتَانِ الْحِرْصُ وَ طول الْأَمَلُ

'আদম সন্তান বয়স্ক হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি খাসলতেরও বয়স বাড়তে থাকে—লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা।'[১৫] এটা সহিহ হাদিস।

---

[১৫] সহিহুল বুখারি, হাদিস ৬৫২৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৯৬০; সুনানুত তিরমিযি, হাদিস ২৩৭৯; সুনানুন নাসায়িল কুবরা, হাদিস ২০৬৪।

১৯৬৯-৭০ সালের দিকে আমরা গেরিলা অভিযানে ছিলাম। ফাতাহ কিছু যুবককে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যে চীন ও আলজেরিয়ায় পাঠিয়েছিলো। আমরা ভিন্ন কয়েকটি ঘাঁটিতে ছিলাম। এসব ঘাঁটিতে তারাই ছিলো যারা নিজেদের স্বেচ্ছায় এই কাজে সম্পৃক্ত করেছিলো। তারা আমাদেরকে শায়খ বলতো এবং আমাদের ঘাঁটিগুলো শায়খদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিলো। শায়খদের অনেকেই তাদেরকে উপদেশ দিতো : 'বুদ্ধিমানেরা কখনো দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অভিযানে অংশগ্রহণ করে না।' কারণ যারা চতুর তারা আপনার অভিযান ব্যর্থ করে দিতে পারে। তারা অনেক অনেক বিষয় বিবেচনা করে। আপনাকে বলতে পারে, এখানে মাইন আছে, ওখানে ট্যাঙ্ক আছে, সেখানে বিপদ আছে। এসব বলে প্রথম দিন আপনাকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে এবং দ্বিতীয় দিন আপনার সব অভিযান ব্যর্থ হবে। তাই দুঃসাহসিকতাপূর্ণ গেরিলা অভিযানের জন্যে এমন যুবকদের বেছে নিতে হয় যারা মৃত্যুকে তুচ্ছ মনে করে এবং অত বেশি চিন্তা-ভাবনা করে না। তারাই এসব অভিযান পরিচালনা করতে পারে।

বাস্তবতা হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই যুবক শ্রেণির মাধ্যমেই বিজয় লাভ করেছিলেন। সাহাবিদের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। যুদ্ধে অংশগ্রহণ-করা তিন-চতুর্থাংশের বেশি সাহাবির বয়স ছিলো বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। এই বয়স আত্মত্যাগের বয়স, আত্মোৎসর্গের বয়স, ঝুঁকি গহণ করার বয়স। এই বয়সের যুবা-তরুণেরা নিজের ভবিষ্যতের জন্য কিছু ভাবে না। তাদের স্বপ্ন শূন্যতাকে ছাড়িয়ে যায়। তাদের স্বপ্ন কালপুরুষ নক্ষত্রকে স্পর্শ করে। তাদের ভেতর সবকিছু বাস্তব করার স্পর্ধা জেগে থাকে। তারা কোনোকিছুকেই পরোয়া করে না। মৃত্যুকে তারা ভয় করে না।

যাই হোক। আবু জাহ্‌লকে হত্যার পর দুই তরুণের প্রত্যেকেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমিই আবু জাহ্‌লকে হত্যা করেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের তরবারি আমাকে দেখাও। তাঁরা তরবারি দেখালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমিই আবু জাহ্‌লকে হত্যা করেছো। মুআয বিন আমর বিন আল-জামুহকে তিনি এই কথা বললেন। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই : মুআয বিন আফরা, মুয়াওয়ায বিন আফরা এবং আউফ বিন আফরা।

মুসলিম সৈনিকের শত্রুর সারিতে ঢুকে পড়া

আউফ বিন আফরা জিজ্ঞেস করলেন—

يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَضْحَكُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ ؟

'ইয়া রাসুলাল্লাহ, বান্দার কোন কাজে তার প্রতিপালক হাসেন?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

غَمْسُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوِّ حَاسِرًا

'শত্রুর সারিতে তার বর্মহীন হাত ঢুকিয়ে দেয়া।' এই কথা শুনেই তিনি তাঁর গায়ের বর্ম খুলে ফেললেন এবং ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরপর তরবারি হাতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন।[১৬] আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার জন্যে হাসেন, তিনি তাঁকে কখনো শাস্তি দেন না। শত্রুর সারিতে—যদিও তারা কয়েক হাজার হয়—মুসলিম সৈনিকের একাকী ঢুকে পড়া শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। তার যদি নিশ্চিত বিশ্বাসও থাকে যে সে নিহত হবে তবু সে তা করতে পারবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের অবসন্নতা লক্ষ করলেন, দুইটি বর্ম পরিধান করে বেরিয়ে এলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল চাঙ্গা করতে চেয়েছিলেন। তিনি শত্রুর সারিতে বর্মহীন হাত ঢুকিয়ে দেয়ার কথা বলেছিলেন। কারণ, একাকী দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অভিযানও সমস্ত সৈনিকের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা করে তুলতে পারে। মনোবল যখন ভেঙ্গে পড়ে বা দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা অভিযানের শুরুতেই আত্মোৎসর্গমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অন্যদের আত্মবিশ্বাস ও যুদ্ধ-স্পৃহা জাগিয়ে তোলার জন্যে এমন অভিযানের বিকল্প নেই।

যদি শত শত শত্রু থাকে বা শত্রুর কয়েকটি সারি থাকে, তাহলে তাদের হাতে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কি কোনো মুসলমানের পক্ষে একাকী তাদের ভেতর ঢুকে পড়া বৈধ?—এ-ব্যাপারে আলেমদের ফতোয়া রয়েছে। তাঁরা বলেছেন, যখন জানবে যে সে শহীদ হবে, শত্রুদেরকে চরমভাবে ক্ষতবিক্ষত করবে বা মুসলমানদের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করবে, সে তাদের আত্মবিশ্বাস ও সংকল্প দৃঢ় করে তুলবে—এতে কোনো সমস্যা নেই। বরং তারা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

'মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তার আত্মা বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।' [সুরা বাকারা : আয়াত ২০৭]

---

[১৬] কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, এই কথা আউফ বিন আফরা নয়, বরং বলেছিলেন মুআয বিন আফরা। দেখুন : মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং ১৯৮৪৮ ও ১৯৪৯৯; তাফসির ফি যিলালির কুরআন, সুরা আনফাল; আল-ফাতাওয়া আদ-দীনিয়্যাহ ফিল আমালিয়্যাতিল ইস্‌তিশ্‌হাদিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১-২৭।

বরং শায়খুল ইসলাম বিন তাইমিয়া বলেছেন, 'এমন অভিযানের ব্যাপারে হাদিসেও প্রমাণ বিদ্যমান। হাদিসে সেই বালকের কথা এসেছে, যে বাদশাহকে বলেছিলো, "সমস্ত মানুষকে একত্র না করে আপনি আমাকে কিছুতেই হত্যা করবেন না। এবং আমাকে হত্যা করার সময় বলবেন, এই বালকের প্রতিপালকের নামে আমি এই বালককে হত্যা করলাম।" বালক বাদশাহকে যেভাবে বলেছিলো, বাদশাহ তাকে সেভাবেই হত্যা করলো। বালক দীনের কল্যাণের জন্যে আপন প্রাণকে উৎসর্গ করেছে। মানুষ যখন দেখলো বাদশাহ বালকটিকে এভাবে হত্যা করছে, তারা বলে উঠলো, আমরা এই বালকের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এদের সম্পর্কেই কুরআনে বলা হয়েছে : 'মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তার আত্মা বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।'

এই ধরনের অভিযানকে কোনো অবস্থাতেই নিন্দাসূচকভাবে আত্মঘাতী বা আত্মহত্যা বলা যাবে না। যদি কাফেরদের দল বিশাল হয় এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের শত্রুতা চরম হয় এবং তারা ইসলাম ধর্মের বিনাশ ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয় আর আপনি আপনার বুকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং জীবন বিসর্জন দেন, তাহলে আপনি সেই ব্যক্তি, কুরআন শরিফে যার সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তার আত্মা বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।' এটা কখনই আত্মহত্যা হিসেবে বিবেচিত হবে না। বরং এটা—আল্লাহ চান তো—শাহাদাতের সর্বোচ্চ পর্যায়।

ব্যভিচারের অপরাধে গামেদিয়ার গায়ে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো। খালেদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর গায়ে রক্তের ছিটা এসে পড়লে তিনি বিদ্রূপাত্মক কথা বলেছিলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, থামো হে খালেদ! সে যে-তওবা করেছে তা সকল মদিনাবাসী বা পঞ্চাশজন মদিনাবাসীর জন্যে বণ্টন করে দিলে তা তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে। সে যেভাবে আল্লাহর জন্যে তাঁর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে—তার চেয়ে কি তারা বেশি হবে না-কি তারা শ্রেষ্ঠ?'[১৭] এই নারী নিজেকে আল্লাহর জন্যে সমর্পণ

---

[১৭] এই হাদিসের ভাষ্য বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে বিভিন্ন রকম এসেছে : কোথাও সত্তর জন, কোথাও পঞ্চাশ জন, কোথাও সকল মদিনাবাসীর কথা বলা হয়েছে; কোনো গ্রন্থে এসেছে, 'তার কি জানাযার নামায পড়া হবে অথচ সে ব্যভিচার করেছে? —উমর রা.-এর এই জিজ্ঞাসার উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথা বলেছিলেন; কোনো গ্রন্থে আত্মোৎসর্গের পরিবর্তে তার উত্তম তওবার কথা বলা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন : ফয়যুল

করেছিলেন। তিনি একবার, দুইবার, তিনবার এবং বার বার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসছিলেন নিজকে পবিত্র করার জন্যে। রাসুল তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি আবারও আসছিলেন। তিনি বারবার বলছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে পবিত্র করুন। এভাবে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

ষাটের দশকের শেষের দিকে ভারত পাকিস্তানে হামলা করেছিলো। তারা লাহোরে প্রবেশ করে তা দখলে নিয়ে নিতে চেয়েছিলো। সাতশোটি ভারতীয় ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছিলো। ট্যাঙ্কগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে সাতশো পাকিস্তানি যুবক নিজেদের প্রস্তুত করে। তারা বুকে বেল্টের সাহায্যে বিস্ফোরক বেঁধে নেয় এবং ট্যাঙ্ক এলেই তার নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে তারা সাতশো ট্যাঙ্কই ধ্বংস করে ফেলে। ফলে গোটা ভারতীয় বাহিনী পরজিত হয়। মাত্র সাতশো যুবক একটি ব্যাপক যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

আমার ভাইয়েরা, এখন আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে প্রতিটি ফ্রন্টে মাত্র পঞ্চাশজন আত্মোৎসর্গকারী যুবক হলেই যথেষ্ট। তারাই রাশিয়ার ভয়াবহ আগ্রাসী শক্তিকে পরাজিত করতে পারবে। তাদের পঁচিশজন আর বি জি বহন করবে আর বাকি পঁচিশজন তাদের সাপোর্ট দেয়ার জন্যে কালাশনিকভ বহন করবে। এভাবে প্রস্তুতি নিয়ে তারা রাশিয়ার ট্যাঙ্কবহরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের প্রত্যেকে যদি একটিমাত্রও ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে, পঁচিশটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হবে। এতে গোটা ব্যাটালিয়ন পরাজিত হবে। মুষ্টিমেয় যুবকের আত্মোৎসর্গের ফলে অধিকাংশ যুদ্ধফ্রন্টের পরিস্থিতি পাল্টে গেছে এবং মুসলমানেরা বিজয় লাভ করেছে।

জাজি যুদ্ধক্ষেত্রের কথা বলি। আপনারা নিশ্চয় জাজি চেনেন। তার পাশে বিরোজাও আপনারা চেনেন। ওখানে সুড়ঙ্গপথ আছে। বিরোজা মানে ফিরোজা—বিরোজা নামে ডাকা হয়। ওখানে কাঠের যে-কারখানাটি আছে, রাশিয়ার ট্যাঙ্কবহর একবার সেখানে পৌছে যায়। আপনি বিরোজাতে গিয়ে ডানদিকে যদি একটু ঘোরেন, কাঠের কারখানাটি দেখতে পাবেন। এই কারখানাটি এখন বিধ্বস্ত। রাশিয়ার ট্যাঙ্কবহর ওখানে চলে আসে এবং জাজিতে ঢোকার উপক্রম করে। এই পরিস্থিতিতে মুজাহিদদের একজন সেনা-উপদেষ্টা ওখানে আসেন। তিনি মুহাম্মদ সিদ্দিক চেকরিকে বলেন, 'আপনি গুদাম জ্বালিয়ে দিন এবং পালিয়ে যান। এতে যদি আপনার পাপ হয় বা অন্যকোনো সমস্যা হয়, তার দায়-দায়িত্ব আমার।' মুহাম্মদ সিদ্দিক

বারি শারহু সহিহিল বুখারি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩ ও ১৩৪; মু'জাম আত-তাবরানি মাশকুলান, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৬১; আস-সুনানুল কুবরা, ইমাম নাসায়ি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

চেকরি বলেন, 'আল্লাহর কসম, ট্যাঙ্ক যদি আমার মাথাও গুঁড়িয়ে দেয়, আমি একচুলও নড়বো না।' এরপর তিনি যুবকদের আহ্বান জানান : হে যুবকেরা, কে আছো মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত, বেরিয়ে এসো। তিনি গুদামের দরজা খুলে দেন এবং যুবকদের মনোবল দৃঢ় রাখার জন্যে জোর দেন। কিছু যুবক গুদাম থেকে বেরিয়ে আসে। আল্লাহর কসম, এরাই যুদ্ধের পরিবেশ পাল্টে দেয় এবং রুশ বাহিনী পরাজিত হয়। মাত্র একজন যুবক—মুহাম্মদ সিদ্দিক চেকরি— কতো বয়স হবে তাঁর? এই তো ছাব্বিশ কি সাতাশ। তাঁর দৃঢ় মনোবলের কারণেই ঐ ফ্রন্টে রুশ বাহিনী পরাজয় বরণ করে আর মুসলমানেরা বিজয়ী হয়।

তিনি যখন কাবুলে ছিলেন, অধিকাংশ রাতই নির্ঘুম কাটতেন। ঘুমের স্বাদ পেতেন না বললেই চলে। তিনি কাবুলের রাত্রিকালীন শাসক হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি চেকরি থেকে এসেছিলেন। আর বাবরাক কারমাল এসেছিলো কেমরি থেকে। চেকরি ও কেমরির মধ্যস্থলে একটি ছোটো নদী আছে। এই নদীর তীরবর্তী এলাকায় যেসব উদ্যান ছিলো, মুহাম্মদ সিদ্দিক বাবরাক কারমালকে[১৮] সেসব উদ্যানের একটি ফলও আহরণ করতে দেন নি। তিনি কারমালের বাগানগুলোতে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মন্ত্রীরা তাঁর কাছে চিঠি পাঠান : 'হে মুহাম্মদ সিদ্দিক, আপনি কারমালের বাগানগুলোতে বাদশা গাজির জন্যে যে-প্রতিবন্ধক তৈরি করেছেন তা তুলে নিন। আপনি যা চান আমরা আপনাকে তাই দেবো।' মুহাম্মদ সিদ্দিক মন্ত্রীদের কাছে চিঠি পাঠান : 'আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন। আপনারা যা চান আমি আপনাদের তাই দেবো।'

তাঁর সঙ্গে শেষ লড়াইয়ে রুশ বিমানবাহিনীর ১৫১ টি জঙ্গি বিমান অংশ নিয়েছিলো। তাদের ট্যাঙ্কের সংখ্যা যে কত ছিলো তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তারা মুহাম্মদ সিদ্দিক চেকরির ঘাঁটি খুঁজতে থাকে। একসময় তারা তাঁর ঘাঁটির সন্ধান পায় এবং তিনি যে-কেন্দ্রে থাকতেন তাতে রুশ সেনারা প্রবেশ করে। কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। তিনি আরেকটি ঘাঁটির সন্ধানে গিয়েছিলেন। নিজের ঘাঁটিতে ফেরার সময় তিনি রুশ বাহিনীর সামনে পড়েন। তাঁর ও রুশ সেনাদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র একশো মিটার। দিনের বেলা তখন আকাশে ঝকঝকে রোদ ছিলো। কোনো পাথর বা টিলা বা পাহাড় ছিলো না মুহাম্মদ সিদ্দিক যার আড়ালে চলে যেতে পারেন। রুশ সেনারা তাঁকে লক্ষ করে আশি থেকে একশোটি গুলি ছোঁড়ে। তিনি আশঙ্কা

---

[১৮] বাবরাক কারমাল ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ থেকে ২৪ শে নভেম্বর, ১৯৮৬ পর্যন্ত আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯২৯ সালের ৬ই জানুয়ারি তিনি আফগানিস্তানের কামারাইতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৬ সালের ১লা বা ৩রা ডিসেম্বর মস্কোতে মৃত্যুবরণ করেন।

করলেন যে রুশ সেনাদের হাতে ধরা পড়ে যাবেন। তিনি তাঁর ঘাটির সদস্যদের আহ্বান জানান : 'হে আমার দল, আমি তোমাদের কমান্ডার মুহাম্মদ সিদ্দিক চেকরি। আমি শত্রুর কবলে পড়েছি। তারা আমাকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করে যাচ্ছে।' রুশ সেনারা তাঁকে সাড়ে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় গুলি ছোঁড়ে। তাঁর গায়ের পোশাক জ্বলে যায় এবং প্রায় তিরিশটি গুলি তাঁর কাপড় ভেদ করে। কিন্তু একটি গুলিও তাঁর শরীরের বেঁধে নি এবং তিনি সামান্যও আহত হন নি।

হ্যাঁ, আমি যা বলছিলাম, বাস্তব হলো যুদ্ধজয়ের জন্যে তরুণ-যুবাশ্রেণি বিকল্পহীনভাবে অপরিহার্য। বিশেষ করে যাদের যাদের জীবন আকিদা ও বিশ্বাসের ওপর গড়ে উঠেছে। মৃত্যুকে যারা পরোয়া করে না; মৃত্যুকে ভালোবেসে যারা বেড়ে উঠেছে। যুদ্ধে জয়ের জন্যে যুবকশ্রেণীই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। তিনি বলেছিলেন, 'হে মক্কার সম্প্রদায়, তোমরা কি আমার সঙ্গীদের কারণে আমাকে দোষারোপ করছো?'[১৯] রাসুলের সাহাবিদের প্রায় সবাই তো যুবকই ছিলেন। আল্লাহর কসম, তাঁরা তাঁদের যৌবনেই পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। আপনাদের মত যুবকেরা যখন ইসলামের ওপর দীক্ষিত হবে, খোদাভীতি অর্জন করবে, অন্যায়, পাপাচার ও নিষিদ্ধ কার্যাবলি থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা মেনে চলবে—আল্লাহু আকবার—তাঁরা হবে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মুসলমান। আল্লাহর কসম, এই দুনিয়ার সবকিছু থেকে এই বিষয়গুলো আমার কাছে প্রিয়। যে-যুবকেরা আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলে, আল্লাহকে ভয় করে, তাকওয়া অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে সবার চেয়ে প্রিয়।

فدت نفسي وما ملكت يميني

فوارس صد قت فيهم ظنوني

فوارس لا يهابون المنايا

إذا دارت رحى الحرب الزبون

'আমি তাদের জন্যে উৎসর্গ করেছি আমার প্রাণ এবং যা-কিছু আছে আমার মালিকানায়।/ তারা বীরসেনানী—আমার বিশ্বাস বাস্তব করেছে।/ বীরসেনানী তারা—ভয় করে না মৃত্যু;/ যখন সংঘটিত হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ ।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে বনু হাশেম ও অন্যরা বাধ্য হয়ে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তাই তিনি বললেন, 'তোমরা বনু

---

[১৯] কুরাইশরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুবকদের মাথা নষ্ট করেছেন বলে দোষারোপ করতো।

হাশেমের অনেক মানুষকে পাবে যারা বাধ্য হয়েই এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। যুদ্ধের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা তাদের কাউকে সামনে পেলে হত্যা করবে না। কেউ যদি আবুল বুখতুরি বিন হিশামকে—ইনি কাবা শরিফে বয়কটের যে-দলিলপত্র ছিলো ছিঁড়ে ফেলেছিলেন—পায় তাকে হত্যা করবে না। তোমাদের কেউ আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকেও সামনে পেলে হত্যা করবে না। কারণ তারা বাধ্য হয়ে বদরে এসেছে।' রাসুলের এই কথা শুনে মুমিনদের একজন আবু হুযাইফা বিন উতবা বিন রবিয়া বললেন, 'আমারা আমাদের পিতা ও পিতৃব্যদের এবং সন্তান ও প্রতিবেশীদের হত্যা করবো আর আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে কি ছেড়ে দেবো? আল্লাহর কসম, তার দেখা যদি পাই তরবারি দিয়েই তার মোকাবিলা করবো।' আবু হুযায়ফার এই কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কানে পৌঁছে গেলো। তিনি উমর রা.-কে ডেকে বললেন, 'ইয়া আবু হাফ্স্, —উমর রা. বলেন, জীবনে এই প্রথম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আমার উপনামে ডাকলেন—রাসুলের চাচার চেহারা কি আজ তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হবে?' উমর রা. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন তাকে [আবু হুযায়ফা বিন উতবা] হত্যা করে ফেলি। সে তো মুনাফিক হয়ে গেছে।' এই ঘটনার পর আবু হুযায়ফা বলেন, 'ঐ কথা বলার কারণে আমি কখনো স্বস্তি বোধ করি নি। যে-অপরাধ করেছি তার জন্যে ভয়ে ভয়ে থাকতাম। আমি ভাবতাম, শহীদ হওয়া ছাড়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্য হবে না।' ইমামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আল্লাহপাক তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আছেন।[২০]

মুখোমুখি লড়াই

বদর যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই মুখোমুখি লড়াই হয়ে গেলো। উতবা বিন রবিয়া, তার ভাই শায়বা বিন রবিয়া এবং তার ছেলে ওয়ালিদ বিন উতবা রণাঙ্গনে নেমে এলো। তারা হুঙ্কার দিয়ে বললো, মুহাম্মদ, তুমি আমাদের সমকক্ষ বাছাই করে আনো তো দেখি! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা ও চাচাতো ভাইদের বেছে নিলেন। তিনি চাচা হামযা রা., চাচাতো ভাই আলি বিন আবি তালিব রা. এবং উবাইদা বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব রা.-কে বেছে নিলেন। উবাইদা বিন হারিস রা. উতবার, হামযা রা.

---

[২০] বিস্তারিত দেখুন : ইমাম ইসমাইল বিন উমর বিন দাউও ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, দারুশ শাআব, ১৩৯০ হিজরি, ৪র্থ খণ্ড, সুরা আনফাল; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আলআনসারি আলকুরতুবি, *জামিউ লিআহকামিল কুরআন*, দারু ইহ্ইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবি, বয়রুত, লেবানন, ১৯৮৫, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।

শায়বার এবং আলি রা. ওয়ালিদের মোকাবিলা করলেন। হামযা রা. শায়বাকে হত্যা করলেন। উবাইদা বিন হারিস রা. উতবার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেলেন এবং দুজনই আহত হলেন। হামযা রা. ও আলি রা. সেদিকে ছুটে গেলেন এবং উতবাকে হত্যা করলেন। একটু পরেই উবাইদা বিন হারিস রা. মৃত্যুবরণ করেন। অথবা তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাঁধে মাথা রেখে কিছুক্ষণ পর শাহাদাতবরণ করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়—

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ () يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ () وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ () كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ()

'তারা দুটি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে; যারা কুফরি করে তাদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হবে উত্তপ্ত পানি—যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে। এবং তাদের জন্যে থাকবে লোহার হাতুড়ি। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে;—আস্বাদ করো দহনযন্ত্রণা।' [সুরা হজ : আয়াত ১৯-২২]

যুদ্ধের শুরুতে ব্যক্তি-বনাম-ব্যক্তি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা-সম্পর্কীয়দের থেকে যোদ্ধা বেছে নিয়েছিলেন যাতে প্রথম দল [মুহাজিরগণ] নিহত হলে আনসারিগণ মনে কোনো কষ্ট না পান; যাতে একথা বলা হয় : যুদ্ধের শুরুতেই যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তারা হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের সদস্য এবং আমরা তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ নই।

উতবা বিন রবিয়া, তার ভাই শায়বা বিন রবিয়া এবং তার ছেলে ওয়ালিদ বিন উতবা নিহত হওয়ার পর যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমুঠো কঙ্কর হাতে নিয়ে কাফেরদের উদ্দেশে ছড়িয়ে দিলেন এবং বললেন— شاهت الوجوه.. شاهت الوجوه চেহারাগুলো ধূলিধূসরিত হোক ... চেহারাগুলো ধূলিধূসরিত হোক। শত্রুদের এমন কেউ অবশিষ্ট ছিলো না যার চোখে কঙ্কর প্রবেশ করে নি। উকাশা বিন মুহসিন রা. লড়াই করছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখে বললেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধা উকাশা। এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে তরবারি ছিটকে পড়ে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি ডাল এগিয়ে দেন এবং তিনি ডালটি হাতে নিয়েই দেখতে পান একটি প্রচণ্ড ধারালো সাদা তরবারি। পরবর্তী সময়ে তিনি এই

তরবারি দিয়েই লড়াই করতেন। মুরতাদদের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই তরবারিটি তাঁর কাছে ছিলো। অথবা তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে তরবারিটি হারিয়ে ফেলেন।

কাফের হয়েও বিশ্বস্ত

রাসুল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছিলেন : 'তোমরা আবুল বুখতুরিকে সামনে পেলেও হত্যা করবে না।' কারণ—আমরা আগেই বলেছি—মুসলমানদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করার যে-প্রজ্ঞাপন কাবাঘরে ঝোলানো ছিলো তা তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি মুজায্যার বিন যিয়াদ রা. বা বিন যিয়াদ আলবালবির সামনে পড়লেন। মুজায্যার রা. বললেন, 'আবুল বুখতুরি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তোমাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এই জন্যে আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম।' আবুল বুখতুরির সঙ্গে তাঁর এক বন্ধু ছিলো। তাই তিনি বললেন, 'আমার বন্ধুকেও কি ছেড়ে দেবে?' মুজায্যার রা. বললেন, 'না, তাকে ছাড়বো না। তাকে ছেড়ে দেয়ার আদেশ পাই নি।' আবুল বুখতুরি বললেন, 'তাহলে আমরা দুইজন একই সঙ্গে মরবো। আমি নিজে বেঁচে গিয়ে আমার বন্ধুকে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করতে পারি না।' কী আশ্চর্য! কাফের হয়েও তিনি কতোটা বিশ্বস্ত! আমার ভাইয়েরা, এটাই হলো পৌরুষ, এটাই বন্ধুর প্রতি বন্ধুর হৃদ্যতা। আবুল বুখতুরি আরো বলেছিলেন, 'আমি নিজেকে রক্ষা করবো না। কারণ মক্কার নারীরা বলবে, আমি আমার জীবনের মায়ায় অন্ধ হয়ে আমার বন্ধুকে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়েছি।'

لن يسلم ابن حرة زميله

حتى يموت أو يرى سبيله

'বিন হির্রা তার বন্ধুকে কিছুতেই [শত্রুর হাতে] সমর্পণ করে নি;/ সে নিজে মরেছে এবং তার বন্ধুকে বাঁচাতে চেয়েছে।'

কে ছিলেন ইনি? আবুল বুখতুরি বিন হিশাম। তাঁরা পুরুষ ছিলেন। বাস্তবিকই তাঁরা ছিলেন পুরুষ। অন্ধকার-যুগের এমন পুরুষদের এবং সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী নেতা আবু খালেদের মধ্যে তুলনা করে দেখুন।

ফিলিস্তিন-যুদ্ধের সময় সেখানে বানকাশ ও আরনাউতের একটি মুজাহিদ দল ছিলো। তাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্যে যুগোস্লাভিয়া থেকে ফিলিস্তিনে এসেছিলেন। তাঁরা আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের ভেতরে ছিলো শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা। এঁদের মুখেই আমি সর্বপ্রথম জিহাদে কারামত প্রকাশিত হওয়ার কথা শুনেছি। শায়খ আবদুর রহমান আরনাউত আমাদের এলাকায় ইমাম ছিলেন। আমার বাবা তাঁকে চিনতেন। তিনি আমাকে বলেছেন, আমরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযুবি রাব্বিল

ফালাক, কুল আউযুবি রাব্বিন নাস, আয়াতুল কুরসি পড়তাম এবং আমাদের শরীরে ও জেকেটে মুছে দিতাম। আমরা হাজার হাজার ইহুদির ভেতরেও প্রবেশ করেছি। আমি সাতবার হাজার হাজার ইহুদির বেষ্টনীর ভেতরে পড়েছি। পাথরের ওপর বৃষ্টি যেমন পড়ে তেমনি আমার জেকেট থেকে গুলি পড়েছে।

আরব কর্তৃক ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। যুগোস্লাভিয়ার মুজাহিদরা তখন দামেস্কে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের অধিকাংশই দামেস্কে বসবাস করতেন। ১৯৫৮ সালে মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে মৈত্রীচুক্তি[২১] সম্পাদিত হওয়ার পর আবদুন নাসের তার ভাই মার্শাল টিটোকে জিজ্ঞেস করে, 'এই মৈত্রীচুক্তির উপঢৌকন হিসেবে আপনি কী চান?' মার্শাল টিটো বলে, 'আপনাদের কাছে যুগোস্লাভিয়ার বসনিয়া ও আরনাউতের একদল রাজনৈতিক আশ্রিত রয়েছে। তাদেরকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করুন।' আবদুন নাসেরের মধ্যস্থতায় সিরিয়ায় আশ্রিত মুজাহিদদেরকে মার্শাল টিটোর কাছে সোপর্দ করা হয়। পরের দিনই তাদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

অথচ জাহেলি যুগের আবুল বুখতুরি বিন হিশাম কী বলেছিলেন, 'আমি একা বাঁচবো না। আমার বন্ধুর ব্যাপারে তোমাদের কী সিদ্ধান্ত?' মুজায্যার রা. বললেন, 'না, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তোমার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।' আবুল বুখতুরি বললেন, 'আল্লাহর কসম, তাহলে আমি এবং আমার বন্ধু একই সঙ্গে মরবো। আমি চাই না মক্কার নারীরা বলুক আমি আমার জীবন বাঁচাতে বন্ধুকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করেছি।' কী আশ্চর্যজনক! তাঁদের পৌরুষ ছিলো; তাঁরা ছিলেন বীরপুরুষ। সত্যই তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী।

আবু সুফ্য়ান তখন কাফের ছিলেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমাদের নবীকে কি কেউ এই অপবাদ দিয়েছে যে তিনি মিথ্যাবাদী?' আবু সুফ্য়ান বললেন, 'না, তাঁকে এই অপবাদ কেউ দেয় নি।' আবু সুফ্য়ান পরে বলেছেন, 'আমি আশঙ্কা করছিলাম আমার থেকে কোনো মিথ্যা প্রকাশ হয়ে পড়ে কি-না।' সত্যই তাঁরা সত্যবাদী ছিলেন। সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন বীরপুরুষ। হ্যাঁ, এটা সত্য যে তাঁরা জাহেলি যুগে ছিলেন, ভ্রান্ত ছিলেন; কিন্তু সৎমানুষের গুণাবলি তাঁদের ভেতরে ছিলো। এসবই হলো সৎমানুষের গুণ।

---

[২১] ১৯৫৮ সালে সিরিয়া ও মিসর একত্র হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

উমাইয়া বিন খাল্ফ্ বদরের ময়দানে বেরিয়ে এলো। সে বীরপুরুষ হলেও অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলো। শরীর ছিলো মোটা ও থলথলে। বৃহৎ মৃতদেহ থেকে যেনো চর্বি গলে গলে বেরোচ্ছিলো। কুরাইশ দল তখন পালাতে শুরু করেছে। উমাইয়া বিন খাল্ফ দৌড়াতে পারছিলো না। সে তো আর সাদা এবং জাজির ঘাঁটিতে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয় নি! আবদুর রহমান বিন আওফ রা. বলেন, 'আমার কাছে বেশ কয়েকটি ঢাল ছিলো; গনিমত হিসেবে আমি সেগুলো সংগ্রহ করেছিলাম। হঠাৎ দেখি উমাইয়া বিন খাল্ফ এবং তার ছেলে আলি আমার সামনে দাঁড়ানো। সে আমাকে ডেকে বললো, হে আবদুল ইলাহ,—(আবদুর রহমান বিন আওফের নাম ছিলো আবদু আমর। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজে বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাম রাখেন আবদুর রহমান। উমাইয়া তাঁর বন্ধু ছিলো। মক্কায় দেখা হলে সে তাঁকে আগের নাম আবদু আমর বলেই ডাকতো। কিন্তু আবদুর রহমান বিন আওফ তার ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি বললেন, 'আমার নাম আবদুর রহমান। আমাকে এখন এই নামে ডাকবে। আগের নামে ডাকলে আমি সাড়া দেবো না।' উমাইয়া বললো, 'রহমান বলতে আমি কাউকে চিনি না। রহমানের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই। আমি তোমাকে ওই নামে ডাকতে পারবো না। আচ্ছা যাও, আমি তোমাকে ভিন্ন নামে ডাকবো। আবদুল ইলাহ বলে ডাকবো তোমাকে।' তাই আবদুল ইলাহ বলে ডাকলে আবদুর রহমান বিন আওফ সাড়া দিতেন।)—আমার ব্যাপারে কিছু চিন্তা করো আর তোমার হাতের ঢালগুলো রেখে দাও। এই ঢালগুলো থেকে আমিই তোমার জন্যে বেশি লাভজনক। আমার কাছে টাকাপয়সা অনেক আছে; আমি তোমাকে মুক্তিপণ দেবো।' আবদুর রহমান বিন আওফ বলেন, 'আমি হাতের ঢালগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম এবং একহাতে উমাইয়ার আরেক হাতে তার ছেলে আলিকে ধরলাম। উমাইয়া বললো, আজকের মত দিন আমার জীবনে আর আসে নি। আজকে এই জাতি দুধ ভালোবাসছে না। দুধাল উটও আজ তাদের পছন্দ হচ্ছে না। কেউ আমাকে বন্দি হিসেবে ধরতে রাজি হয় নি। যদিও আমি তাদেরকে দুধাল উটপাল দিতে চেয়েছি।' আবদুর রহমান বলেন, 'আমি তাদের দুইজনকে দুই হাতে ধরে চলতে শুরু করলাম। আমি তাদের মধ্যখানে হাঁটছিলাম এবং আনন্দ বোধ করছিলাম।'

আবদুর রহমান বিন আওফ ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি ঢালগুলো ফেলে দিয়ে তাদেরকে বন্দি হিসেবে ধরলেন। এভাবে তিনি লাভবান হলেন। তিনি বলেন, 'বেলাল যখন দেখলেন আমি উমাইয়া এবং তার ছেলের হাত ধরে আছি, বললেন, কুফরির মাথাই যদি বেঁচে গেলো তাহলে তো আপনি বাঁচলেন না। মক্কার উপকণ্ঠে ও মরুভূমিতে আমাদের ওপর যে-পাশবিক নির্যাতন করা হতো তার কথা স্মরণ করুন।' আবদুর রহমান বিন আওফ

বললেন, 'বেলাল, এরা দুইজন আমার বন্দি।' বেলাল রা. আবার বললেন, 'কুফরির মাথাই যদি বেঁচে গেলো তাহলে তো আপনি বাঁচলেন না।' আবদুর রহমান বিন আওফ বললেন, 'ওহে কৃষ্ণাঙ্গ মায়ের ছেলে, এরা দুইজন আমার বন্দি।' [আবদুর রহমান বিন আওফ রা. উমাইয়া বিন খাল্ফকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সে মদিনায় এসে যদি কোন বিপদে পড়ে বা শত্রুর হাতে পড়ে তাহলে তিনি তাকে রক্ষা করবেন। ইসলামে প্রতিশ্রুতি রক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাই তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন।] বেলাল রা. আবারও বললেন, 'কুফরির মাথাই যদি বেঁচে গেলো তাহলে তো আপনি বাঁচলেন না।' বেলাল রা. বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি যদি মুহাজিরদের ডাকি, তারা তো উমাইয়াকে হত্যা করবে না। আমি যাদের কাছে উমাইয়ার নির্যাতনের গল্প বলেছি, তাদেরকেই আমি ডাকতে চাই। তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে তাদের অন্তর ভরে আছে এবং তারা তাকে চেনে না। তিনি ডাকলেন 'হে আনসার সম্প্রদায়, কাফেরদের নেতা উমাইয়া বিন খাল্ফ এই যে এখানে।' এই আহ্বান শুনে আনসারি তরুণেরা উমাইয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাফেরদের নেতাদের বিরুদ্ধে মুসিলম যুবকদের ভেতর দৃঢ় চেতনা থাকা উত্তম ও অপরিহার্য। তাদের সঙ্গে মুসলিম যুবকদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। যুবকেরা যদি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখে, তাদের সঙ্গে উঠাবসা করে, চা-কফি পান করে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং আরো নানা প্রক্রিয়ায় সম্পর্ক স্থাপন করে, তাদের ভেতর থেকে পবিত্রতা, বিশ্বস্ততা এবং ঈমানের চেতনা হ্রাস পাবে।

এ-কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেয়েছিলেন যে মুসলমানেরা যেনো কাফেরদের সঙ্গে মাখামাখি না করে। তিনি চেয়েছিলেন, তারা যেনো কাফেরদের মধ্যে বসবাস না করে। কারণ, কাফেরদের সঙ্গে বসবাস ও মাখামাখি; তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা অব্যাহত রাখলে মুসলমানদের মধ্য থেকে সৎ গুণাবলি হ্রাস পাবে। মুসলমানেরা সেই দিনগুলোর কথা ভাববে [এবং দুর্বল হবে] যখন তারা কাফেরদের প্রতিবেশী ছিলো, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিলো এবং তাদের মধ্যে নানা কার্যক্রম ছিলো। আনসারি যুবকেরা বিশুদ্ধ চেতনার অধিকারী। কাফেরদের সঙ্গে তাদের চা-রুটি-লবণ-পেঁয়াজের বিনিময় হয় নি।

আনসারি তরুণেরা জমায়েত হলে বেলাল রা. উমাইয়াকে আঘাত করলেন। আবদুর রহমান বিন আওফ তাকে বললেন, 'তুমি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্ট করো। মনে হয় আমি তোমাকে বাঁচাতে পারবো না। এক কাজ করো, তুমি শুয়ে পড়ো।' উমাইয়া শুয়ে পড়লো। আবদুর রহমান বিন আওফ তার ওপর ঝাঁপ দিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং এমনভাবে ঢেকে রাখলেন যাতে তাঁকে না মেরে কেউ উমাইয়াকে আঘাত না করতে পারে। কিন্তু আনসারি তরুণেরা

উত্তেজিত হয়ে পড়লো। তারা আবদুর রহমান বিন আওফের পায়ের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে উমাইয়াকে আঘাত করতে লাগলো। তিনি উমাইয়াকে বললেন, 'তুমি কি পালাতে পারবে? পালাতে পারলে এখন পালিয়ে যাও। আমি তোমাকে সাহায্য করি।' কিন্তু বিরাট থলথলে দেহ নিয়ে সে পালাবে কোথায়? সে আনসারি তরুণদের মার খেতেই থাকলো এবং একসময় মারা গেলো। তার ছেলে আলিও আনসারি তরুণদের হাতে মারা পড়লো। আবদুর রহমান বিন আওফ বলেন, 'আল্লাহপাক আমার ভাই বেলালকে রহম করুন। হাতে-পাওয়া ঢাল আর বন্দি উভয়টির ব্যাপারেই তিনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। তাঁর কারণেই আমি ঢালগুলোও খুইয়েছি, বন্দিও খুইয়েছি। সেদিন আমি এক পয়সাও লাভ করতে পারি নি।'

ফেরেশতাদের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে ফেরেশতারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং যুদ্ধ করেছেন। এ-ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গিফার গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, 'আমি এবং আমার চাচাতো ভাই পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গনিমত কোথায় পাওয়া যায় তা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। হঠাৎ আমাদের মাথার ওপর দিয়ে মেঘপাল উড়ে গেলো, তাতে অসংখ্য ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো এবং বলা হচ্ছিলো, হাইযুম[২২] এগিয়ে আসছে। এই শব্দ শুনে আমার চাচাতো ভাই প্রচণ্ড ভয় পেলো এবং অস্থির হয়ে উঠলো। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সে মারাই গেলো। আমিও ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু নিজেকে সংযত রাখলাম।'[23]

আবু সাঈদ মালিক বিন রবিয়া রা. বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আজ যদি আমি বদর প্রান্তরে থাকতাম এবং আমার যদি দৃষ্টিশক্তি থাকতো তাহলে আমি তোমাদেরকে সেই উপত্যকা দেখাতাম যেখান থেকে ফেরেশতারা বের হয়ে এসেছিলেন। তাতে আমার কোনো সংশয় নেই এবং আমি সন্দেহও পোষণ করি না।'[২৪]

---

[২২] হাইযুম (حيزوم) জিবরাইল আ.-এর ঘোড়ার নাম। শব্দটির সাধারণ অর্থ : বুকের মধ্যস্থল বা মধ্যবুক।

[২৩] আবু ইসহাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম আস্‌সা'লাবি আন্‌নিসাপুরি, *আলকাশ্‌ফু ওয়াল বায়ান*, দারু ইহ্‌ইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবি, বয়রুত, লেবানন, ২০০২, সুরা আনফাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৪; ইমাম আবুল ফারজ জামালুদ্দিন আবদুর রহমান বিন আলি বিন মুহাম্মদ আলজাওযি আলকুরশি আলবাগদাদি [মৃ. ৫৯৭ হিজরি], *যাদুল মাসির ফি ইলমিত্ তাফসির*, দারুল ফিকরি, বয়রুত, লেবানন, ১৯৮৭, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯।

[২৪] আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন মাখলুফ আবু যায়েদ আস্‌সাআলিবি আলমালিকি, জাওয়াহিরুল হিসান ফি তাফিসিরিল কুরআন, দারু ইহ্‌ইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবি, বয়রুত,

আবু দাউদ আলমাযিনি রা. বলেন,—তিনিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন—'আমি বদর যুদ্ধের দিন একটি মুশরিককে হত্যা করার জন্যে ধাওয়া করলাম। কিন্তু আমার তরবারি তার মাথার কাছে পৌছার আগেই দেখলাম তার মাথা ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম তাকে অন্যকেউ হত্যা করেছে।'[২৫]

আবু যামিল আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, 'সাহাবিদের একজন মুশরিকদের একটি লোকের পেছনে দ্রুত ধাওয়া করছিলেন। তিনি মুশরিকটির ওপর চাবুকের আঘাতের শব্দ পান। তিনি বলেন, 'মুশরিকটি তার ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। আমি নেমে গিয়ে দেখি তার শরীরের যেসব জায়গায় চাবুকের আঘাত লেগেছিলো তার সবটুকু—চোখ-মুখ-ঠোঁট—গোটা চেহারা সবুজ হয়ে আছে। [সবুজ বলতে কালো বুঝিয়েছেন।] আমি তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় পেলাম; তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছিলো।'[২৬]

বদর যুদ্ধের দিন তারা ফেরেশতাদের হাতে নিহত এবং সাহাবিদের হাতে নিহতদের আলদা করেছিলেন। যাদের দেহে চাবুকের আঘাতের চিহ্ন পেয়েছিলেন তাদেরকে ফেরেশতাদের হাতে নিহত বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আল্লাহপাক বলেন—

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

'তুমি যদি দেখতে পেতে ফেরেশতাগণ কাফেরদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে এবং বলছে, তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ করো।' [সুরা আনফাল : আয়াত ৫০]

লেবানন, ১৯৯৭, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২১; *সীরাতুন্নবী সা.*, রচনা : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার আলমুত্তালিবি [মৃ. ১৫১ হিজরি], বিন্যাস : আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক বিন হিশাম বিন আইয়ুব আলহিময়ারি [মৃ. ২১৮], মাকাতাবা মুহাম্মদ আলি সাবিহ, মায়দানুল আযহার, মিসর, ১৯৬৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭; ইমাম ইসমাইল বিন উমর বিন দাউও ইবনে কাসির, *আসসীরাতুন্ নাবাবিয়্যাহ*, অধ্যায় : *বদরে ফেরেশতাদের যুদ্ধ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬।

[২৫] আলাউদ্দিন আলি বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম আলবাগদাদি, আত্তা'বিল ফি মাআনিত্ তানযিল, দারুল ফিকরি, বয়রুত, লেবানন, ১৯৭৯, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস ২৩৭৭৮, ২৩৮২৯।

[২৬] আবুল কাসেম মাহমুদ বিন উমর আয্যামাখশারি আলখাওয়ারিযমি, *আলকাশ্শাফ আন হাকায়িকিত্ তানযিল ওয়া উয়ুনিল আকাবিল ফি উজুহিত্ তা'বিল*, দারু ইহ্ইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবি, বয়রুত, লেবানন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১; ইমাম ইসমাইল বিন উমর বিন দাউও ইবনে কাসির, *আসসীরাতুন্ নাবাবিয়্যাহ*, অধ্যায় : *বদরে ফেরেশতাদের যুদ্ধ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬।

এই বিষয়টি নিশ্চিত যে আফগানিস্তানের যুদ্ধে ফেরেশতারা অংশগ্রহণ করেছিলো। তেমনিভাবে মুমিন জিনেরাও নিশ্চিতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো। ঘটনা অনেক আছে। যারা সমতল ভূমি ও পাহাড় ভরে রেখেছিলো তাদের ঘটনা; যারা অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধ করেছিলো তাদের ঘটনা; যারা সাদা পোশাক পরে এসেছিলো তাদের ঘটনা; যারা জানাযার নামায পড়েছিলো তাদের ঘটনা। আমি এসব ঘটনা আমার আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান[২৭] এবং ইবারুন ওয়া বাসায়ির লিল-জিহাদি ফিল আসরিল হাদির বই দুটিতে বর্ণনা করেছি। কারো আরো বেশি জানার ইচ্ছে হলে সেই বই দুটি পড়ে দেখতে পারেন।

ইবারুন ও বাসায়ির লিল-জিহাদ-এ আমি যে-সব ঘটনা উল্লেখ করেছি তার একটি হলো কমান্ডার মুসলিমের ঘটনা। কমান্ডার মুসলিম এবং কমান্ডার সফিউল্লাহ আহমদ শাহ মাসউদের নেতৃত্বে ছিলেন। ইনি সফিউল্লাহ আফদালি নন; অন্য সফিউল্লাহ। তাঁরা দুজন একদিন শত্রুদের একটি কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করার ব্যাপারে একমত হন। সফিউল্লাহ কমান্ডার মুসলিমকে বলেন, আপনি ভারী অস্ত্র নিয়ে পেছন থেকে সাপোর্ট দেবেন আর আমরা কেন্দ্রস্থলে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আক্রমণের নির্দিষ্ট সময়ে শত্রুদের কেন্দ্রস্থলে ভারী ভারী গোলা পড়তে শুরু করলো। আল্লাহপাকের অনুগ্রহে কিছুক্ষণের মধ্যেই কমান্ডার সফিউল্লাহ ঘাঁটিটি দখল করে নেন। এই অভিযানের পর তাঁরা নদীর দুই পাশে দুই ঘাঁটিতে চলে যান। এর এক বা দুই সপ্তাহ পর সফিউল্লাহ কমান্ডার মুসলিমকে বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। সেদিন আপনারা যে-গোলাগুলো ছুঁড়েছিলেন সেগুলো শত্রুঘাঁটির একেবারে মধ্যস্থলে গিয়ে পড়েছিলো। আপনি একেবারে লক্ষ্যস্থলেই গোলা ছুঁড়েছেন। যেনো আপনি নিজ হাতে গোলাগুলো সেখানে রেখে দিয়েছেন। কমান্ডার মুসলিম বিস্মিত হয়ে বললেন, কখন আমি এই কাজ করেছি? আপনি কোন্ দিনের কথা বলছেন? সফিউল্লাহ বললেন, এই তো দুই সপ্তাহ আগে। কেনো আপনার মনে নেই আমরা যে একটি কেন্দ্রঘাঁটিতে আক্রমণ করার ব্যাপারে একমত হলাম? মুসলিম বললেন, কী কথা বলছেন! আল্লাহর কসম, সেদিন তো আমরা একটি গোলাও ছুঁড়তে পারি নি। নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে কোত্থেকে ভারী ভারী গোলা এসে পড়লো? সেদিন শত্রুবিমান আমাদের ওপর বোমা বর্ষণ করছিলো এবং নিজেদের বাঁচাতেই আমরা ব্যস্ত ছিলাম।

---

[২৭] *আমি আফগানিস্তানে আল্লাহকে দেখেছি* নামে বইটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন উবায়দুর রহমান খান নদভী।

কিছুদিন পর একজন মুজাহিদ জিনে আক্রান্ত হলেন। জিন তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেললো। ঘটনা শুনে একজন আলেম এলেন এবং আক্রান্ত মুজাহিদের ওপর সুরা পড়তে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি জিনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি জিনকে বললেন, এই ব্যাটা, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। তুমি তাকে ছেড়ে দাও। জিন বললো, আমি তাকে কেনো ছাড়বো? আমি তো তাকে জিহাদে সহায়তা করি। আলেম বললেন, তুমি ছেড়ে দাও। তুমি তাকে ছেড়ে চলে যাও। সে নিজেই জিহাদ করতে পারবে। আচ্ছা, তুমি তাকে কীভাবে জিহাদে সহায়তা করো। জিন বললো, সফিউল্লাহ যেদিন শত্রুর ঘাঁটিতে আক্রমণ করলেন সেদিন কে ভারী ভারী গোলা নিক্ষেপ করেছিলো? জিন আরো বললো, কে ভারী অস্ত্র চালিয়েছিলো? কমান্ডার মুসলিম তো ভারী অস্ত্র চালান নি। তাহলে কারা সেসব অস্ত্র চালিয়েছিলো? জিন বললো, আমরাই সেসব ভারী অস্ত্র চালিয়েছিলাম; আমরা ছাড়া আর কেউ নয়। এখন বুঝতে পেরেছেন কীভাবে জিহাদে সহায়তা করি? এরকম অজস্র ঘটনা আছে। আফগানিস্তানের জিহাদে ফেরেশতা ও জিনদের অংশগ্রহণের ঘটনা অসংখ্য।

যাই হোক। বদর যুদ্ধের ঘটনায় ফিরে আসি। যুদ্ধে বিজয় লাভের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশের বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে মদিনায় চললেন।[২৮] যাওয়ার পথে তিনি নদর বিন হারেসকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তাকে হত্যা করা হলো। এরপর তিনি উকবা বিন আবু মুয়িতকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। উকবা বললো, হে মুহাম্মদ, আমার সঙ্গীদের কী অবস্থা হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের জন্যে জাহান্নাম। উকবাকেও হত্যা করা হলো। সত্তরজন বন্দিকে মদিনা মুনাওয়ারায় নিয়ে যাওয়া হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিয়ে মদিনায় পৌঁছলেন। আল-হায়সুমান বিন আবদুল্লাহ আল-খুযায়ি মক্কাবাসীকে বদর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে জানানোর জন্যে মক্কায় গেলেন। তখন সাফওয়ান বিন উমাইয়া পাথুরে জমিনে বসেছিলো। আল-হায়সুমান বিন আবদুল্লাহ মক্কায় প্রবেশ করলেন। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, যুদ্ধের ফলাফল কী? তিনি বললেন, শায়বা নিহত হয়েছে। ওয়ালিদ বিন উতবা নিহত হয়েছে। উতবা বিন রবিয়া নিহত হয়েছে। তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীকে [আবু জাহলকে] হাজ্জাজের দুই ছেলে [মুআয বিন আফরা ও মুআওয়ায বিন আফরা] হত্যা করেছে। আবুল বুখতুরি বিন হিশাম নিহত হয়েছে। উমাইয়া

---

[২৮] এর আগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনাবাসীদের যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ দেয়ার জন্যে আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা রা.-কে মদিনার উঁচুতল ভাগে (পার্বত্য এলাকা) এবং যায়দ বিন হারেসা রা.-কে মদিনার নিম্নতল ভাগে (নগরে) পাঠিয়েছিলেন।

বিন খাল্‌ফও নিহত হয়েছে। সাফওয়ান বিন উমাইয়া তখনো পাথুরে জমিনে বসেছিলো। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, সাফওয়ান বিন উমাইয়ার খবর কী? সে কি নিহত হয়েছে না-কি বেঁচে আছে? আল-হায়সুমান বিন আবদুল্লাহ বললেন, সে তো পাথুরে জমিনে বসে আছে। আমি তার বাব্বাকে [উমাইয়া] ও ভাইকে [আলি বিন উমাইয়া] নিহত হতে দেখেছি।

কিন্তু মক্কার লোকেরা কিছুতেই এই খবর বিশ্বাস করতে পারলো না। কীভাবে বিশ্বাস করবে? কুরাইশের মাথা যারা ছিলো বদর যুদ্ধে তারাই নিহত ও বন্দি হয়েছিলো। আবু লাহাবও এই সংবাদ শুনতে পেলো এবং সে তার প্রতিক্রিয়া দেখালো। আবু রাফে বলেন, —আবু রাফে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের গোলাম ছিলেন—আমি যমযম কূপের পাশে একটি তাঁবু টানিয়ে সেখানে মাটির পাত্র তৈরি করতাম। সেদিন যমযমের কামরায় আমি কয়েকটি পাত্র বানিয়ে রেখেছিলাম। আবু সুফ্‌য়ান বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সেখানে উপস্থিত হলো। আবু লাহাবও তার পা টেনে টেনে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। উম্মুল ফযলও সেখানে বসেছিলেন। উম্মুল ফযল ছিলেন আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী। আবু লাহাব যমযমের কামরার দরজায় বসলো। সে আবু সুফ্‌য়ানকে বললো,—সুফ্‌য়ানের নাম ছিলো সাফ্‌ওয়ান বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব—ভাতিজা, যা ঘটেছে আমাকে বলো। আবু সুফ্‌য়ান বললো, ঘটনা বেশি কিছু নয়। আমরা তাদের [মুসলমানদের] মোকাবিলা করতে গিয়েছিলাম—আমরা আমাদের নেতাদের তাদের কাছে সোপর্দ করে এসেছি। যারা নিহত হওয়ার তারা নিহত হয়েছে। আর যারা বন্দি হওয়ার তারা বন্দি হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি এর জন্যে কাউকে দোষারোপ করি না। কারো নিন্দাও করতে চাই না। সাদা-কালো দাগঅলা ঘোড়ায় চড়ে শুভ্র পোশাক পরিহিত কিছু মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাদেরকে আমরা চিনি না। আবু রাফে তখন নিজেকে সংযত রাখতে পারেন নি। তাঁবুর দিকে ছুটে গেলেন। যদিও তিনি ছিলেন কুরাইশের দাস। আবু লাহাব সেখানেই বসেছিলো। তিনি তার সামনে গিয়ে বললেন, তারা ছিলেন ফেরেশতা। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবু লাহাব প্রচণ্ড জোরে তাঁকে চড় মারে। আবু রাফে বলেন, আমি আবু লাহাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তাঁর আত্মসম্মানবোধ জেগে উঠেছিলো। (আমরাও আরব। আমরা দূর থেকেও আফগানদের সম্মান পাই এবং ফিলিস্তিনে আমরা ইহুদিদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।) আবু রাফে আবু লাহাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে একজন ক্রীতদাস মক্কার বিশিষ্ট নেতা আবু লাহাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আবু রাফে বলেন, আমি খুবই চিকন ও হালকা ছিলাম। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ার পর আবু

লাহাব নিজেকে সামলে নেয় এবং আমাকে তুলে নিয়ে মাটিতে আছাড় মারে। এরপর আমার বুকের ওপর উঠে বসে এবং মারতে শুরু করে। উম্মুল ফযল কাছেই ছিলেন। তিনি একটি পাথরের টুকরো নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং আবু লাহাবের গায়ে মারলেন। তাকে বললেন, ওঠো, ছাড়ো তুমি তাকে। তার মনিব মক্কায় উপস্থিত নেই; তাকে তুমি একা পেয়েছো? তাকে দুর্বল পেয়ে তার বুকের ওপর বসে মারতে শুরু করেছো? আবু লাহাব নিজেকে টেনে টেনে তুললো। এরপর সে আর সাতদিনের বেশি বাঁচে নি। সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো। আবু লাহাবের মৃত্যুর পর কেউ তাকে গোসল করাতে এবং কাফন পড়াতে এগিয়ে আসতে পারে নি। কারণ গোটা শরীরে ক্ষত ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং পচন ধরেছিলো।

কুরাইশ বদর যুদ্ধে নিহতদের জন্যে কান্না ও শোকপ্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিলো। তারা মনে করেছিলো, এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিদের আনন্দ বেড়ে যেতে পারে এবং তাঁরা এটা নিয়ে হাসাহাসি করতে পারেন। আল-আসওয়াদ বিন আবদুল মুত্তালিবের তিন সন্তান—দুই ছেলে আবু হাকিমা যামআতা বিন আসওয়াদ, উকাইল বিন আসওয়া এবং এক নাতি হারিস বিন যামআতা—বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। তিনি অন্ধ ছিলেন। শোকে তাঁর বুক ফেটে যেতে চাচ্ছিলো। কষ্টের আগুনে তাঁর হৃদয় পুড়ে যাচ্ছিলো। তিনি তাঁর সন্তানদের জন্যে কাঁদতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু কুরাইশ নিহতদের জন্যে কান্না নিষিদ্ধ করেছিলো। তিনি চাইলেও কাঁদতে পারছিলেন না। একরাতে তিনি এক নারীর কান্না শুনতে পান। তিনি তাঁর এক গোলামকে বললেন, তুমি বের হয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখো, সম্ভবত কুরাইশ কান্নার অনুমতি দিয়েছে। গোলাম সেই নারীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কুরাইশ কি নিহতদের জন্যে কান্নার অনুমতি দিয়েছে? মহিলাটি বললো, না। তাছাড়া আমি নিহতদের জন্যে কাঁদছি না। আমার একটি উট হারিয়ে গেছে তাই আমি কাঁদছি। এই খবর শুনে আসওয়াদ বিন মুত্তালিব একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। সেই কবিতা থেকে যেনো কষ্ট ও ব্যথা ঝরছিলো।

أتبكى أن يضل لها بعير * ويمنعها من النوم السهود

فلا تبكى على بكر، ولكن * على بدرتقاصرت الجدود

على بدر سراة بنى هصيص * ومخزوم ورهط أبى الوليد

وبكى إن بكيت على عقيل * وبكى حارثا أسد الاسود

وبكيهم ولا تسمى جميعا * وما لابي حكيمة من نديد

ألا قد ساد بعدهم رجال * ولولا يوم بدر لم يسودوا

'সে কি এজন্যে কঁদাছে যে তার একটি উট হারিয়ে গেছে আর তাকে বিনিদ্র রেখেছে রাত্রি-জাগরণ?/ [হে নারী,] তুমি উটের বাচ্চার জন্যে কেঁদো না; বরং বদর যুদ্ধের ফলাফলে কাঁদো, সেখানে আমাদের মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।/ বনু হাসিস, বনু মাখযুম এবং আবুল ওয়ালিদের বংশধরদের জন্যে কাঁদো, যারা ছিলো বদরে নৈশ অভিযাত্রী।/ তুমি যদি কাঁদতেই চাও—তাহলে উকাইলের জন্যে কাঁদো এবং কাঁদো হারিসের জন্যে যে ছিলো সিংহদেরও সিংহ।/ তুমি তাদের জন্যে কাঁদো; কিন্তু সবার নাম নিও না। এবং আবু হাকিমাতা তো ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী।/ হায়! তাদের পরেও তো অনেক মানুষ নেতৃত্ব দেবে। হায়! তারা যদি বদরের দিন নেতৃত্ব না দিতো।'

বন্দিদের নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা মুনাওয়ারায় এলেন। সুহাইল বিন আমরের দুই হাত বাঁধা ছিলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনসঙ্গিনী সাওদা রা. বলেন, আমি তখন রাসুলের কাছে গেলাম এবং সুহাইল বিন আমরকে দুই হাত বাঁধা অবস্থায় বসে থাকতে দেখলাম। আল্লাহর কসম, আমি তখন নিজেকে সংযত রাখতে পারি নি। আমি সুহাইলকে বললাম, হে আবু ইয়াযিদ, আপনারা কি এভাবেই নিজেদের সমর্পণ করলেন? আপনারা কি লড়াই করতে পারলেন না এবং সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে পারলেন না? সাওদা রা.-এর এসব কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, হে সাওদা, তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করছো? সাওদা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি তাঁকে যখন এভাবে দেখেছি নিজেকে সংযত রাখতে পারি নি। সুহাইল বিন আমর ছিলেন মক্কার নেতা আর এখানে তিনি হাতবাঁধা ও ধুলোয় নিক্ষিপ্ত! তিনি আমাদের নিকটাত্মীয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, আমরা এই বন্দিদের সঙ্গে কী আচরণ করবো? উমর রা. বললেন, বন্দিদের মধ্যে যারা আমার নিকটাত্মীয় তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন; আমি তাদেরকে হত্যা করবো। আকিলকে আলির হাতে ছেড়ে দিন; সে তাকে হত্যা করুক। আবু বকরের কাছে তার ছেলেকে দিন; তিনি তাকে হত্যা করবেন। হামযার কাছে তার নিকটাত্মীয়দেরকে দিন; সে তাদেরকে হত্যা করবে। আমরা তাদের সবাইকে হত্যা করবো। তারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে আর ফিরে আসতে পারবে না। আব্বাস রা.-ও বন্দিদের মধ্যে ছিলেন। বন্দিদেরকে হত্যা না করার ব্যাপারেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মানসিক ঝোঁক ছিলো। আবু বকর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই মনোবাঞ্ছাকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, বন্দিদের সবাই আপনার পিতৃ-সম্প্রদায়ের এবং তারা আপনার আত্মীয়-স্বজন। আমি মনে করি, আপনি তাদের ছেড়ে দিয়ে

মুক্তিপণ গ্রহণ করবেন। আবু বকর রা.-এর কথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু বন্দিদের ছেড়ে দিয়ে মুক্তিপণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে আল্লাহপাক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তিনি আয়াত নাযিল করলেন—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ () لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোনো নবীর জন্যে সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব-বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছো তার জন্যে তোমাদের ওপর আপতিত হতো মহাশাস্তি।' [সুরা আনফাল : আয়াত ৬৭-৬৮]

মুসআব বিন উমায়ের রা.-এর ভাই আবু আযিযও বন্দিদের মধ্যে ছিলো। সাহাবি আবুল ইয়াসার রা. তাকে ধরে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের পাশ দিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন, একে ভালো করে ধরে রাখো। এর মায়ের ধন-সম্পদ অনেক। তিনি তোমাকে অনেক বেশি অর্থ দিয়ে একে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। বন্দি আবু আযিযের মা মানে মুসআব বিন উমায়ের রা.-এরও মা। আবুল ইয়াসার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই, আমার প্রতি এটা আপনার ওসিয়ত? মুসআব বিন উমায়ের বললেন, আল্লাহর কসম, আমার ভাইয়ের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের চেয়ে তোমার সঙ্গে আমার ভ্রাতৃত্ব অনেক দৃঢ়।

একেই বলে আকিদা ও বিশ্বাস। আকিদা ও বিশ্বাস যখন অন্তরে বদ্ধমূল হবে তখন আলাদা ভ্রাতৃত্ব বা পিতৃত্ব বলে কিছু থাকবে না। তখন ভ্রাতৃত্ব হবে ঈমানের ভ্রাতৃত্ব, ইসলামের ভ্রাতৃত্ব, কুরআন-সুন্নাহ ও আকিদার ভ্রাতৃত্ব।

এভাবেই আল্লাহপাক মুমিনদের সাহায্য করেন। তাদের শক্তিকে সংহত করেন। তাদের পতাকাকে সমুন্নত করেন। আর এভাবেই কাফেরদের লাঞ্ছিত করেন। তাদের শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে সম্মানিত করেন। নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

অহুদের যুদ্ধ : এক

বদর যুদ্ধ শেষ হলো। আমরা আজ কথা বলছি ১৯৮৮ সালের জুন মাসের একুশ তারিখে বা ১৪০৮ হিজরির যিলকদ মাসের সাত তারিখে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু অ লাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ী হয়ে মদিনায় ফিরে এলেন। আল্লাহপাক তাঁর দীনকে শক্তিশালী করলেন। তিনি সত্তরজন বন্দি থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদের ছেড়ে দিলেন। আসার পথে তিনি—যেমন আমরা আগেই বলেছি—নদর বিন হারিস ও উকবা বিন আবু মুয়িত বাদে আর কাউকে হত্যা করেন নি। নদরকে সাফরায় এবং উকবাকে ইরকুয যবিয়্যাতে হত্যা করা হয়েছিলো। কিন্তু বন্দিদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদের মুক্তি দেয়ার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভর্ৎসনাবাণী অবতীর্ণ হয়েছিলো। পবিত্র কুরআন এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, রাসুলের জন্যে শুরুতেই যা শ্রেয় তা হলো শত্রুকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা। এক্ষেত্রে আল্লাহপাকের বাণীর সঙ্গে হযরত উমর বিন খাত্তাব রা.-এর সিদ্ধান্ত সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো। অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রেই উমর রা.-এর মতামতের সঙ্গে কুরআনের বাণী সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো। যেমন—মদপান। যখনই মদের ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নাযিল হলো, উমর রা. দোয়া করতেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাদের জন্যে মদপানের বিধি-বিধান বিশদভাবে বর্ণনা করো। তখন নাযিল হলো—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য-নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা সেগুলো বর্জন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' [সুরা মায়েদা : আয়াত ৯০]

আরেকটি বিষয়েও উমর বিন খাত্তাব রা.-এর মতের সঙ্গে কুরআন সহমত পোষণ করেছে। বিষয়টি হলো : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সহধর্মিণীগণের পর্দা। তিনি রাসুলকে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি যদি আপনার স্ত্রীগণের পর্দার ব্যবস্থা না করুন, তাদের ব্যাপারে নানা ধরনের কথা বলা হবে। আপনি তাদের পর্দার ব্যবস্থা করুন। এরপরই নাযিল হলো—

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ

'তোমরা যখন তাঁর পত্নীদের কাছে কোনো জিনিস চাইবে, পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্যে অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারো জন্যে রাসুলকে কষ্ট দেয়া সঙ্গত নয়।' [সুরা আহযাব : আয়াত ৫৩]

উমর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরো বলেছিলেন, আপনি যদি মাকামে ইবরাহিমকে[২৯] নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ করতেন! তখন এই আয়াত নাযিল হয়—وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى 'তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো।' [সুরা বাকারা : আয়াত ১২৫]

বদর যুদ্ধের বন্দিদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও উমর রা.-এর মতের সঙ্গে আল্লাহর বাণী সহমত ঘোষণা করেছিলো। উমর রা. যখন সব বন্দিকে হত্যা করার অভিমত প্রকাশ করেন, বোঝা যায়, তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস। মুহাদ্দিস হলেন যাঁদের কাছে সত্যের ইলহাম (অন্তরে অনুপ্রেরণা) আসে বা যাঁদের জিহ্বা থেকে সত্যবাণী নিসৃত হয়। আমার উম্মতের মধ্যে যদি মুহাদ্দিস থেকে থাকেন, তাঁদের একজন হলেন উমর বিন খাত্তাব রা.। আল্লাহপাক তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনিও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছেন।

কুরাইশ তাদের লজ্জা ও লাঞ্ছনা বহন করে মক্কায় ফিরেছিলো। তাদের পৌরুষ ঢেকে গিয়েছিলো পরাজয়-ব্যর্থতা-গ্লানির আচ্ছাদনে এবং তারা অপমানের চাদর টানতে টানতে পৌছেছিলো মক্কায়। কুরাইশদের জন্যে বদর যুদ্ধের বিফলতা ছিলো ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। এই যন্ত্রণাদায়ক পরাজয় তারা কখনো আশা করে নি। গোটা আরবে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশকে পরাজিত করেছেন। মুসলমান ও ইসলামের নক্ষত্র আরো উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের বের করে দিলেন

বদর যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিজয়ের পর মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই নতুন ধূর্তামির আশ্রয় নেয়। সে তার সঙ্গীদের বলে, 'এই বিষয়টি [মুসলমানদের বিজয়] এখন থেকে ঘটতেই থাকবে। সুতরাং আমরা মুসলমাদের সঙ্গে থাকবো।' সে ও তার সঙ্গীরা মুসলমানদের সঙ্গে থাকে।

এদিকে ইহুদিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিজয়ে হিংসা ও ক্রোধে জ্বলতে থাকে। তিনি বনু কায়নুকার ইহুদিদের সমবেত করেন। বদর

---

[২৯] যে-পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ইবরাহিম আ. কাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন।

যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর কী পরিণাম হয়েছে তা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা নিশ্চয় দেখেছো আল্লাহপাক কুরাইশের সঙ্গে কী আচরণ করেছেন।' রাসুলের এই কথার জবাবে ইহুদিরা বলে, 'এ-বিষয়টি আপনাকে যেনো ধোঁকায় না ফেলে যে আপনি কুরাইশদের মোকাবিলা করেছেন এবং তাদের সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছেন। আমরা যদি আপনার সঙ্গে লড়াই করি, আপনি ভিন্ন বিষয় দেখতে পাবেন। আপনার পরিণতি হবে ভিন্ন।'

এরপর একটি ঘটনা ঘটে। একজন মুসলিম নারী বনু কায়নুকার বাজারে কিছু জিনিস বিক্রি করতে আসেন। তিনি জিনিসগুলো বিক্রি করেন। তারপর এক ইহুদি স্বর্ণকারের কাছে যান এবং তার সামনে বসেন। স্বর্ণকার তাঁর চেহারার ঘোমটা খুলে ফেলতে চায়; কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান। স্বর্ণকার শয়তানি চতুরতার আশ্রয় নেয়। সে কৌশলে মহিলার [মাথার] কাপড়ের একটি কোণা তাঁর পিঠের কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে দেয়। মহিলাটি যখন উঠে দাঁড়ান, তাঁর মুখের কাপড় সরে গিয়ে চেহারা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। তিনি জোরে চিৎকার করে ওঠেন। একজন মুসলমান ব্যক্তি সেদিকে এগিয়ে যান এবং ইহুদি স্বর্ণকারকে হত্যা করেন। ইহুদিরাও তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হত্যা করে। এই ঘটনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের অবরোধ করেন এবং তাদের সিরিয়ায় [তৎকালীন শাম] বিতাড়িত করেন।

এটাই ছিলো ইহুদিদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম সংঘাত। বনু কায়নুকাকে হিজরি সালের দ্বিতীয় বছর বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর উচ্ছেদ করা হয়েছিলো। আর বনু নাদিরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো তৃতীয় হিজরিতে অহুদ যুদ্ধের পর। বনু কুরায়যার পুরুষদের হত্যা করা হয়েছিলো হিজরি সালের পঞ্চম বছরে খন্দক যুদ্ধের পর। আর খায়বার বিজয় হয়েছিলো হিজরি সালের সপ্তম বছর। উমর বিন খাত্তাব রা.-এর শাসনামলে জাযিরাতুল আরব থেকে ইহুদিদের চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদ করা হয়। উমর রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি— أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب 'ইহুদি ও নাসারাদের জাযিরাতুল আরব থেকে বহিষ্কার করো।'[৩০]

আবু সুফ্‌য়ানের পৌরুষ এবং বর্তমান মুসলিম শাসকদের পৌরুষ

আমরা এবার মক্কায় ফিরে যাই। মক্কাবাসীর জন্যে সে-সময়টা ছিলো ভয়াবহ বেদনা ও কষ্টের। কিন্তু তারা সবার জন্যে কান্না ও শোকপ্রকাশ নিষিদ্ধ

---

[৩০] তাফসিরে কুরতুবি : ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৭; কানযুল উম্মাল : হাদিস ১১০১৫।

করেছিলো। তাদের কান্না ও শোকপ্রকাশ মুসলমানদের হাস্যরসের বিষয় হতে পারে ভেবেই তারা এসব নিষিদ্ধ করেছিলো। আবু সুফ্য়ান কসম খেলেন—বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার পূর্বে তিনি নারী স্পর্শ করবেন না এবং গোসল করবেন না। তাঁরাই ছিলেন পুরুষ! আল্লাহর কসম, তাঁরাই ছিলেন পুরুষ!

১৯৪৮ সালে ইসরাইলের কাছে আরব রাষ্ট্রগুলো পরাজিত হয় বা তারা ফিলিস্তিনকে বিক্রি করে দেয়। তারা মানুষকে ধোঁকা দেয় এবং কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বলে, মাত্র 'সাত', তারপরই তোমরা সবকিছু ফিরে পাবে। লোকেরা প্রশ্ন তোলে, সাত কী। তারা বলে, সাতদিন বা সাত সপ্তাহ বা সাত বছর। লোকেরা নেতাদের এই আশাবাদের ওপর অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আর আকাঙ্ক্ষা ঝুলিয়ে রাখে। সাতদিন নয়, সাত সপ্তাহ নয়, সাত বছর কেটে যায়, মানুষ তাদের আশার আকাশে কিছুই দেখতে পায় না। বরং এভাবে বিশ বছর কেটে যায়, মানুষের আশার আকাশ শূন্যই পড়ে থাকে। আরেকবার ইসলামি উম্মাহর মাথার ওপর ভয়ঙ্কর-সর্বনাশা-বুদ্ধিলোপকারী দুর্দশা চেপে বসে।

সা'দ জুমআ ছিলেন জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী।[৩১] তিনি সেই দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে ষড়যন্ত্র ও চূড়ান্ত লড়াই সম্পর্কে একটি বই লেখেন : المؤامرة ومعركة المصير / ষড়যন্ত্র ও শেষ লড়াই। ১৯৬৭ সালে তিনি মুসলমি নেতা ও শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। সা'দ জুমআ বেদুইন ছিলেন এবং প্রতিশ্রুতিপূরণে দৃঢ়চেতা ছিলেন। তিনি তাফিলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাফিলা কয়েকটি বেদুইন গোত্রের একটি অঞ্চল। তাঁর মধ্যে কিছুটা পৌরুষ ও কল্যাণ অবশিষ্ট ছিলো। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে আরব নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। তিনি বিশ্বাসঘাতকতার যে-ভয়ঙ্কর রূপ দেখার তা দেখেছিলেন। একারণেই তিনি তাঁর ১৯৬৭ সালের কৃতকর্ম ও পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন। সে-সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীরা তাঁকে কেবল

---

[৩১] সাদ মুহাম্মদ জুমআ ১৯১৬ সালে দক্ষিণ জর্ডানের তাফিলা এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তিনি কুর্দি। দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৭ সালের ২৩ শে এপ্রিল থেকে ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। এর আগে তিনি আম্মানের মেয়র (১৯৫৪-১৯৫৮), উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৫৮-১৯৫৯), ইরান ও সিরিয়ায় রাষ্ট্রদূত (১৯৫৯-১৯৬২), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত (১৯৬২-১৯৬৫), চিফ অব রয়্যাল হাশেমিয়া কোর্ট (১৯৬৫) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এ-বছরই তিনি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। সাদ জুমআর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : مجتمع الكراهية বা ঘৃণার সমাজ।

দুর্দশাই উপহার দিয়েছিলেন। সা'দ জুমআ সম্ভবত দুইমাসকাল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই দুইমাসেই তিনি যে-বিপদ ও সর্বনাশ দেখেছিলেন তা ছিলো তাঁর চিন্তা এমনকি কল্পনারও বাইরে। তিনি আরব রাষ্ট্রগুলোকে ভর্ৎসনা করে বই লিখতে শুরু করেন এবং নিজের পাপক্ষালনের চেষ্টা করেন। আশা করা যায়, মহান আল্লাহ তাঁর কৃতঅপরাধ ক্ষমা করেছেন। যিনি তাঁর বইগুলো পাঠ করবেন, সেই সময়ের বাস্তবতা বুঝতে পারবেন। উল্লিখিত বইটি ছাড়া তাঁর আরো দুটি বই হলো : الله أو الدمار / আল্লাহর পথ অথবা ধ্বংস এবং أبناء الأفاعي / সর্পসন্তান। সর্পসন্তান বইয়ে তিনি আরব শাসকদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও সর্বনাশা কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি তাদের 'সাপের সন্তান' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই বইটির প্রচ্ছদে একদল সাপের ছবি আছে। এরা হলো সর্পজাতির বড়ো বড়ো নেতা। সর্পসন্তান বইয়ে তিনি লিখেছেন, 'একব্যক্তি আমের আশ-শাবির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলেছি, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যদি জাহান্নামে না যায় তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। এতে কি আমার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে?" আমের আশ-শাবি বললেন, "আরে ব্যাটা, যাও, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে রসরঙ্গ করো গিয়ে। হাজ্জাজ যদি জাহান্নামে না যায় তাহলে আর কেউ জাহান্নামে যাবে না।" আমিও আল্লাহর নামে তালাকের কসম খেয়ে বলতে পারি, আরব নেতাদের কেউই সত্যবাদী নন।'

মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল আবদুন নাসেরের পৌরুষ সম্পর্কে লিখেছেন। এটা ১৯৬৭ সালের বিপর্যয়ের পরের ঘটনা। তিনি লিখেছেন, 'মিসরের অর্থনীতি নিম্নগামী হতে হতে শূন্যের কোঠায় পৌঁছার পরও আবদুন নাসের আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে সহায়তা গ্রহণ করেন নি। আরবের নেতারা মিসরকে সহায়তা দানের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু আবদুন নাসের তাঁর আত্মসম্মানবোধ, উচ্চমন্যতা ও আত্মম্ভরিতার কারণে আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে সহায়তা চাইতে অস্বীকৃতি জানান।' সা'দ জুমআ আবদুন নাসেরের অস্বীকৃতির বিষয়টি জানতে পেরে হতবুদ্ধি হয়ে যান। তিনি বয়রুতের সংবাদপত্রে এই বিষয়টির সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে, হ্যাঁ, আবদুন নাসের কোনো প্রকারের সহায়তা প্রার্থনা করেন নি। তবে তিনি বাদশাহ ফয়সালের পদচুম্বন করার জন্যে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছিলেন। আবদুন নাসের বলেছিলেন, "এই জাতি জীবন্মৃত হয়ে থাকবে; কিন্তু কারো কাছে হাত পাতবে না।'" এ-কথা কে বলেছিলেন? আবদুন নাসের। অবশ্য আমি এই ঘটনাটি মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালের এ-বিষয়ে লেখার আগেই একজন মুসলিম সাংবাদিক থেকে জানতে পেরেছিলাম। তিনি আমাদের বাসায় এসেছিলেন। আমি তাকে

জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি বোধগম্য যে আবদুন নাসের তাঁর আত্মমর্যাবোধ, আত্মগরিমা ও উচ্চমন্যতার কারণে সহায়তা চান নি। তিনি আমাকে বললেন, শুনুন শায়খ আবদুল্লাহ, আরবের এই নেতারা এমন সব কর্মকাণ্ড করেছেন, আপনার এই ছোটো ছোটো ছেলেরাও সেগুলো করতে লজ্জাবোধ করবে।

সা'দ জুমআ বলেন, 'আরবের নেতারা সমবেত হলেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আবদুন নাসের আমাদের কাছে কিছুই চান নি। তবে তিনি বাদশাহ ফয়সালের পদচুম্বন করার জন্যে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এই জাতি জীবন্মৃত হয়ে থাকবে; কিন্তু কারো কাছে হাত পাতবে না।" তখন ইয়ামানের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মিসর থেকে বাদশাহ ফয়সালের কুৎসা রটনা করতে অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো। আবদুন নাসের নিজে এই অনুষ্ঠান নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'আল্লাহর শত্রু'। প্রতিদিন 'আল্লাহর শত্রু' নামের অনুষ্ঠানে সৌদি আরব ও বাদশাহ ফয়সালের নামে কুৎসা প্রচার করা হতো। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এর পরেও বাদশাহ ফয়সাল মিসরকে দশ মিলিয়ন পাউন্ড সহায়তা দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অর্থ মিসরের রাষ্ট্রের কোনো কাজে লাগে নি। কারণ তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় নি; মূলধন হয়ে আবদুন নাসেরের ব্যক্তিগত হিসাবে জমা হয়েছিলো।'

একারণেই আবদুন নাসেরের মৃত্যুর পর এক বিচারপতি এ-বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাষ্ট্রের বেসরকারি প্রতিবেদনে দেড়মিলিয়ন পাউন্ডের কোনো হিসাব পাওয়া যায় নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দশ মিলিয়ন পাউন্ডই দেড়মিলিয়ন পাউন্ডে রূপান্তর হয়ে আবদুন নাসেরের ব্যক্তিগত হিসাবে জমা হয়েছিলো।

আমি আপনাদের কাছে কাফের আবু সুফ্য়ান ও মুসলিম শাসকদের মধ্যে পার্থক্য যে কী তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে এসব ঘটনা টেনে এনেছি। সা'দ জুমআ বলেন, 'আমরা তিনদিন খার্তুমে বসে থাকলাম; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। এটা ছিলো ১৯৬৭ সালে পরাজয়ের অব্যবহিত পরের সম্মেলন। এই সম্মেলনে আরব নেতারা মুখোমুখি উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি নি এবং কোনো কাজও করতে পারি নি। সম্মেলন শেষ হলে আমরা নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইলাম। কিন্তু সাংবাদিকে পাহাড় ও সমতল ভূমি পরিপূর্ণ ছিলো। তাঁরা আমাদেরকে যে-হোটেলে ছিলাম সেখানে ছেঁকে ধরলেন। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, সাংবাদিকদের আমরা কী বললো? একজন এই প্রশ্নের সমাধানে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আপনারা বলবেন যে আমরা তিনটি বিষয়ে একমত হয়েছি।—আল্লাহপাক সত্যই বলেছেন, শয়তান তাদের কর্মকাণ্ডকে শোভন

করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।[৩২]—বিষয়তিনটি কী? আসলে কিছুই না। কারণ কোনো বিষয়েই তাঁরা একমত হতে পারেন নি। না সন্ধিচুক্তি, না সমর্পণ, না পারস্পরিক বৈঠক—কোনোটিতেই না। তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেন নি।'

এটা '৬৭ সালের পরাজয়ের তিনদিন পরের ঘটনা।

আমরা আবু সুফ্য়ানের কথা আলোচনা করছিলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি নারী স্পর্শ করবেন না। কার্যত তিনি তাই করেছিলেন। রমযান মাসে বদর যুদ্ধ হয়েছিলো। তারপর শাওয়াল মাস গিয়ে যিলকদ মাসও গেলো। তারপর যিলহজ মাস এলো। আবু সুফ্য়ান এ-সময় একবার মদিনার দিকে গেলেন। রাতের বেলা হাইয়া বিন আখতাবের বাড়িতে গিয়ে ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। কিন্তু সে দরজা খুলতে অপারগতা জানালো। এরপর তিনি সালাম বিন মুশকামের বাড়িতে গেলেন। সালাম বিন মুশকাম ইহুদিদের নেতা এবং তাদের কোষাগারের খাজাঞ্চি ছিলো। সে আবু সুফ্য়ানের জন্যে ঘরের দরজা খুলে দিলো। তাঁকে আপ্যায়ন করলো এবং মদিনার খবরাখবর দিলো। পরের দিন আরিদ এলাকায় আবু সুফ্য়ানের দল হঠাৎ অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদের কয়েকটি খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেয়। দুজন মানুষকে সেখানে পেয়ে হত্যা করে। আগুন-প্রজ্বলন ও হত্যাকাণ্ডের পর আবু সুফ্য়ান পালিয়ে যান। এই সংবাদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে। তিনি কারকারাতুল কদর এলাকা পর্যন্ত এগিয়ে যান। কিন্তু বুঝতে পারেন যে আবু সুফ্য়ান তাঁর হাতাছাড়া হয়ে গেছে। আবু সুফ্য়ান অনেকটা পরিমাণ সাওয়িক বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। (সাওয়িক : মধু, খেজুর, ঘি, যব ও আটার সংমিশ্রণে তৈরি মণ্ড। আটার সঙ্গে মধু ও ঘি মিশিয়ে তৈরি করা হয়। বলা যায়, আমরা যে কেক খাই প্রায় তার মতো।) এই অভিযানকে তাই 'যাতুস সাওয়িক' অভিযান বলা হয়। কিন্তু আবু সুফ্য়ানের কাছে তাদের এই হামলা প্রতিশোধ বলে বিবেচিত হয় নি। তাঁর সঙ্গে যে-কাফেলা ছিলো তারা বেঁচে গিয়েছিলো। আবু সুফ্য়ান মক্কায় পৌঁছলে সাফওয়ান বিন উমাইয়া, আবদুল্লাহ বিন আবু রবিয়া ও ইকরামা বিন আবু জাহ্ল তাঁর কাছে সমবেত হলো। তারা আবু সুফ্য়ানকে বললো, 'এই কাফেলায় যতো ব্যবসায়ী আছে সবার সম্পদ একত্র করে আপনার হাতে তুলে দেবো। এই কাফেলা সবসময় আপনার অধীন থাকবে—যাতে মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেন।' সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! তারা ছিলো মানুষ এবং তাদের ভেতর পৌরুষ ছিলো। তাদের

---

[৩২] সুরা মুহাম্মদ : আয়াত ২৫।

লজ্জা ও আত্মগরিমা ছিলো। পরাজয়ের গ্লানি তাদের আত্মার ওপর ভারী বোঝা হয়ে চেপে বসেছিলো। এই গ্লানি ধুয়ে ফেলার আগ পর্যন্ত তারা ঘুমাতে পারে নি। তাদের যাবতীয় সম্পদ তারা যুদ্ধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সোপর্দ করেছিলো।

যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার জন্যে আমাদেরও কাজ করতে হবে। মিসরীয় গায়িকা উম্মে কুলসুম[৩৩] ফ্রান্সে যান, ইউরোপে যান। গানের অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন এবং যুদ্ধব্যয় মেটানোর জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেন। উম্মে কুলসুমের গানের আসর বেশ ভলো জমে এবং তিনি সারারাত গান গেয়ে যুদ্ধে ব্যয় করার জন্যে অর্থ তোলেন। ... না কোনো সমস্যা নেই... এতে কোনো সমস্যা হয় না। হাশিশের [এক প্রকার মাদকদ্রব্য] ধোঁয়ায় কায়রোর রাতের আকাশ ছেয়ে যায়... তাতেও সমস্যা নেই। মিসরীয়রা সারামাস ধরে টাকা-পয়সা জমা করে। ঠেলাগাড়ি ও টানাগাড়িতে তারা সবজি, টমেটো, গোল আলু ও অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে। এক পিয়াস্টারের [মধ্যপ্রাচ্যে প্রচলিত মুদ্রার একক] জিনিস বিক্রি করলেও তারা মিথ্যা বলে। দুই পিয়াস্টারের জিনিস বিক্রি করলেও তারা মিথ্যা বলে। ধোঁকা না দিয়ে তারা কাউকে ছাড়ে না। এভাবে একমাসে হয়তো তারা পাঁচটা [মিসরীয়] পাউন্ড জমা করে। এই পাঁচ পাউন্ড নিয়ে মাস শেষে তারা সঙ্গীত-তারকা উম্মে কুলসুমের কনসার্টে যায়। উম্মে কুলসুম অন্তহীন অনিষ্টতার নক্ষত্র। যদিও তারা তাঁর নাম দিয়েছে 'মধ্যপ্রাচ্যের নক্ষত্র'।

আমার ভাইয়েরা, আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করুন। '৬৭ সালের পরাজয়ের পর পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো আরব রাষ্ট্রগুলোকে আটা, গম ও অন্যান্য সামগ্রী দান করেছে। আক্রান্ত তিনটি রাষ্ট্রের একটির বন্দরে পাশ্চিমাদের সাহায্য-করা গমের চালান এসে ভেড়ে। এ-সময় বিচারপতি গোত্রের এক নারী—যিনি কোনো হোমরাচোমরা নেতার স্ত্রী—গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্যে ইউরোপে যেতে চান। কারণ, আম্মানে প্রচণ্ড গরম। তিনি

---

[৩৩] উম্মে কুলসুম: বিখ্যাত আরব গায়িকা; 'প্রাচ্যের নক্ষত্র' অভিধায় পরিচিত। তাঁর আসল নাম ফাতেমা ইবরাহিম। মিসরের সমুদ্রতীরবর্তী জেলা দাকহালিয়্যা-এর তামাই আয-যাহায়ারা অঞ্চলে তিনি ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন এবং কুরআন শরিফ হিফ্য করেন। চমৎকার কণ্ঠের অধিকারী হওয়ার কারণে সংগীতে অল্প বয়সেই খ্যাতি অর্জন করেন। সমকালীন বিখ্যাত কবি আহমদ শাওকি, হাফিয ইবরাহিম, আযিয আবাযা, আহমদ রামি প্রমুখের লেখা গানে সুরারোপ করেন। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আরব কবি ও পাকিস্তানের জাতীয় কবি মুহাম্মদ ইকবালের লেখা গানেও সুর দেন তিনি। গান গাওয়ার পাশাপাশি তিনি কয়েকটি ফিল্মে অভিনয়ও করেন। বিপুল বিত্তের অধিকারী উম্মে কুলসুম সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন এবং মিসরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যে ব্যাপকভাবে দান করতেন।

আম্মান থেকে ইউরোপে উড়ে যেতে চান, কারণ, আম্মানে গরম! তাঁর তিরিশ হাজার দিনার দরকার। তিনি সরকারের কাছে টাকা চান। অর্থমন্ত্রী তাঁকে জানান, আমাদের কাছে টাকা-পয়সা নেই। অর্থমন্ত্রীকে বলা হয়, বন্দরে গমের চালান পড়ে আছে। গম বিক্রি করুন এবং তাঁকে টাকা দিন। তাঁর ইউরোপ ভ্রমণ ও সেখানে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা করুন।

হ্যাঁ, আবু সুফ্য়ান, ইকরামা, সাফ্ওয়ান পরবর্তী যুদ্ধে বিজয় বা বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সম্পদ জমা করছিলেন।

তাঁরা কোথায় আর আমরা... আমরা কোথায়? আল্লাহ্পাক আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম তত্ত্বাবধায়ক।

সা'দ জুমআ সেই সময়ের দুর্দশার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পেট্রোডলারের অধিকারী এক নেতা আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমরা তাঁর জন্যে মরুভূমিতে বালুর ওপর একটা শামিয়ানা টানিয়ে দিলাম। আমরা ভেবেছিলাম এটা তাঁর জন্যে বিশেষ উপযোগী হবে। তাঁকে অভিনন্দন জানানো, সংবর্ধনা দেয়া এবং যাবতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থাও আমরা করেছিলাম। মরুভূমির শামিয়ানাতেই আলোচনায় বসবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা শামিয়ানাতেই বসেছিলাম। হঠাৎ সেই আমিরের অনুপস্থিতি টের পেলাম। শামিয়ানার ভেতরে তাঁকে পাওয়া গেলো না। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেলো।' সা'দ জুমআ বলেছেন, 'আমরা তাঁকে শামিয়ানার বাইরে একটা বালুর টিবির ওপর শুয়ে থাকতে দেখলাম। একজন লোক তাঁর সমস্ত শরীর দলাই মলাই করে দিচ্ছে। আমরা তাঁকে বললাম, আমাদের সম্মানিত নেতা, সম্মানিত আমির, আপনি এখানে কেনো! চারদিকে নিরাপত্তাবেষ্টনী, মন্ত্রীরা আপনার অপেক্ষায়... সমস্ত লোক আপনার অপেক্ষায়... এবং... এবং... আরো নানা কথা তাঁকে বলা হলো।' আমির বললেন, "আল্লাহর কসম, এখানে তো আমার জন্যে 'আবু যায়দের ঘটনা' শুরু হয়েছে। আমি চেয়েছি, এখানেই সে তার ঘটনার সমাপ্তি ঘটাক।"' এই হলেন সা'দ জুমআ। তিনি সত্য কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন 'তিনদিন এভাবে ঘোরাঘুরি করার পর আমরা আলোচনা শুরু করলাম। আমরা তাঁকে বললাম, "ইসরাইলের মোকাবিলা করতে হলে জরুরিভাবে আমাদের অর্থ দরকার। আমাদের সমরাস্ত্র কিনতে হবে।" আমির বললেন, "অস্ত্র? অস্ত্রের কী দরকার? আপোসই সর্বোত্তম বিধান। আমার বিশ্বাস, আপোসই সর্বোত্তম বিধান।" এসব কথা বলে আমির চলে গেলেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারলাম না।'

সা'দ জুমআ লিখেছেন, 'কিছুদিন পর এই আমির সম্পর্কে জেনেভা থেকে আমাদের কাছে সংবাদ এলো : জেনেভায় গিয়ে এক সকালে তিনি বিরক্তিতে ঠোঁট বন্ধ করে বসেছিলেন। তাঁর খেদমতগারেরা বললেন,

"আমাদের সম্মানিত আমির, কী অবস্থা আপনার?" আমির বললেন, "আমার একজন উষ্ট্রী দোহনকারী প্রয়োজন।" খেদমতগারেরা বললেন, "এটা খুবই সহজ বিষয়।" তাঁরা তাঁদের দেশে ফোন করলেন। কিন্তু তাঁরা সামান্য ভুল করলেন। "আমাদের কাছে একজন উষ্ট্রী দোহনকারী পাঠিয়ে দাও" বলার বদলে বললেন, "আমাদের কাছে একটি উষ্ট্রী পাঠিয়ে দাও।" দেশের লোকেরা একটি উষ্ট্রীকে বিমানে ঢোকালো। উষ্ট্রী নিয়ে বিমান উড়ে গলো। জেনেভায় অবতরণ করলো। বিমান মাটিতে নামার পর যাত্রীদের তল্লাশি করার জন্যে পুলিশ সদস্য এলেন। হঠাৎ তাঁরা দেখলেন, বিমান থেকে এক "জিন" বেরিয়ে আসছে। তাঁরা—জেনেভা বিমানবন্দরের কর্মচারীরা—জীবনে কখনো উট দেখেন নি। সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তুমুল আওয়াজে সতর্কতা-সঙ্কেত বাজতে শুরু করলো। এরই মধ্যে এই জিন বিমানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। সতর্কতা-সাইরেন বেজেই চলছিলো। পুলিশ ও কর্মচারী সবাই একত্র হলেন। অবশেষে তাঁরা জিনটাকে পাকড়াও করতে পারলেন এবং আবার বিমানের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। এই বিমানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁরা মারাত্মক ঝুঁকি নেয়ার অভিযোগ দায়ের করলেন।' এ-ধরনের কুৎসিত বিপদ-আপদ লেগেই ছিলো যা কখনো কখনো হাস্যকর।

تمرست بالآفات حتى تركتها

تقول أمات الموت أم ذعر الذعر

'তুমি বিপদ-আপদের চর্চা করে করে অবশেষে তা ছেড়েছো।
তুমি বলে বেড়াও, মৃত্যুর মৃত্যু ঘটেছে এবং আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে আতঙ্ক।'
আল্লাহর কসম, এসব দুঃখ-দুর্দশা অন্তরকে রক্তাক্ত করে, হৃদয়কে বিক্ষত করে এবং আত্মার তন্তুগুলোকে ছিন্ন করে।

আবু সুফ্য়ানের যুদ্ধ-প্রস্তুতি

যাই হোক। কুরাইশরা অর্থ-সম্পদ জমা করলো। আবু সুফ্য়ান একটি বড়ো যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। কিনানা গোত্র, তুহামা সম্প্রদায় এবং আহাবিশদের মধ্য থেকে যাদেরকে পারলেন সবাইকে একত্র করলেন। আহাবিশ হলো সেসব লোক যারা মক্কার আশেপাশে ছিলো; কিন্তু তারা মক্কার অধিবাসী নয়। অর্থাৎ যারা বিভিন্ন এলাকা বা গোত্র থেকে এসে একত্র হয়ে বসবাস করতো তাদেরকে বলা হতো আহাবিশ। [أحبوشة-এর বহুবচন হলো أحابيش।] মক্কার নেতারা তাঁদের স্ত্রীদেরকেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত করলেন। তাঁরা শিবিকারোহিণী হয়ে (বা পালকিতে চড়ে) যুদ্ধের ময়দানে যাবেন। তাঁদের কাজ হলো : কুরাইশ বাহিনীর হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা চাগিয়ে তোলা এবং তাদের পৌরুষ জাগিয়ে তোলা।

আবু সুফ্য়ান তাঁর স্ত্রী হিন্দাকে নিয়ে বের হলেন। বদর যুদ্ধে হিন্দার তিন নিকটাত্মীয় নিহত হয়েছিলো : তাঁর বাবা উতবা বিন রবিয়া, তাঁর চাচা শায়বা এবং তাঁর ভাই ওয়ালিদ। ইকরামা তাঁর স্ত্রী উম্মে হাকিমকে নিয়ে বের হলেন। উম্মে হাকিম ছিলেন ইকরামার চাচা হারিস বিন হিশামের কন্যা। ইনি হলেন ইকরামা বিন আমর বিন হিশাম। হারিস বিন হিশাম ফাতিমা বিনতে ওয়ালিদ বিনতে মুগিরাকে নিয়ে প্রস্তুত হলেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়া বারাযা বিনতে মাসউদকে নিয়ে বের হলেন। আমর বিন আস রিতা বিনতে মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজকে নিয়ে বের হলেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিকটাত্মীয় বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। তারা সবাই ছিলো মক্কার নেতৃস্থানীয়। বদর যুদ্ধে বস্তুত মক্কার নেতা ও প্রধান ব্যক্তিরাই নিহত হয়েছিলো। এই নারীদের মধ্য থেকে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যার দুইজন বা তিনজন নিকটাত্মীয় নিহত হয় নি। হয় তার ভাই নিহত হয়েছে, না হয় বাবা নিহত হয়েছে।

আবু তালহা তাঁর স্ত্রী সালাফা বিনতে সা'দকে নিয়ে বের হলেন। সালাফা বিনতে সা'দ ছিলেন পাপাচারী নারী। তিনি নিজের দেহ বিকৃত করে পুরুষরূপ ধারণ করেছিলেন। (নিশ্চয় আল্লাহপাক নারীদের পুরুষরূপ ধারণ করা অপছন্দ করেন।) তাঁর তিন ছেলে মুসাফিহ [ব্যভিচারী], জুলাস [ওঠবসকারী] ও কিলাব [কুকুর]ও তাঁর সঙ্গে বেরিয়েছিলো।

আসিম বিন আবুল আকলাহ আল-আনসারি[৩৪] সালাফার তিন ছেলেকে হত্যা করেছিলেন।[৩৫] আসিম ছিলেন তিরন্দাজ। প্রথম একজনকে তিরবিদ্ধ করলে সে তার রক্তঝরা ক্ষত নিয়ে তড়পাতে তড়পাতে আসে এবং অবসন্ন শরীর নিয়ে তার মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়ে। তার মা তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'কে তোমাকে মেরেছে?' সে বলে, 'আমি একজনকে বলতে শুনেছি ধরো এটা [তির] এবং আমি হচ্ছি আসিম বিন আবুল আকলাহ।' দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনও একই কথা বলে। সালাফা তখন বলেন, 'লাত ও উয্যার কসম, আমি অবশ্যই তার মাথার খুলিতে মদ পান করবো।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় যেভাবে ঘোষণা করে কেউ ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কোনো সদস্যকে ধরিয়ে দিতে পারলে তার জন্যে আছে এক মিলিয়ন সিরিয়ান পাউন্ড পুরস্কার, সালাফা বিন সা'দও ঘোষণা করলেন, কেউ যদি আমাকে আসিমের মাথা এনে দেয় তার জন্যে আছে এই এই পুরস্কার। এভাবেই তিনি তাঁর কসম পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন এবং আসিমের মাথার খুলিতে মদ পান করতে চেয়েছিলেন।

---

[৩৪] ইনি মূলত আসিম বিন সাবিত রা.।

[৩৫] অহুদ যুদ্ধে তাদের হত্যা করেছিলেন। সালাফার স্বামীও অহুদ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন।

আসিম বিন আবুল আকলাহ রজি প্রান্তরে[৩৬] শহীদ হয়েছিলেন। অন্য ছয়জনের সঙ্গে তিনিও শহীদ হয়েছিলেন। সালাফা বিন সা'দ তাঁর সম্পর্কে কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা তিনি জানতেন। তাই তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহপাক, দিনের সূচনায় আমি তোমার দীন রক্ষা করেছি। সুতরাং দিনের শেষে তুমি আমার মৃতদেহ হেফাযত করো।' আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। একঝাঁক ভীমরুল তাঁর মৃতদেহকে ঘিরে রেখেছিলো। যখনই মুশরিকদের কোনো দল তাঁর মাথা কাটতে এসেছে, ভীমরুলের ঝাঁক তাদের ওপর আক্রমণ করেছে। মুশরিকরা আসিমের মাথা কেটে নিয়ে সালাফার কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিলো। তারা বলে, 'আমরা রাত পর্যন্ত আসিমের মৃতদেহের আশেপাশে অপেক্ষা করবো সিদ্ধান্ত নিলাম। বোলতাগুলো এভাবেই থাকুক। রাতের বেলা শৈত্যপ্রবাহ শুরু হলে সেগুলোর আর ওড়ার শক্তি থাকবে না। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো। আসিমের মৃতদেহ পানিতে ভেসে গেলো। পরে তার আর খোঁজ পাওয়া গেলো না।'

যাই হোক। আমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেন। আল্লাহপাক তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর পথে তাঁর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং আল্লাহপাকও তাঁর মৃতদেহকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই ছিলেন আসিম।

আফগানিস্তানে কারামত

মৃতদেহকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করার ঘটনা আফগানিস্তানে অনেক ঘটেছে। বাস্তবতা হলো, রাব্বুল আলামিন শহীদদের মৃতদেহকে বিকৃত ও বিলীন

---

[৩৬] চতুর্থ হিজরির সফর মাসের শুরুতে আদ্‌ল ও আলকারা গোত্রদুটির কয়েক ব্যক্তি এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে দাবি জানায় : আমাদের ধর্মের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদেরকে ধর্মশিক্ষা দেয়ার জন্যে আমাদের সঙ্গে কয়েকজন শিক্ষক পাঠালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশজন সাহাবি পাঠালেন। (এই সাহাবিদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ ছয়জন বলেছেন কেউ বলেছেন সাতজন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো তাঁরা ছিলেন দশজন।) এই দলের নেতা ছিলেন আসিম বিন সাবিত রা.।

এই দলটি মক্কা ও উস্‌ফান-এর মধ্যবর্তী হুযায়লিদের জলাশয়ের কাছে পৌঁছলে নিমন্ত্রণকারীরা তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং আক্রমণ করার জন্যে হুযায়ল গোত্রকে আহ্বান করে। কয়েক দিন আগেই হুযায়ল গোত্রের নেতা খালিদ সুফ্‌য়ান হযরত আবদুল্লাহ বিন উনায়সের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

তারা এসে বলে, 'তোমরা আত্মসমর্পণ করো। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে তোমাদের হত্যা করবো না।' আসিম বললেন, 'তোমাদের মতো বিশ্বাসঘাতকদের কথায় আমরা বিশ্বাস করি না।' ওরা তির নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। মুসলমানগণও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আসিমসহ সাতজন শহীদ হলেন এবং যায়দ, খুবায়ব ও আবদুল্লাহ বিন তারিক—এই তিনজন বন্দি হলেন।

হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁদের সম্মানিত করেন। আফগানিস্তানে অনেক মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন যাঁদের মৃতদেহে কয়েক বছরের মধ্যেও পচন ধরে নি। সত্য যে, শহীদের লাশ পচবে না, মাটিতে বিলীন হবে বা পোকায় খাবে না—এর পক্ষে [কুরআন ও হাদিসে] কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এ-ব্যাপারে সহিহ দলিল পাওয়া যাবে না। তবে আমরা অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা থেকে তা জেনেছি। যারমাতের কমান্ডার উমর বিন হানিফ বলেন, আল্লাহর কসম, এই দুইতিন বছরে আমি মুজাহিদদের বারোটি কবর খুলেছি। আল্লাহর কসম, আমি তাঁদের কারোর মৃতদেহ বিকৃত দেখি নি। তাঁদের কেউ কেউ দাড়িমুণ্ডিত ছিলেন। কবরে তাঁদের দাড়ি গজিয়েছে এবং লম্বা হয়েছে। আমি তাঁদেরকে নিজ হাতে দাফন করেছিলাম। সাইয়্যিদ শাহ-এর ঘটনাটি অনন্য। আমি যখন তাঁকে দাফন করেছিলাম, তাঁর দেহ রক্ত ও রক্তের সঙ্গে লেগে-থাকা ধুলো ও কাদামাটিতে মাখামাখি ছিলো। আমি তাঁর কবর খুলে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দেখি তাঁর মৃতদেহ কালো রেশমি কাপড়ে ঢাকা এবং সুগন্ধ বেরুচ্ছে। এমন চমৎকার পোশাক এবং এমন সুন্দর সুগন্ধ আমি কখনো পাই নি।' তিনি এই ঘটনা আমাকে দুইবার বলেছেন। আমি তাঁকে আল্লাহর নামে শপথও করিয়েছি। আমি তাঁর পাশে বসেছি এবং ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি করেছেন।

উমর বিন হানিফই আমাকে গুল মুহাম্মদের ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, 'গুল মুহাম্মদ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধফ্রন্টে ছিলেন। তিনি শহীদ হলেন। তিনদিন পর আমরা তাঁকে যুদ্ধের ময়দান থেকে বহন করে নিয়ে এলাম। তাঁর মৃতদেহ যেমন ছিলো তেমনি আছে। তারপর তাঁর বাবা এলেন। তিনি ইল্‌ম ও তাকওয়ায় অনেক বড়ো ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন, "বাবা, তুমি যদি সত্যিই শহীদ হয়ে থাকো তাহলে আমাকে একটা নিদর্শন দেখাও যে তুমি শহীদ।"' উমর হানিফ আমার সামনে কসম খেয়েছেন—আমরা আগেই বলেছি তিনি বিশ্বস্ত মানুষ; তিনি আমাদের কাছে এমনই ছিলেন এবং আমরা তা বিশ্বাস করেছি। তিনি কসম খেয়ে বলেছেন—তিনি জানতেন যে তিনদিন আগে শহীদ হওয়া ছেলেটিকে আমি দেখেছি—'গুল মুহাম্মদ হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তাঁর বাবার হাত স্পর্শ করলেন। প্রায় পোনে এক ঘণ্টা এভাবে তাঁর বাবাকে স্পর্শ করে ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর বাবা বললেন, "আমার হাত তো জড়িয়ে যাচ্ছে।"'

মৃতদেহ রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে মুহাম্মদ নাঈম আমাকে একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি মুহাম্মদ ইয়াসিরের ভায়রা-ভাই ড. মায়াজিল-এর অধীন একটি দলের কমান্ডার ছিলেন। মুহাম্মদ ইয়াসির শায়খ সাইয়াফ-এর নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক পর্ষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ

মানুষ। মুহাম্মদ নাঈম মুহাম্মদ ইয়াসিরের গাড়িও চালাতেন। তিনি আ াকে বলেছেন, 'মায়াজিল শহীদ হলেন। শহীদ হওয়ার আগে তিনি রাশিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। গোটা বাগলানের আমির ছিলেন তিনি। তাঁর শাহাদাত বরণের পর রুশ সেনাবাহিনী ও কমিউনিস্টরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। যে-এলাকায় তারা ড. মায়াজিলকে হত্যা করেছিলো, উল্লাসে নাচতে নাচতে সেই এলাকাটি দেখতে এলো । কমিউনিস্টদের এক নেতা এগিয়ে গেলো এবং মৃত মায়াজিলের মাথায় পদাঘাত করে আক্রোশ ও প্রতিহিংসা মেটাতে চাইলো। কিন্তু মায়াজিল তো মরেন নি। তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে জীবিত। কমিউনিস্ট নেতা মায়াজিলের মাথায় লাথি মারার জন্যে পা উঠাতেই তার পা অবশ হয়ে গেলো। এরপর তারা আরো নির্মম হয়ে উঠলো। মায়াজিলকে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে বাগলানের গ্রামের রাস্ত ায় রাস্তায় ঘুরাতে চাইলো। তাঁকে বাঁধার জন্যে কাফেরদের একটি দল যখন এগিয়ে গেলো, মায়াজিল "আমাকে আমার অস্ত্র দাও, আমাকে কালাশনিকভ দাও" বলে চিৎকার করে উঠলেন। কমিউনিস্টরা দ্রুত পালিয়ে গেলো। এভাবে তারা দুইতিনবার মায়াজিলকে বাঁধার জন্যে এলো এবং তিনি তাদের সামনে চিৎকার করে উঠলেন। এরপর তারা সে-এলাকার বড়ো আলেমদের কাছে গেলো। এই আলেমদেরকে কমিউনিস্টরা স্পর্শ করে নি। কমিউনিস্টরা তাঁদের বললেন, "আপনারা এই কাফনটি নিয়ে যান এবং ড. মায়াজিলকে তা পরান। এই রকম মানুষ যতোদিন আপনাদের মধ্যে থাকবে ততোদিন আপনারা কিছুতেই পরাজিত হবেন না।" মায়াজিলকে কাফন পরিয়ে দাফন করা হলো।'

'ঘটনার শেষ এখানেই নয়। তাঁর কবর থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি বেরুতে শুর করলো। পেশোয়ারের বাবাইতে তাঁর আত্মীয় নারীরা প্রচণ্ড কান্নাকাটি করলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন মুহাম্মদ ইয়াসিরের স্ত্রীর বোন। তাঁরা [মায়াজিলের পরিবার] মুহাম্মদ ইয়াসিরের বাড়ির পাশেই বসবাস করতেন। তাঁরাও প্রচণ্ড কাঁদলেন। মায়াজিল তাঁর গোত্রের নেতা ছিলেন, সৎ মানুষ ছিলেন এবং মুজাহিদদের আমির ছিলেন। আত্মীয়স্বজনের আশা-ভরসার স্থল ছিলেন। তাঁর আলাদা সম্মান ছিলো, প্রভাব ছিলো। একবার মায়াজিলের ভাই রাত জেগে নামায পড়লেন। তিনি দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমার ভাই যদি শহীদ হয়ে থাকে তাহলে তুমি একটি আলামত দেখাও যে সে শহীদ।" তখন মধ্যশীতকাল। রাত প্রায় একটা। তিনি ছাদ থেকে একটা বস্তু মেঝেতে পড়তে দেখলেন। বস্তুটা কী দেখার জন্যে তিনি আলো জ্বাললেন। দেখতে পেলেন একটা ফুলের তোড়া। তা থেকে আশ্চর্য সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু বাবাই ও তার আশেপাশে একটা ফুলও ছিলো না। মধ্যশীতকালে ফুল আসবে কোত্থেকে। (তারপর দ্বিতীয় তিন বা তৃতীয় দিনে আমি ওখানে যাই।

মুহাম্মদ ইয়াসির আমাকে বললেন, আসুন আপনাকে একটা ঘটনা শোনাই। তিনি আমাকে এই ঘটনা শোনালেন।)'

'মায়াজিলের ভাই ভালোভালে ফুলের তোড়াটি দেখলেন। ফুলগুলো নার্গিস ফুলের মতোই এবং সেগুলোর ওপর মধু ছড়ানো। এই মধু থেকে সম্পূর্ণ মেশকাম্বরের ঘ্রাণ আসছিলো। তিনি তাঁর বোনদের ঘুম থেকে ডেকে তোলেন এবং তাঁদেরকে ঘটনাটি বলেন। তাঁরা সবাই বলেন, আমরা তাহলে মুহাম্মদ ইয়াসিরকেও ঘুম থেকে জাগাবো এবং ঘটনাটি বললো। কিন্তু সময় শেষ হয়ে গিয়েছিলো। তাঁরা ফুলের তোড়াটিকে এতোবেশি ভালোবেসে ফেলেন যে সেটিকে কুরআন শরিফের ভেতরে রেখে দেন। সকালে কুরআন শরিফ খুলে দেখেন ভেতরে কিছু নেই।'

আবু সুফ্য়ান যুদ্ধযাত্রা শুরু করলেন। নারীরাও তাঁর সঙ্গে চললেন। হিন্দাও তাঁদের সঙ্গে এলেন। হিন্দা ওয়াহশির কাছে এলেন। ওয়াহশিকে তারা আবু দাসমা বলে ডাকতেন। তিনি যুবায়ের বিন মুতইমের গোলাম ছিলেন। হিন্দা তাঁকে বললেন, 'আমার চাচা তয়িমা বিন আদি বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। মুহাম্মদের চাচা হামযা তাঁকে হত্যা করেছেন। তুমি যদি তাঁকে হত্যা করতে পারো তাহলে তুমি আযাদ।' ওয়াহশি বলেন, 'আমি যুদ্ধে গেলাম ঠিকই তবে হামযা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ ছিলো না।' এদিকে হিন্দা যতোবারই ওয়াহশির কাছে গেলেন ততোবারই বললেন, 'আবু দাসমা, তুমি আমাদের মুক্ত করো এবং নিজে মুক্ত হও। তুমি আমাদের গ্লানি থেকে মুক্ত করো।' ওয়াহশির কাছে একটি বর্শা ছিলো। হাবশিরা বর্শা ভালো নিক্ষেপ করতে পারতো। ওয়াহশি বলেন, 'আমি হামযার দিকে তাকালাম, তাঁকে ধূসর উটের মতো উত্তেজিত দেখলাম। সিবা বিন আবদুল উয্যা হামযার দিকে এগিয়ে গেলেন। হামযা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "আয় দেখি ব্যাটা যোনিছেদনকারীর বাচ্চা।"' সিবা বিন আবদুল উয্যার মা মক্কায় খৎনার কাজ করতেন। তিনি মহিলাদের খৎনা করাতেন। ওয়াহশি বলেন, 'হামযা খুব সহজেই সিবাকে আয়ত্ত করে ফেললেন এবং তাঁর মাথা উড়িয়ে দিলেন। এই সুযোগে আমি হামযাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলাম। আমি সুখী হলাম যে বর্শা নিক্ষেপ করে লক্ষ্যভেদ করে ফেলতে পারলাম। বর্শা তাঁর তলপেট ভেদ করে দুই পায়ের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেলো। তিনি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আমার দিকে আসতে লাগলেন। কিন্তু আঘাত এতোটা তীব্র ছিলো যে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁর দেহ থেকে বর্শা টেনে বের করে আনলাম। আমি আমার দায়িত্ব শেষ করলাম। হামযাকে হত্যা করা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ ছিলো না।

ওয়াহশি তায়েফ বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'মক্কা বিজয়ের পর আমি তায়েফে পালিয়ে গেলাম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম তায়েফ অবরোধ করলেন। এখন আমি যাই কোথায়? লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। একজন আমাকে বললেন, "তুমি তাঁর কাছে যাও এবং ইসলাম গ্রহণ করো। কালিমা শাহাদাত পড়ে নিলে এই ব্যক্তি যে-কাউকে গ্রহণ করেন।" আমি লোকটার পরামর্শ গ্রহণ করলাম। চুপি চুপি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেছনে এসে বললাম, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওয়াহশি না?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ।" তিনি বললেন, "আমাকে বলো তুমি হামযাকে কীভাবে হত্যা করেছো।" আমি হামযাকে কীভাবে হত্যা করেছিলাম তা বিস্তারিত বললাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি আমার সামনে থেকে যাও। তোমাকে যেনো আর না দেখি।"' ওয়াহশি বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর থেকে দূরে সরে থেকেছি।'

উবাইদুল্লাহ বিন আদি আল-খিয়ার নামে এক মনীষী ছিলেন। ইনি তাবেয়িগণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি তখন হিমসে[৩৭] ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন জাফর বিন আমর বিন উমাইয়া আদ-দামিরি।' উবাইদুল্লাহ বিন আদি ও জাফর বিন আমর একসঙ্গে বের হলেন এবং হিমসের সব এলাকায় ওয়াহশিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। জীবনের শেষ দিকে ওয়াহশি হিমসে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা লোকদের কাছে তাঁর খোঁজ-খবর জানতে চাইলেন। লোকেরা তাঁদের জানালো, আপনারা অমুক জায়গায় যান। সেখানে তাঁর বাড়ি আছে। আপনারা যদি তাঁকে মাতাল পান—জীবনের শেষ সময়েও তিনি নেশা করতেন—তাহলে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আর যদি সুস্থ পান তাহলে যা জিজ্ঞেস করার করবেন। উবাইদুল্লাহ বিন আদি বলেন, 'আমরা ওয়াহশিকে খুঁজে বের করলাম। তাঁকে সুস্থই পেলাম; কোনো সমস্যা নেই। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি মাথা তুললেন। "তুমি বিন আদি বিন খিয়ার না?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, "তুমি যখন ছোটো ছিলে, আমি তোমাকে বহন করে তোমার মা সাদিয়ার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন তোমার পাদুটি দেখেছিলাম। এখন যখন তোমার পাদুটি দেখলাম, তোমাকে চিনতে পারলাম।"'

এটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। তাঁরা ছিলেন চরিত্র-বিদ্যা ও চিহ্ন-বিদ্যায় পারদর্শী। এটা ছিলো তাঁদের বৈশিষ্ট্য। উবাইদুল্লাহ বিন আদি বলেন, 'আমরা তাঁকে বললাম, হামযাকে কীভাবে হত্যা করেছিলেন তা আমাদের

---

[৩৭] সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক ও হোমার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি শহর। হিমসে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর কবর আছে।

বর্ণনা করুন। তিনি ঘটনা বিস্তারিত বললেন। “আমি ছিলাম হাবশি। খুব ভালো বর্শা নিক্ষেপ করতে পারতাম। লক্ষ্যভেদে খুব কমই ভুল হতো। আমি যুবায়ের বিন মুতইমের গোলাম ছিলাম। তাঁর চাচা তয়িমা বিন আদি বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। কুরাইশের কাফেলা যখন অহুদের যুদ্ধে যাত্রা শুরু করলো তখন যুবায়ের আমাকে বললেন, আমার চাচার বদলা নিতে তুমি যদি মুহাম্মদের চাচা হামযাকে হত্যা করতে পারো তাহলে তুমি আযাদ। আমিও লোকদের সঙ্গে বের হলাম। আগেই বলেছি আমি ছিলাম হাবশি [আবিসিনীয় বংশদ্ভূত]। যুদ্ধ শুরু হলে আমি হামযাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। এক সময় দেখতে পেলাম তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ধূসর উটের মতো লড়াই করে যাচ্ছেন। (ধূসর উট : যে-উটের গায়ে সাদা রঙের মধ্যে ছাইরঙ আছে।) তাঁর চেহারাও ধূসর উটের মতো। তরবারি দিয়ে শত্রুকে ক্ষতবিক্ষত করছেন। কেউ তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারছে না। আল্লাহর কসম, তখনই আমি তাঁর জন্যে ওত পেতে বসলাম। গাছ বা পাথরের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখলাম যাতে তিনি আমার কাছাকাছি হন এবং আমাকে দেখতে না পান। এভাবে আমি তাঁকে আমার আয়ত্তে পেতে চাইলাম। এই সময় সিবা বিন আবদুল উয্যা তাঁর দিকে এগিয়ে গেলো। হামযা তাঁকে দেখে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, কাছে আয় দেখি ব্যাটা যোনিছেদনকারীর বাচ্চা! হামযা তার ওপর এমনভাবে আঘাত হানলেন যে ধড় থেকে মাথা উড়িয়ে দিতে মোটেই সমস্যা হলো না। এই সুযোগে আমি আমার বর্শা নিক্ষেপ করলাম এবং লক্ষ্যভেদ করে ফেললাম। আমার বর্শা হামযার তলপেট ছেদ করে দুই পায়ের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেলো। তিনি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আমার কাছে আসতে চাইলেন; কিন্তু আসতে পারলেন না। যখম এতোটাই মারাত্মক ছিলো যে মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি দূরে বসে থেকে দেখলাম। এভাবেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। মরে যাওয়ার পর তাঁর দেহের কাছে গেলাম এবং বর্শাটি টেনে বের করলাম। এরপর কুরাইশদের বাহিনীর কাছে ফিরে এলাম। আমার আর কোনো কাজ ছিলো না। আমি বসে থাকলাম। আমি তাঁকে হত্যা করেছি কেবল এই জন্যে যে আমাকে আযাদ করা হবে। যুদ্ধ শেষে মক্কায় ফিরে এলে আমাকে আযাদ করা হয়। আমি মক্কাতেই ছিলাম। এরই মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে মক্কা বিজিত হলে আমি তায়েফে পালিয়ে যাই। সেখানেই অবস্থান করি। কিছুদিন পর তায়েফের একটি প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যায়। ধর্মকর্ম আমার জন্যে অসম্ভব বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আমি ভাবলাম শাম [সিরিয়া] বা ইয়ামেন বা অন্যকোনো দেশে চলে যাবো। আল্লাহর কসম, আমি এই চিন্তা-ভাবনাতেই ছিলাম। এই সময় এক লোক আমাকে বললো, তোমার জন্যে আফসোস! আল্লাহর কসম, তিনি [রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তো এমন মানুষকে হত্যা

করেন না যে তাঁর দীনে প্রবেশ করে এবং কালিমা শাহাদাত পড়ে। আমি লোকটির পরামর্শ মেনে নিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে মদিনায় গেলাম। তিনি আমাকে যেনো দেখতে পান এমনভাবে তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং কালিমা শাহাদাত পড়লাম। কণ্ঠস্বর শুনে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওয়াহশি না?" আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ। তিনি বললেন, "এখানে বসো এবং আমাকে বলো কীভাবে তুমি হামযাকে হত্যা করেছিলে।" আমি তোমাদেরকে যেভাবে বিস্তারিত ঘটনা বললাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও তাই বলেছিলাম। আমি যখন আমার কথা শেষ করলাম, তিনি বললেন, "তোমার জন্যে আফসোস! তুমি আমার সামনে থেকে দূরে সরে যাও। আর কখনো যেনো তোমাকে না দেখি।" এরপর আমি সব সময় নিজেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম যাতে তিনি আমাকে না দেখতে পারেন। এই অবস্থাতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ইন্তেকাল করলেন।"

"মুসলমানেরা যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলো, আমি তাদের সঙ্গে গেলাম। তারা যখন মুসাইলামা বিন কায্যাবের বিরুদ্ধে লড়াই করলো, আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। আমি মুসাইলামাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ আমি তাকে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অন্যপাশ থেকে এক আনসারি মুজাহিদও তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমরা দুজনই তাকে হত্যা করতে চাচ্ছিলাম। আমি বর্শা বের করে তার ওপর আঘাত করলাম এবং সন্তোষজনকভাবে লক্ষ্যভেদ করে ফেললাম। আনসারি মুজাহিদও তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তরবারি দিয়ে তীব্রভাবে আঘাত করলো। প্রতিপালকই ভালো জানেন আমাদের কে তাকে হত্যা করেছে। আমি যদি তাকে হত্যা করে থাকি তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে আমি হত্যা করেছি এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষকেও আমি হত্যা করেছি।"

বিন হিশাম বলেন, আমার কাছে এই তথ্য এসেছে যে ওয়াহশিকে বার বার দণ্ড প্রদান করা হয়েছিলো এমনকি ভাতাপ্রদানের নিবন্ধন-খাতা থেকেও তাঁর নাম কেটে দেয়া হয়েছিলো। সৈনিকদের খাতায় তাঁর নাম ছিলো এবং নিয়মিত ভাতা প্রদান করা হতো। মদ পান করার অপরাধে তাঁকে প্রথমবার দণ্ড প্রদান করা হয়... দ্বিতীয়বারও দণ্ড প্রদান করা হয়। শেষবার বিচারকেরা বলেন, ভাতার খাতা থেকে আমরা তাঁর নাম কেটে দেবো এবং তাঁকে কোনো ধরনের ভাতা প্রদান করা হবে না। উমর রা. বলেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে আল্লাহ তাআলা হামযার হত্যাকারীকে এমনিতেই ছেড়ে দিতে চান নি। তাই তাঁকে এই ব্যাধিতে নিপতিত করেছিলেন। মদপানের ব্যাধি... যা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছিলো।

মুসলমানেরাও অহুদ যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উবাই এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে ফিরে এলো। যুদ্ধে যাত্রা করার আগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। যুবকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন। বিশেষ করে যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি তাঁরা বেশি উদ্‌গ্রীব ছিলেন। বুড়োরা মদিনায় বসে থাকাকেই শ্রেয় মনে করলেন। বিশেষভাবে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই। সে পার্থিব সম্পদ লাভের জন্যে যুদ্ধে গিয়েছিলো। পার্থিব সম্পদকেই সে তার কেবলা বানিয়েছিলো। সে লড়াই করতে বা মৃত্যুবরণ করতে যায় নি।

হাফিজ আল-আসাদ ও সাদ্দাম হোসেনের চারপাশে যে-সব পুনর্জাগরণবাদীরা আছে তারাও আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মতো। এরাও মন্ত্রিত্বের লোভে, সম্পদের লোভে এসেছে। ক্ষমতা ও পদের লোভে এসেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় চায়। অভ্যুত্থান ঘটাতে চায়। কিন্তু মাথার ওপর যখন কুঠার নেমে আসে, তারা দূরে সরে যায়। সামনে মৃত্যু দেখে পালিয়ে যায়। তারা পালিয়ে যায় কারণ তারা একমাত্র দুনিয়ার ভোগসামগ্রী অর্জন করতেই এসেছে। তাদের আর কোনো লক্ষ্য নেই।

আবদুল্লাহ বিন উবাই এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে অহুদের পথ থেকে সরে এলো। জাবের রা.-এর পিতা আবদুল্লাহ বিন হারাম তাদের কাছে গেলেন। তাদেরকে আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাদের বললেন, তোমরা ফিরে যেয়ো না। মুনাফিকেরা বললো, আমরা যদি যুদ্ধ করতে জানতাম তাহলে আপনাদের অনুসরণ করতাম। তারা এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে ফিরে আসার ফলে গোটা বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তারা যদি ফিরে না আসতো তাহলে খুব ভালো হতো বা ক্ষতি কম হতো। কারণ তারা সবাইকে বাধাগ্রস্ত, হতোদ্যম ও নিরাশ করে ছেড়েছে।

এমন মানুষ এখনো আছে। এরা কেবল বিভ্রান্তি ও হতাশা সৃষ্টি করে। এরা পেশোয়ারে আসে, তিনদিন-চারদিন বা তিন-চার সপ্তাহ থাকে, তারপর চলে যায়। সীমানার কাছাকাছি পৌঁছে, তারপর দেশে ফিরে গিয়ে মানুষকে সুসংবাদ দেয় ও সতর্ক করে। প্রোপাগান্ডা বিস্তার করে। আফগানিস্তানের জিহাদ বিদআত ও শিরকি। অর্থহীন বিশৃঙ্খলা ও চূড়ান্ত মতানৈক্য।

আল্লাহপাকই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক। হায়! তারা যদি আমাদের না দেখতো এবং আমরাও যদি তাঁদের না দেখতাম! হায়! তারা যদি সীমানা অতিক্রম না করতো? মুমিনদের অকল্যাণের ব্যাপারে আল্লাহপাকই যথেষ্ট।

আজ আমার কথা এখানেই শেষ করছি। আমি আমার জন্যে এবং আপনাদের জন্যে আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

অহুদ যুদ্ধ : দুই

আমরা আজ ১৪০৮ হিজরির জিলকদ মাসের ৮ তারিখ, মোতাবেক, ১৯৮৮ সালের ২২ শে জুন আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। আমরা প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। আমরা আশা করি, আমাদের আলোচনা আপনাদের হৃদয়ে তীব্র তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা অহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলি ও এতে মুসলমানদের বিপর্যয়ের কথা আলোচনা করছিলাম। অহুদ যুদ্ধকে মুসলমানদের ইতিহাসে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাববিস্তারকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হয়েছিলো। কিন্তু অহুদ যুদ্ধে তাদের বিপর্যয় ইসলামি দাওয়াত, নেতৃত্ব ও আনুগত্যের জন্যে সুস্পষ্ট রূপরেখা নির্ণয় করে দিয়েছিলো। এবং এটাই ছিলো প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। অহুদ যুদ্ধ ইসলামি কাফেলার নির্মাণ ও গঠনে কিছু গভীর দাগ বসিয়ে দিয়েছিলো। চূড়ান্ত বিচারে অহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় বরণই মহান আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিলো। রাব্বুল আলামিন শাহাদাতের নাজরানা গ্রহণ করেছেন। মুসলমানদের পরিশোধন করেছেন। তাদের বিশুদ্ধ করেছেন। বিজয় লাভের জন্যে অপরিহার্য শর্তগুলো তাদের কাছে বিশদ করেছেন। বিজয় লাভের প্রধানতম শর্ত হলো আল্লাহপাকের আনুগত্য এবং এ-কারণেই আমির বা কমান্ডারের আনুগত্য।

আমরা আগেই বলেছি, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই তিনশত অনুসারী নিয়ে দলত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলো। মাত্র সাতশত সাহাবি (রাযিআল্লাহু আনহুম) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরকে তীরন্দাজদের কমান্ডার হিসেবে পাহাড়ের ওপর নিয়োজিত করলেন। তাঁর সঙ্গে পঞ্চাশজন এবং অন্য বর্ণনামতে সত্তরজন তীরন্দাজ ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বলেছিলেন, 'যদি দেখো আমরা উড়ন্ত পাখিও মুঠোয় পুরে নিচ্ছি [বিজয় লাভ করেছি] তারপরও তোমরা তোমাদের নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করবে না। আমরা সংবাদ পাঠানোর আগ পর্যন্ত তোমরা সে-জায়গা ছেড়ে আসবে না।' অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'আমরা বিজয়ী হই বা পরাজিত হই, আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তোমরা নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করবে না।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রণাঙ্গনে তাঁর সাহাবিদের বিন্যস্ত করলেন। মুসলিম সৈন্যদের বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু হলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে এর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন—

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

'আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালোবাসো তা তোমাদের দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কয়েকজন পার্থিব জীবন চাচ্ছিলো আর কয়েকজন চাচ্ছিলো আখেরাত। এরপর তিনি পরীক্ষা করার জন্যে তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৫২]

যুদ্ধের ঘটনাবলি

আল্লাহপাক মুমিনদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন। তাঁরা কুরাইশদের পতাকাধারীদের হত্যা করেছিলেন। কুরাইশদের পতাকাধারীরা ছিলেন বনু আবদুদ দার গোত্রের।[৩৮] হিন্দা বিনতে উতবা অন্য নারীদের সঙ্গে নিয়ে গান গাচ্ছিলেন এবং দফ বাজাচ্ছিলেন। তাঁরা বলছিলেন—

ويها بني عبد الدار

ويها حماة الأدبار

ضربا بكل بتار

---

[৩৮] সর্বপ্রথম কুরাইশদের প্রখ্যাত বীর পতাকাধারী তালহা রণাঙ্গনে নেমে ব্যঙ্গস্বরে বলে, 'তরবারির আঘাতে দ্রুতই আমাকে দোযখে পৌঁছে দিতে বা আমার তরবারির ঘা খেয়ে বেহেশতে যেতে প্রস্তুত, মুসলমানদের মধ্যে এমন বীরপুরুষ কেউ আছে কি?' হযরত আলি রা. এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'চিন্তা করো না, এখনি তোমাকে তোমার কাঙ্ক্ষিত দোযখে পৌঁছে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি তরবারি উঠিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। এক আঘাতে তালহা ধরাশায়ী হয়ে জাহান্নামে পৌঁছে গেলো। তার হাতের পতাকা মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। তালহার এই পরিণাম দেখে তার ভাই উসমান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। হাতে পতাকা তুলে নিয়ে আস্ফালন করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগলো। মহান বীর আমির হামযার তরবারির আঘাতে সেও তার ভাইয়ের সঙ্গে জাহান্নামে পৌঁছলো। তাদের তৃতীয় ভাই আবু সাঈদ পতাকা উঠিয়ে সোজা হতে না হতেই সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. তাকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করলেন। তারপর ক্রমান্বয়ে তালহার বংশের চতুর্থ ব্যক্তি পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলো। কিন্তু সেও মুসলমান বীরদের হাতে নিহত হয়েছিলো।

কুরাইশরা তাদের নায়কদের শোচনীয় পরিণাম দেখে আর যুগ্মযুদ্ধে এগিয়ে আসতে সাহস পেলো না। তারা সমবেতভাবে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করলো। কুরাইশ নারীরা সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য বাজিয়ে তালে তালে রণসঙ্গীত গেয়ে সৈন্যদের উত্তেজিত করতে লাগলো।

'হে বনু আবদুদ দার, কী লজ্জা! কী লজ্জা, হে পশ্চাদ্‌ধাবমান পতাকাবাহীরা! তোমরা আঘাত করো প্রচণ্ড আক্রোশে!'

এবং তাঁরা গাইছিলেন—

نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقْ + نَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ

الدر في المخانق + وَالْمِسْكُ فِي الْمَفَارِقْ

إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِق + ونفرّش النمارق

أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ + فِرَاقَ غَيْرَ وَامِق

'আমরা অভিযাত্রীর কন্যা / হাঁটি ফুল-শয্যায়
আমাদের গ্রীবায় মুক্তা / সিঁথিতে মেশক।
তোমরা যদি অগ্রসর হও, আমরা তোমাদের আলিঙ্গন করবো /
প্রস্তুত করবো ফুল-শয্যা
আর যদি পশ্চাদ্‌পদ হও, তোমাদের সঙ্গে ঘটবে বিচ্ছেদ /
অসন্তোষের চিরবিচ্ছেদ।'

মুসলিম মুজাহিদরা একের পর এক পতাকাবাহীকে হত্যা করলেন। কুরাইশের পতাকা মাটিতে পতিত হলো। অবশেষে তা এক নারী বহন করলেন। তাঁর নাম আলকামা আল-হারিসিয়্যা। এই নারীর হাত থেকে পতাকাটি নেন তাদেরই একজন ক্রীতদাস। তাঁকে ফাওয়াব বলে ডাকা হতো। এই নামে ডেকে তারা তাঁর প্রতি নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করতো। তিনি কবিতা রচনায় উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। আল্লাহপাক তাঁর প্রতি রহম করুন। ... কিন্তু ঘটনা যা ঘটার তাই ঘটলো... 'তোমাদের কয়েকজন পার্থিব জীবন চাচ্ছিলো আর কয়েকজন চাচ্ছিলো আখেরাত।'[৩৯]

পাহাড়ে নিয়োজিত মুসলিম বাহিনীর তীরন্দাজেরা যখন মুশরিকদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে দেখলেন, তাঁরা নিচে নেমে এলেন। আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি নিজেকে দেখলাম হিন্দা বিনতে উতবার পায়ের মলের দিকে তাকিয়ে আছি।[৪০] (এমন অলঙ্কার যা মেয়েরা টাখনুর নিচে পরে।) আমি হিন্দা ও তাঁর সঙ্গিনীদের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছি— তারা দৌড়াচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে। তারা কম বা বেশি—কোনোকিছুই নিয়ে যেতে পারলো না। এই সময়েই তীরন্দাজেরা রণাঙ্গনে নেমে গেলো।'

---

[৩৯] পার্থিব জীবন বা দুনিয়া চেয়েছিলো বলে যাঁরা পাহাড় থেকে নেমে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কুড়াতে গিয়েছিলেন তাঁদের বুঝানো হয়েছে। আখেরাত চেয়েছিলো বলে বুঝানো হয়েছে যাঁরা পাহাড়ে তাঁদের দায়িত্বে অটল ছিলেন। যেমন : আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের।

[৪০]এখানে خدم হলো خدمة-এর বহুবচন। এর অর্থ পায়ের মল বা খারু।

যে-সকল তীরন্দাজ পাহাড়ের চূড়ায় নিয়েজিত ছিলেন, কাফেরদের পালিয়ে যেতে দেখে বললেন, 'আমরা নেমে যাবো।' আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের তাঁদের বলেন, 'কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।' তাঁরা বলেন, 'রাসুল যে-আদেশ দিয়েছিলেন তার বাস্তবায়ন শেষ; যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে যাবো।' আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের বলেন, 'কিন্তু আমি নামবো না; আমি এখানে থাকবো।' তীরন্দাজেরা সবাই নেমে গেলেন। আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের এবং তাঁর সঙ্গে মাত্র দশজন পাহাড়ে থাকলেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ এই দৃশ্য পাহাড়ের গিরিপথ থেকে দেখতে পেলেন। খালিদ রা. জীবনে কোনো যুদ্ধে পরাজিত হন নি; ইসলাম গ্রহণের আগেও না, ইসলাম গ্রহণের পরেও না। কখনো না। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, 'আমি শতেকখানি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমার দেহে এক বিঘত জায়গাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে বর্শার ঘা, তীর-বেঁধা বা তরবারির আঘাতের চিহ্ন নেই। কিন্তু হায়! নির্বোধ উটের মৃত্যুর মতো আমাকে বিছানায় শুয়েই মরতে হবে।' আমাদের নেতা খালিদ বিন ওয়ালিদের রণাঙ্গনে শাহাদাতবরণ না করা আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে ভীরুদের জন্যে এক বিরাট শিক্ষা।

তার কারণ, সত্য হলো, খালিদ বিন ওয়ালিদের যুদ্ধ-প্রতিভা ও রণনৈপুণ্য ছিলো আশ্চর্যজনক। হ্যাঁ, অসম্ভব উৎকর্ষময়। এজন্যে কেবল ইসলাম গ্রহণের ফলেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিভিন্ন যুদ্ধে নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করেন। মুতার যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের উদ্ধার করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আল্লাহপাকের উন্মুক্ত তরবারি অভিধা দিয়েছিলেন। সুতরাং কেমন হতো যদি খালিদের জন্যে তাঁর বংশের নারীদের অশ্রু ঝরতো!

যাই হোক। তীরন্দাজদের নেমে যেতে দেখে খালিদ বিন ওয়ালিদ পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে এলেন এবং পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের এবং তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করলেন। তীরন্দাজদের পাহাড় দখল করে নিলেন। তিনি মুসলমানদের পেছন থেকে ধাওয়া করলেন। পেছন থেকে ধাওয়া করলেন এবং যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো। ছত্রভঙ্গ কুরাইশ দল সঙ্গবদ্ধ হয়ে উঠলো।[৪১] আযব বিন আযিব—আকাবার

---

[৪১] খালিদ বিন ওয়ালিদের দল 'হুবল দেবতার মর্যাদা উঁচু হোক' বলে জয়ধ্বনি করতে করতে অপ্রস্তুত মুসলমানদেরকে আক্রমণ করলো। এই জয়ধ্বনি শুনে মালামাল সংগ্রহে ব্যস্ত মুসলমানরা হকচকিয়ে গেলেন। পলায়নপর কুরাইশ দল ঘুরে দাঁড়ালো। ভূলুণ্ঠিত পতাকা হাতে তুলে নিলো। সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক থেকে তারা মহাবিক্রমে আক্রমণ করলো।

শয়তান, বিন ইসহাক তাকে এভাবেই অভিহিত করেছেন—চিৎকার করে উঠলো : মুহাম্মদ নিহত হয়েছে। সত্য হলো, আসলে যিনি নিহত হয়েছিলেন তিনি হলেন মুসআব বিন উমায়ের। তিনি শারীরিক গঠনের দিক থেকে খানিকটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মতো ছিলেন। বিন কামিয়া নামক এক শত্রু তাঁকে হত্যা করেছিলো। হত্যা করেই সে বলে উঠলো : আমি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি। মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। আবু সাঈদ খুদরি বর্ণনা করেন, 'উতবা বিন আবু ওয়াক্কাস [হযরত সা'দের ভাই] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে। এতে তাঁর নিচের পাটির ডানপাশের রুবাই দাঁতটি ভেঙ্গে যায়। এটি সামনের রুবাই দাঁত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিচের ঠোঁটও আক্রান্ত হয়। আবদুল্লাহ বিন শিহাব আয-যুহরি রাসুলের কপালে আঘাত করে। আবদুল্লাহ বিন কামিআ রাসুলের গণ্ডদেশে আঘাত করে। এতে তাঁর গণ্ডদেশে লৌহ শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া বিঁধে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গর্তে পতিত হন। দুর্বৃত্ত আবু আমের [হযরত হানযালার পিতা] এই গর্তটি খুঁড়েছিলো। সে ছিলো ফাসেক এবং তাকে পুরুত বলে ডাকা হতো। তারা যুদ্ধের ময়দানে অসংখ্য গর্ত খুঁড়ে রাখতো। হালকা মাটি দিয়ে গর্তের উপরাংশ ঢেকে রাখতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ-রকম একটি গর্তে পতিত হন এবং আরো আঘাত পান। আলি রা. গর্তে নামেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত ধরে ওপরে তোলেন। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বহন করেন এবং এভাবে তিনি উঁচু হয়ে গর্ত থেকে বের হয়ে আসেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডল ও আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্ত ঝরছিলো। আবু সাঈদ খুদরি (মালিক বিন সিনান) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে এগিয়ে আসেন। তিনি মুখ দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেহ থেকে ধুলো-মাটি পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। এরপর রক্তক্ষরণ আরো বেড়ে যায়—বিন ইসহাক এমনটিই বর্ণনা করেছেন—এবং আবু সাঈদ খুদরি রক্ত চুষে নিতে শুরু করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, (বিন হিশামের বর্ণনামতে) 'যার রক্তের সঙ্গে আমার রক্ত মিশ্রিত হবে তাকে আগুন স্পর্শ করবে না।'[৪২] তালহা রা. সেদিন অনেক বড়ো বড়ো কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন। এজন্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'তালহা নিজের জন্যে

---

[৪২] মিশকাতুল মাসাবিহ, 'মানাকিবুল আশারাতিল মুবাশ্‌শারাহ' অধ্যায়।

আবশ্যক করে নিয়েছে।'[৪৩] অর্থাৎ তিনি নিজের জন্যে জান্নাত আবশ্যক করে নিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছিলেন, 'কেউ যদি আকাশে বিচরণশীল শহীদকে দেখতে চায় সে যেনো তালহা বিন উবায়দুল্লাহর দিকে তাকায়।'[৪৪]

আবু উবায়দা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গণ্ডদেশে বেঁধা শিরস্ত্রাণের কড়া বের করে আনার জন্যে এগিয়ে আসেন। রাসুলের মাথার ওপর শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গিয়েছিলো। শিরস্ত্রাণ মানে যুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে পরিধেয় বর্ম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারায় বর্মের টুকরো ঢুকে গিয়েছিলো। আবু উবায়দা সেটাই বের করতে আসেন। লোহার প্রথম টুকরোটি বের করতে গিয়ে আবু উবায়দার সম্মুখভাগের একটি দাঁত ভেঙ্গে পড়ে। দ্বিতীয় টুকরোটি বের করতে গিয়ে তাঁর সম্মুখভাগের দ্বিতীয় দাঁতটিও ভেঙে পড়ে। এজন্যে আবু উবায়দা সামনের দুই দাঁতহীন ছিলেন।

হযরত ফাতেমা ও আলি রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে দিতে আসেন। ফাতেমা রা. যখনই ক্ষতস্থানে পানি ঢালছিলেন, ক্ষতস্থান প্রসারিত হচ্ছিলো এবং অনবরত রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। ফাতেমা রা. চাটাইয়ের একটা অংশ পুড়ে ক্ষতস্থানগুলোতে ছাই লাগিয়ে দেন। এতে রক্তপড়া বন্ধ হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, اشتد غضب الله على أناس أدموا وجه نبيهم 'যারা তাদের নবীর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত প্রবাহিত করেছে তাদের ওপর আল্লাহপাকের তীব্র গযব বর্ষিত হয়েছে।'[৪৫]

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস বলেন, [রাসুলের দাঁত শহীদ করার কারণে আমার ভাই] উতবা বিন আবু ওয়াক্কাসকে হত্যা করার যে-প্রচণ্ড তৃষ্ণা আমার বুকে জেগেছিলো আর কাউকে হত্যা করার জন্যে এমন তৃষ্ণা জাগে নি। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই অভিসম্পাত আমাকে খানিকটা সান্ত্বনা দিলো : যারা রাসুলের মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ঝরিয়েছে তারা আল্লাহর ভীষণ শাস্তিতে নিপতিত হয়েছে।

আল্লাহপাক আমাদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সঙ্গীবর্গ এবং পরিবার-পরিজনের ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

---

[৪৩] মুসনাদে আহমদ, হাদিস ১৪১৭; কানযুল উম্মাল, হাদিস ৩০০৪৯; আবদুল্লাহ বিন মুবারক, কিতাবুল জিহাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০২।

[৪৪] সুনানে তিরমিযি, হাদিস ২৯৪০; কানযুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৬৫৯৬।

[৪৫] অধিকাংশ হাদিসের ভাষ্য হলো : 'সে-জাতি কীভাবে সফলকাম হবে যারা তাদের নবীর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করেছে।' আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি, জামিউল বায়ান, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫১; ফাতহুল বারি, হাদিস ৬৫৩০।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা, বাস্তব হলো রণাঙ্গনের এসব আঘাতও দুনিয়া ও আখেরাতের পাথেয়। দুনিয়ায় পাথেয় এ-কারণে যে, মানুষ যখন কোনো ঘটনায় [মূল্যবান কিছু] বিসর্জন দেয়, তার কাছে সে-ঘটনাটি প্রিয় ও শ্রদ্ধাযোগ্য হয়ে ওঠে। যে-পরিমাণ বিসর্জন দেয়া হবে, ঘটনাটির জন্যে হৃদয়ের গভীরতায় সে-পরিমাণ ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হবে। যেসব মানুষ তাদের কর্মে বিসর্জন করে না, তারা তাদের কর্মে সফল হতে পারে না। প্রবাদ আছে : যারা বিনাযুদ্ধে দেশ অধিকার করে, তাদের জন্যে সেই দেশ হাতছাড়া করা খুবই সহজ। যারা প্রাণ উৎসর্গ করে স্থায়িত্ব কেবল তাদের জন্যেই।

আপনারা এখন আফগানিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে কোন্ আফগানরা নেতৃত্বে থেকে লড়াই করেছে আর কোন্ আফগানরা নেতৃত্বে থেকেও লড়াই করে নি। যারা নেতৃত্বে থেকে লড়াই করে তারা এই পৃথিবীতে কারো জন্যে তাদের বিষয়ে সামান্যতম ছাড় দেবে না। তারা বলে, আমরা এটা পনেরো লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছি। আমরা এই রাষ্ট্র কারো কাছেই অর্পণ করবো না; আমেরিকার কাছেও না, রাশিয়ার কাছেও না। কোনো আরব রাষ্ট্রের কাছে না এবং অনারব রাষ্ট্রের কাছেও না। আমরাই রক্ত দিয়েছি। জান কুরবান করেছি। প্রাণ বিসর্জন দিয়েছি। আমরাই আমাদের বিষয়-আশয় দেখবো; রাষ্ট্র পরিচালনা করবো। যখন আমরা তীব্র সঙ্কট, ভয়াবহ বিপর্যয় এবং চারদিক থেকে আচ্ছন্ন করা দুর্দশায় থেকেও আমাদের দেশকে পরিচালনা করতে পারবো, তখন সুখ ও শান্তির দিনে আরো ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবো। হেকমতিয়ার, শায়খ সাইয়াফ, শায়খ রব্বানি এবং শায়খ খালেস—এই চারজন সবসময় জহির শাহকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। জহির শাহ চূড়ান্ত-রূপে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। অর্থাৎ একজন আফগান পুরুষ ফিরে আসতে চাইলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। শায়খ সাইয়াফ বলেছেন, কারা আফগানিস্তানের ওপর মাতবরি করতে চায়? কারা এই দেশ শাসন করতে চায়? যারা পশ্চিমে বসবাস করে? পশ্চিমে বসে থেকে তারা এই দেশ শাসন করতে চায়? তাদের তো পৌরুষ বলতে কিছু নেই! তারা শরীর থেকে এককোঁটা ঘামও বের করে নি। আফগান নারীদের মর্যাদা রক্ষার জন্যে দেহ থেকে এককোঁটা রক্তও ঝরায় নি। তারা পশ্চিমে সুখযাপন করেছে বা সৌদি আরবে সুখযাপন করেছে বা উপসাগরীয় দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করেছে বা রাজনৈতিক আশ্রিতের পরিচয় ধারণ করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামিয়েছে। ভয়াবহ বিপর্যয় ও সঙ্কটের দিনগুলোতে পশ্চিমা গোষ্ঠী তাদের লালনপালন করেছে। এরা কারা? একজনের নাম আবদুল হাকিম তবিবি। এই আবদুল হাকিম তবিবি এখন আফগানিস্তান

পুনর্গঠনের বিষয়ে পরামর্শদাতা। অর্থাৎ তার নাম পেশ করা হয়েছে। আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হতে তার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে।
শায়খ সাইয়াফ ও ইউনুস খালেস আবদুল হামিদ তবিবি সম্পর্কে একটি ঘটনা বলেছেন। তাঁরা বলেন, জেনেভায় একবার আমরা তার সঙ্গে গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিলাম। সে আমাদের তার বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। যাওয়ার সময় পথের পাশে খ্রিস্টানদের কবরস্থান দেখা গেলো। কবরের ওপরে ফুল ছড়ানো এবং কবরগুলোর চারপাশে সবুজ গালিচা বিছনো। সে আফসোস করে বলছিলো, তার কবর যেনো এসব কবরের মধ্যে হয়! খ্রিস্টানদের কবরস্থানে!! আসলে পশ্চিমারা তাকে কী দিতে চেয়েছিলো? তারা খুলির পর্বতের ওপর তার সিংহাসন নির্মাণ করতে চেয়েছিলো। তারা লাশের পাহাড়ের ওপর তার মসনদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো।
এ-কারণেই যাঁরা রক্ত বিসর্জন দেন ও প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাঁরা যে-আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করেন, তার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা থাকে। যে-আকিদা ও বিশ্বাস নির্মাণ করার জন্যে তাঁরা জান কুরবান করেন তার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা থাকে। আর যারা কিছু বিসর্জন দেয় না তাদের জন্যে কোনো সমস্যা নেই। আবদুল হাকিম তবিবি, জহির শাহ, মুহাম্মদ ইউসুফ, সামাদ হামেদ আবু লাবান এবং অমুক ও তমুক এসে আফগানিস্তান হাতের মুঠোয় পুরে নিতে চায়। কারণ তারা কিছু বিসর্জন দেয় নি। আফগানিস্তানের ভেতরে থেকে একটি গুলিও ছোঁড়ে নি। আফগানিস্তানের ভেতরে একটি রাতও যাপন করে নি। তারা তরঙ্গে ভেসে বেড়ায়। ঝড়ে উড়ে বেড়ায়। তারা এমন সুবিধা পেতে চেয়েছে যা তারা জীবনেও কাজে লাগাতে পারে নি। একদলের লাশের ওপর আরেকদল তাদের সিংহাসন ও মসনদ প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের স্ত্রীরা কি একটি রাতও ক্ষুধার্ত থেকেছে? তারা তাদের পরিবার থেকে কি একজন শহীদও পেশ করেছে? তারা কি বিধবাদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠা একটি রাতেরও আর্তনাদ শুনেছে? তারা কি এতিমদের কান্না শুনেছে? এতিমদের বিলাপ শুনেছে? না, তারা কিছু শোনে নি। শাহাদাতবরণের জন্যে কাউকে পেশ করে নি। যে কিছুই বিসর্জন দেয় নি, আফগানিস্তান শাসন করার অধিকার তার নেই। যারা রক্ত ও প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তারাই কেবল আফগানিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করতে পারে। এসব কারণেই বিপর্যয়ের কোনো শেষ নেই। দুর্দশার কোনো শেষ নেই।

নতুন বিপ্লবীদের অবস্থা

এসব কারণেই সামরিক বিপ্লব কোনো ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। কারণ সামরিক বিপ্লব সামান্য সময়েই সম্পন্ন হয়। মাত্র একটি রাত, একটি

ভাষণ ও একটি ঘোষণার মধ্য দিয়েই সামরিক বিপ্লব তার পূর্ণতায় পৌছে যায়। এরপর আবদুন নাসের বা মুয়াম্মার গাদ্দাফি বা হাফিজ আল-আসাদ বা সাদ্দাম হোসাইন এদের মতো কেউ একজন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এবং গোটা জাতির দায়িত্ব নিয়ে নেয়। তারপর যা ঘটে তা তো সবার চোখের সামনে...

সিরিয়ার দুর্দশা

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তখন হাফিজ আল-আসাদও সেখানে আসতেন। তিনি দুষ্ট প্রকৃতির যুবক ছিলেন। অসচ্চরিত্র ছিলেন। একটি সঙ্কীর্ণ টাইট প্যান্ট পরে আসতেন। আমরা তখন দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম। তিনি প্যান্টের ওপর পরতেন একটা খাটো শার্ট। তাঁর কোমরের কিছুটা অংশ বেরিয়ে থাকতো। সঙ্কীর্ণ প্যান্টের ওপর খাটো শার্ট পরা আরবের সংস্কৃতিতে চরম দোষণীয় ছিলো। আমাদের সময়ে এটা ছিলো বদমাশদের পোশাক। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পেছনে তিনি শিষ দিয়ে বেড়াতেন। এটা ১৯৬২ সালের ঘটনা। ওহ, মেয়েদের পেছনে শিষ দিয়ে বেড়াতেন! এর এক বছর পর ১৯৬৩ সালে বিপ্লব সংঘটিত হয়। এর কিছুদিন পর হাফিজ আল-আসাদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী হন। তার কিছুদিন পর হন প্রেসিডেন্ট। ওয়াক্‌ফমন্ত্রী, মাননীয় প্রেসিডেন্ট ছিলেন মহান বুযুর্গ ব্যক্তি। হ্যাঁ... মহান বুযুর্গ ব্যক্তি!

তাঁর সঙ্গে যখন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের যুদ্ধ শুরু হয়, তিনি যেকোনো একজন ইসলামি ব্যক্তিকে খুঁজতে থাকেন যাঁর মাধ্যমে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে সন্ধি করতে পারেন। তিনি প্রথমে গোয়েন্দাপ্রধানকে অনুরোধ করেন, যেনো তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে তাঁর সন্ধি করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু গোয়েন্দাপ্রধান অস্বীকৃতি জানান। এরপর তিনি রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামির প্রধান তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে সন্ধির বিষয়টি চূড়ান্ত করতে চান। কিন্তু সেটিও ব্যর্থ হয়। অবশেষে তিনি কিছু সাধারণ প্রতিনিধি জোগাড় করেন যাঁরা সিরিয়ার ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে চিনতেন। তাঁরা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি হন। হাফিজ আল-আসাদ এই প্রতিনিধিদলকে বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি মুসলমান। এই ইখওয়ানরা কেনো আমার সঙ্গে লড়াই করে? আমি মুসলমান, জুমআর নামায পড়ি। ঈদের নামায পড়ি। এমনকি মিলাদুন্ নবীর নামাযও আমি পড়ি।' তিনি ভেবেছিলেন মিলাদুন্ নবীরও আলাদা নামায আছে!

মিসরের দুর্দশা

জামাল আবদুন নাসের[৪৬] ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে ছিলেন। তিনি সামরিক বাহিনীতে কাজ করতেন। তাঁরা ১৯ শে জুলাই ১৯৫২ সালে অভ্যুত্থান ঘটাতে চান। তাঁদের আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন হাসান আল-হাদিবি। তিনি তখন আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিলেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সভ্যরা সমবেত হয়ে বলেন আমরা আজ রাতে অভ্যুত্থান ঘটাতে চাই। তাদের একদল বলেন, না। আমাদের মুরশিদ আলেকজান্দ্রিয়ায় আছেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা অভ্যুত্থান ঘটাতে পারি না। এটা সম্ভব নয়। তাঁর একজন সভ্যকে নির্বাচিত করে অনুমতি গ্রহণের জন্যে আলেকজান্দ্রিয়ায় শায়খ হাসান আল-হাদিবির কাছে পাঠান। শায়খ বলেন, তাদের সবার থেকে

---

[৪৬] জামাল আবদুন নাসের ১৫ই জানুয়ারি ১৯১৮ সালে আলেকজান্দ্রিয়ার আসইয়োত জেলার বনি মুর (বাকোস) এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। আবদুন নাসের ও ফাহিমা দম্পত্তির প্রথম সন্তান তিনি। জামাল আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোতে পড়াশোনা করেন। তিনি স্কুল ও কলেজে ভালো ছাত্র ছিলেন না। উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে মাত্র ৪৫ দিন উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ইজিপ্সিয়ান সোশ্যালিস্ট পার্টির মাধ্যমে রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে রয়্যাল মিলিটারি একাডেমিতে ভর্তির আবেদন করে ব্যর্থ হওয়ার পর আইন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু আইন কলেজে অকৃতকার্য হওয়ার পর পুলিশ একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। সেক্রেটারি অব স্টেট ইবরাহিম খাইরি পাশার সহায়তায় সামরিক কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৩৮ সালে সেকেন্ড লেফট্যানেন্ট্ পদে কমিশন লাভ করেন। সামরিক কলেজে আনোয়ার সাদাত ও আবদুল হাকিম আমের তাঁর সতীর্থ ছিলেন। ১৯৪৩ সালে কায়রোর রয়্যাল মিলিটারি একাডেমিতে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ২৩ শে জুলাই জেনারেল মুহাম্মদ নাজিবের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাজা প্রথম ফারুককে উৎখাত করেন। ১৯৫৩ সালে ১৮ই জুন মুহাম্মদ নাজিব প্রেসিডেন্ট এবং জামাল ডেপুটি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জামাল ১৮ই জুন ১৯৫৩ থেকে ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ এবং ৪ঠা মার্চ ১৯৫৪ থেকে ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৪ পর্যন্ত ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৫৪ সালের ১৪ই নভেম্বর তিনি রেভুল্যশনারি কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২৩ শে জুন ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৭০ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকেন। একই সঙ্গে তিনি ১৯৫৪ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ই মার্চ ১৯৫৪, ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৪ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২, ১৯ শে জুন ১৯৬৭ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ৫ই অক্টোবর ১৯৬৪ থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ পর্যন্ত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)-এর মহাসচিব ছিলেন। 'প্রথম ফিলিস্তিন যুদ্ধের স্মৃতি', 'মিসরের স্বাধীনতা : বিপ্লবের দর্শন', 'মুক্তির পথে' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

জামাল আবদুন নাসের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে ইসলামি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের কাছে অপ্রিয় ছিলেন। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের হাজার হাজার কর্মীকে কারারুদ্ধ করেছিলেন, তাদের ভয়াবহ নির্যাতন করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি সাইয়্যিদ কুতুবকে ফাঁসিতে ঝুঁলিয়ে হত্যা করেন।

প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। সবাই কুরআন শরিফের ওপর হাত রেখে তারা শপথ করবে।

আবদুন নাসের ২৩ শে জুলাই কামাল উদ্দিন হোসাইনকে সঙ্গে নিয়ে শায়খ হাসান আল-হাদিবির সহকারী মুনির আদ-দিল্লাহর বাড়িতে আসেন। তাঁরা তাঁর বাগানে বসে সালাগ শাদি ও আবদুল কাদের হিলমির উপস্থিতিতে প্রতিজ্ঞা করেন। তাঁরা শপথ করে বলেন, 'আমি যদি সফলভাবে অভ্যুত্থান ঘটাতে পারি তাহলে আল্লাহর কুরআন ও রাসুলের সুন্নাহ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করবো।'

অভ্যুত্থান ঘটে। তারা মুহাম্মদ নাজিবকে নিয়ে আসে। তিনি যেমন ছিলেন তেমনই। এদিকে আবদুন নাসের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে থেকে কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার শপথ গ্রহণের পাশাপাশি একই সময়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। একই সময়ে তিনি মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেন। তখন মিসরের নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছিলো। যারাই ক্ষমতার ধারে কাছে গিয়েছে তারাই আমেরিকার শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। আবদুন নাসের রাতের বেলা একই সঙ্গে আল্লাহর নামে শপথ করেন এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তিনি তাদের সঙ্গে তিনটি শর্তসম্বলিত একটি চুক্তিনামা গ্রহণ করেন। মার্কিন প্রতিনিধিদল বলে, তিনটি শর্তে আমরা তোমাদের সহায়তা দেবো এবং তোমাদের জন্যে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবো। শর্ত তিনটি হলো:

১. ইসলামি আন্দোলকে নিঃশেষ করে দিতে হবে;
২. ইসরাইলের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে;
৩. আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়কে তার মূল ভিত্তি থেরে ধসিয়ে দিতে হবে। এরপর যা করার তা আমরাই করবো।

এই তিনটি শর্তকে সামনে রেখে আবদুন নাসেরের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদলের চুক্তি হয়। ওদিকে আবার তিনি মুনির আদ-দিল্লাহর বাড়িতে কুরআন শরিফের ওপর হাত রেখে শপথ করেন। তারপর রাতের বেলা অভ্যুত্থান ঘটে। আনোয়ার সাদাত ['ধর্মহীন রাজনীতি ও রাজনীতিহীন ধর্ম' মতবাদের প্রচারক] তাঁর বইয়ে লেখেন যে, আবদুন নাসের তাঁকে ফোন করে বলেন: 'আমি জামাল। মার্কিন রাষ্ট্রদূত আমাদের সঙ্গে হোটেল ইন্টার কন্টিন্যান্টালে চা পান করতে চান।' এটা ছিলো অভ্যুত্থানপরবর্তী সময়ে অভ্যুত্থানকারীদের প্রথম বৈঠক। সেখানে মাত্র দুজন বেসামরিক নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং ইহসান আবদুল কুদ্দুস। ইহসান আবদুল কুদ্দুস কেনো? কারণ তিনি চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

সামরিক বিপ্লব বা অভ্যুত্থান কখনো ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এই সমস্ত লোক চারজন পাঁচজন মিলে একটি রাষ্ট্র কিনে ফেলেন বিনিময়ে

তাদের কিছুই পরিশোধ করতে হয় না। কোনো মূল্য দিতে হয় না। একজন সামরিক অফিসার রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যান। তাঁর সামরিক অফিসার হওয়া আর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কী? কোনো পার্থক্য নেই; প্রথমে আমি যা বলেছি তাই।

ঘটনা অনেক। কাহিনি অনেক লম্বা। ইসলামি বিশ্বে যেসব সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সেগুলো কেনো ঘটেছে? ১৯৪৮ সালে আরব বিশ্বের পরাজয়ের পর মানুষ বলাবলি করতে শুরু করলো, বিশ্বাষঘাতকতার কারণ হলো ইসলামি বিশ্বের রাজতন্ত্র। এখন আমরা কীভাবে কী করতে পারি? জাতিসত্তার শেকড় থেকে জাতিয়তাবাদী নেতৃত্ব বেরিয়ে আসার কোনো বিকল্প নেই। তারাই এই জাতির দুঃখ-দুর্দশা বহন করতে সক্ষম হবে। জাতি সত্যিকার অর্থে পুনর্গঠিত হবে। এরপর বুটওয়ালারা ক্ষমতায় চলে আসে। বুট চেনেন তো? সামরিক বাহিনীতে ব্যবহৃত ভারী জুতোই হলো বুট। তারা রাষ্ট্র তাদের কব্জায় নিয়ে নেয়। বুটওয়ালাদের মাথা তাদের বুটের চেয়েও ভারী ও মোটা।

এরা সবাই পাঠশালা পেরোনো লোক। পাঠশালায় ফেল করা লোকও আছে এদের মধ্যে। এরা গোটা জাতির দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে অথচ এদের কেউই বিশ্ববিদ্যালয় পাস করে নি। আবদুন নাসের দুই বছর আইন কলেজে ছিলেন। কিন্তু প্রথম বছরেই ফেল করেন। এগুলোই বাস্তবতা। তাঁর অভিভাবকরা বলেন, বাবা, মনে হয় তোমার কপালে ব্যর্থতা লেপ্টে আছে। আইন কলেজ তোমার দ্বারা হবে না। এসো তোমাকে সামরিক কলেজে ভর্তি করিয়ে দিই। এই হলেন আবদুন নাসের। মাশাআল্লাহ, তিনি ছিলেন ১.৮৫ মিটার লম্বা। তাঁর ছিলো গাধার শরীর ও চড়ুইয়ের স্বপ্ন। তিনি সামরিক কলেছে ভর্তি হন। যারা তাঁকে তত্ত্বাবধান করার কথা তারাই তাঁকে তত্ত্বাবধান করে এবং তিনি যেখানে পৌছার সেখানেই পৌছেন। আবদুন নাসেরের মতো হাফিজ আল-আসাদও ছিলেন ১.৮৫ মিটার লম্বা।

লিবিয়ার দুর্দশা

মুয়াম্মার গাদ্দাফি কেমন ছিলেন? কে ছিলেন তিনি? গাদ্দাফি ছিলেন তিন-তারকা প্রেসিডেন্ট।[৪৭] তিনি সেনাবাহিনীর তিন-তারকা অফিসার [ক্যাপ্টেন]

---

[৪৭] মুয়াম্মার গাদ্দাফি বেনগাজি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করলেও মাঝপথে তা বাদ দিয়ে ১৯৬১ সালে লিবীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৬৫-৬৬ সালে তিনি স্নাতক সমাপ্ত করেন। সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভের পর সামরিক বিদ্যায় আরো উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্যে মনোনীত হন গাদ্দাফি। লিবীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ইংল্যান্ডের স্যান্ডহার্স্ট রয়াল মিলিটারি একাডেমিতে প্রেরিত হন। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা বেশির ভাগই ছিলেন রেভ্যুল্যুশনারি কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য। আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী মুয়াম্মার গাদ্দাফি ১৯৬৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মাত্র সাতাশ

ছিলেন। অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। শুধু অভ্যুত্থান সফল হওয়ার ফলে নিজেকে কর্নেল পদে উন্নীত করেন। তিনি মনে করেছিলেন, একজন কর্নেল রাষ্ট্রপতি থেকেও বেশি কিছু। ছিলেন ক্যাপ্টেন; কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর নিজেকে বানান কর্নেল।

মুয়াম্মার গাদ্দাফির অভ্যুত্থানের প্রথম খবর ও বর্ণনা হায়ুলাস মার্কিন ঘাঁটি থেকে প্রচার করা হয়। হায়ুলাস মার্কিন ঘাঁটিতে যে-রেডিও স্টেশন ছিলো সেখান থেকে প্রচারিত হয়। ইহুদি ও আমেরিকানরা গাদ্দাফির কাছে আসে এবং তাঁকে পরামর্শ দেয় : আপনি ইসলামের প্রতি আহ্বানের মধ্য দিয়ে শুরু করুন। গাদ্দাফি গোটা ইসলামি বিশ্ব থেকে উলামা-মাশায়েখদের সমবেত করেন। তাঁদের সঙ্গে অর্থনীতি বিষয়ে তর্কবিতর্ক শুরু করেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, সমাজ ও সমাজব্যবস্থা, সুদ—সব বিষয়ে তর্কবিতর্ক শুরু করেন। আবু যাহরাও সেখানে এসেছিলেন। অবশেষে তিনি গাদ্দাফিকে বললেন, বাবা, তুমি আমাদের শেখাবে না-কি আমরা তোমাকে শেখাবো। এই কথা বলে তিনি সমাবেশ ছেড়ে বেরিয়ে যান। কিন্তু গাদ্দাফি তর্ক চালিয়ে যেতে থাকেন। পোশাক কেমন হবে তা নিয়ে আলোচনা করেন। মাশায়েখরা বলেন, পোশাক হবে টাখনু পর্যন্ত। গাদ্দাফি বলেন, না, পোশাক হবে হাঁটু থেকে এক বিঘত নিচ পর্যন্ত। এই কথা বলেই পোশাক বিষয়ে আলোচনা শেষ। এটিকেই ইসলামি পোশাক হিসেবে বিধিবদ্ধ করা হয়। ফলে এই সমাবেশে উপস্থিত মাশায়েখদের নিয়ে ইসলামি বিশ্বজুড়ে হাসাহাসি শুরু হয়। গাদ্দাফি উলামা-মাশায়েখদের বলেন, আমরা ইসলামি বিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাই।

বছর বয়সে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে লিবিয়ার তৎকালীন রাজা ইদরিসকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। এ-সময় তিনি ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার অফিসার ছিলেন। ক্ষমতা দখলের পর গাদ্দাফি রাজতন্ত্র থেকে লিবিয়াকে আরব রিপাবলিক রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। ১৯৭৭ সালে দেশের নাম বদলে রাখেন 'গ্রেট সোশ্যালিস্ট পপুলার লিবিয়ান জামহারিয়্যাহ (State of The Masses), অর্থাৎ জনগণের রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের আগে এবং পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন : ব্রাদার লিডার এ্যান্ড দ্য গাইড অব রেভুল্যুশন অব লিবিয়া (২রা মার্চ, ১৯৭৯-২০১১); সেক্রেটারি জেনারেল অব দ্য জেনারেল পিপলস কংগ্রেস অব লিবিয়া (২রা মার্চ, ১৯৭৭-২রা মার্চ, ১৯৭৯); প্রধানমন্ত্রী (১৬ই জানুয়ারি, ১৯৭০-১৬ই জুলাই ১৯৭২); চেয়ারম্যান অব দ্য রেভুল্যুশনারি কমান্ড কাউন্সিল অব লিবিয়া (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯-২রা মার্চ ১৯৭৯); চেয়ারপার্সন অব দ্য আফ্রিকান ইউনিয়ন (২রা ফেব্রুয়ারি, ২০০৯- ৩১ জানুয়ারি ২০১০)। গাদ্দাফির রচিত একটি গ্রন্থ : কিতাবুল আখদার বা গ্রিনবুক।

আবু মুনাইয়ার আল-মুয়াম্মার আল-গাদ্দাফি ১৯৪২ সালের ৭ই জুন লিবিয়ার সিরত শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১১ সালের ২০শে অক্টোবর নিজ জন্মশহর সিরতেই বিদ্রোহীদের হাতে তাঁর নির্মম মৃত্যু ঘটে।

জামাল আবদুন নাসেরও এমন ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝেই আলেম উলামাদের সমবেত করতেন এবং তাঁদের বলতেন, আমাদের জন্যে একটি ইসলামি সংবিধান রচনা করে দিন। আমরা ইসলামি সংবিধান অনুসারে দেশ শাসন করতে চাই। নির্বোধেরা ভেবেছিলো, ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা মানে ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান লিপিবদ্ধ করা।

সুতরাং অর্থমূল্য ও চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত নেতৃত্বের মূলোৎপাটন করতে হবে। দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নতুন নেতৃত্ব বের করে নিয়ে আসতে হবে। তা না হলে ইসলামি দেশগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। বিপর্যয় ও দুর্দশা বাড়তেই থাকবে। এই জাতির সমস্যাবলি গভীর থেকে গভীরই হতে থাকবে।

আমাদের এখন কী অবস্থা? সামরিক অভ্যুত্থানের পর যারা ক্ষমতায় *এসেছিলো তারা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে চেয়েছিলো। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা* চেয়েছিলো। যেসব ক্ষমতাবানেরা জাতির রক্ত চুষে *নিচ্ছিলো তাদের থাবা* থেকে দেশকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলো। রাজা ফারুকের[৪৮] সময় থেকে এখন আমরা কতটুকু দূরে? জামাল আবদুন নাসের ১৯৫২ সালে যখন ক্ষমতায় আসেন তখন মিসরীয় এক পাউন্ড দশ দিরহামের সমমূল্য ছিলো। এখন মিসরীয় পাউন্ডের কী মূল্য? এখন তার এই পাউন্ড দুই দিরহামের চেয়েও কম মূল্যের। এক পাউন্ড ছিলো সাড়ে তিন ডলার সমমূল্যে আর এখন এক ডলারে পাওয়া যায় দুই পাউন্ড। মিসরীয়রা যেমন বলে থাকেন : আবদুন নাসের ক্ষমতায় এসেছেন এবং তারা শিমের বিচি কিনতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং এখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। তারা আগে তৃপ্তিসহকারে খেতে পারতেন; খাবারের সঙ্গে রুচিকারক হিসেবে কাঁচা মরিচ থাকতো। এখন মিসরীয় জাতির অধিকাংশ সদস্যই তৃপ্তিসহকারে খেতে পারেন না; খাবারের সঙ্গে কাঁচা মরিচ থাকে না। তাই এখন মিসরীয়রা কৌতুক রসিকতা শুরু করেছেন। সূক্ষ্ম রসিকতার মধ্য দিয়ে তাঁরা তাঁদের গভীর বেদনাবোধ

---

[৪৮] ইনি মিসরের সর্বশেষ রাজা প্রথম ফারুক। ১৯৩৬ সালে মাত্র ষোলো বছর বয়সে তাঁর পিতা রাজা প্রথম ফুয়াদের স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৩৭ সালের ২৯ জুলাই ফারুকের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাঁর চাচা আমির মুহাম্মদ আলি ভারপ্রাপ্ত রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফারুক প্রথমে জনপ্রিয় থাকলেও স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়ার পর তাঁর জনপ্রিয়তা কমতে থাকে এবং গণবিরোধিতা দেখা দেয়। ১৯৫২ সালে জেনারেল মুহাম্মদ নাজিবের নেতৃত্বে সেনা-অভ্যুত্থানের ফলে রাজা ফারুকের পতন ঘটে এবং এ-বছরের ১৬ই জুলাই তিনি ইউরোপে নির্বাসিত হন। ফারুক ১৯২০ সালে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৫ সালে রোমে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে মিসরের ভূমিতে দাফন করার দাবি জানানো হলে সরকার তা মেনে নেয়। ফারুকের প্রথম স্ত্রী সাফিনাজ যুল ফাকার এবং দ্বিতীয় স্ত্রী নারিমান সাদেক। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে একমাত্র সন্তান আহমদ ফুয়াদ।

থেকে দূরে সরে থাকতে চান। একজন কিছু রুচিবর্ধক বস্তু কিনলেন—ওখানে সবকিছুই তাঁরা পত্রিকার কাগজে মুড়িয়ে থাকেন। আস-সাকাফাতুল ইশতিরাকিয়্যা [সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি] ও আল-আহরাম ১৮ পৃষ্ঠার পত্রিকা। ২১-২২ পৃষ্ঠার সংবাদপত্রও আছে। এক পিয়াস্টার [মধ্যপ্রাচ্যে প্রচলিত মুদ্রার একক] বা দেড় পিয়াস্টার মূল্য।—একজন কিছু পরিমাণ মরিচ কিনলেন এবং সেগুলোকে পত্রিকার কাগজের ঠোঙায় রেখে বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাগজ ফুটো হওয়ার কারণে মরিচ পড়ে গেলো। বাড়িতে এসে কাগজের পোঁটলা খুলে দেখলেন একটি মরিচও নেই। তিনি তাকানো মাত্রই সেই ছেঁড়া কাগজটিতে আবদুন নাসেরের ছবি দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছবিটিকে পায়ের নিচে রাখলেন এবং বলে উঠলেন, এ তো দেখি আমারও পিছু নিয়েছে!

হ্যাঁ... আনোয়ার সাদাত বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র আমাদেরকে শূন্যতায় পৌছে দিয়েছে। হ্যাঁ... শূন্যতায় পৌছে দিয়েছে। মিসর ছিলো বিশ্বের জন্যে ঋণ প্রদানকারী একটি দেশ। জাযিরাতুল আরব মিসরের দান-অনুদানের ওপর বেঁচে থাকতো। আর এখন মিসর পঞ্চান্ন হাজার মিলিয়ন ডলারের ঋণী। এই ঋণের সুদ প্রতিবছরই বাড়ছে। বার্ষিক সুদের হার যদি শতকরা ১০ ডলার হয় তাহলে বার্ষিক সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় কমপক্ষে ৫.৫ বিলিয়ন ডলার। এর মানে হলো প্রতিবছর শুধু সুদই পরিশোধ করতে হয় ৫৫০০ মিলিয়ন ডলার। মিসর এই পরিমাণ সুদ পরিশোধ করতে পারে না। তার কোষাগারে যা আছে তার সব সে শেষ করছে, তারপরও বছর বছর তার ঋণ বেড়েই চলছে। প্রতি বছর ৫৫ বিলিয়ন ডলার। আগামী বছর ঋণের পরিমাণ আরো ২.৫ বিলিয়ন ডলার বাড়বে এবং মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৭.৫ বিলিয়ন ডলার। কারণ তারা সুদ পরিশোধ করতে পারছে না।

১৯৬৩ সালে সিরিয়ায় যে-পরিস্থিতি ছিলো এখন সে তার থেকে কত দূরে দাঁড়িয়ে? ওখানে কি এখন মানুষ আছে? চিন্তাবিদরা ওখানে আছেন? আলেম-উলামা কি আছেন ওখানে? ইসলামের রক্ষণশীল পরিবারগুলো কোথায়? আলেম-উলামার মজলিস ও সমাবেশ কোথায়? কোথায় মসজিদ আর কোথায় মেহরাব? কোথায় সিরীয় নারীরা? সবকিছুই বিধ্বস্ত ও বিচূর্ণ...

أما الخيام فإنها كخيامهم

وأرى نساء الحي غير نسائهم

'শামিয়ানা তো তাদের শামিয়ানার মতোই

এবং আমি এলাকার নারীদের তো ভিন্নতর দেখছি।'

১৯৭৩ সালে আমি সিরিয়ায় যাই। সিরিয়াতে আমি ১৯৬৩ সালে ছিলাম, ১৯৬৪ এবং ১৯৬৬ সালেও ছিলাম। আমি সিরিয়ার ফ্যাকাশে ও বিভৎস চেহারা দেখতে পাই। সে তার অতীত দিনগুলোর জন্যে রোদন করছে।

ইরাকের কী অবস্থা... ইরাককে এখন আমরা নুরি সাঈদ[৪৯]-এর যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আবদুল ইলাহ[৫০]-এর যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলেন। সেই সময় ফিরিয়ে আনতে কী প্রয়োজন? প্রয়োজন ধারাবাহিকভাবে এক যুগেরও বেশি সময় সংশোধন করা যাতে ইরাককে দ্বিতীয় ফয়সালের[৫১] যুগে ফিরিয়ে নেয়া যায়।

কর্নেল গাদ্দাফি... এই উন্মাদ নিজেকে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছিলেন কর্নেল পদে উন্নীত হওয়ার জন্যে। লিবিয়াতে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। উদাহরণ অনেক। অর্থনীতির কথা বলা যায়। এ-ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক-ঋণের বোঝা দাঁড়িয়েছিলো অপরিসীম। গাদ্দাফি যা-কিছু বুঝাতে চাইতেন, জুমআর খুতবার মাধ্যমে বুঝাতেন। মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি জাতির উদ্দেশে তার বক্তব্য পেশ করতেন। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এভাবেই বক্তব্য পেশ করতেন! মিম্বারই হলো মনোযোগ আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। গাদ্দাফি মিম্বারে দাঁড়িয়ে সুদ ও ব্যবসার নীতিমালা ব্যাখ্যা করলেন। মিম্বারে দাঁড়িয়েই তিনি আল্লাহর নামে তালাকের কসম খেয়ে ঘোষণা করলেন : সুদ হালাল এবং ব্যবসা হারাম। এই ঘোষণা দিয়ে মিম্বার থেকে নেমে পড়লেন। মুফতি সাহেব এ-ব্যাপারে জানলেন এবং তাঁর সাপ্তাহিক আলোচনায় সিদ্ধান্ত জানালেন। তিনি বললেন, কর্নেল সুদকে হালাল বলে কুফরি করেছেন। সুদকে হালাল ঘোষণা করা কুফরি এবং এ-কারণে তিনি মুসলিম উম্মাহ থেকে বেরিয়ে গেছেন। কর্নেলের উচিত তওবা করা।

---

[৪৯] পুরো নাম নুরি পাশা আস-সাঈদ। ১৮৮৮ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু ১৫ই জুলাই, ১৯৫৮ সালে। ২৩ শে মার্চ, ১৯৩০ থেকে ১৮ই মে, ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত মোট সাতবার ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

[৫০] পুরো নাম ক্রাউন প্রিন্স আবদুল ইলাহ হেজায। পিতা হলেন বাদশা আলি বিন হুসাইন। ১৯১৩ সালের ১৪ই নভেম্বও সৌদি আরবের তায়েফে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালের ১৪ই জুলাই বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইরাকি সাম্রাজ্যের বাদশা গাজির চাচাতো ভাই এবং শ্যালক ছিলেন। আবদুল ইলাহ বাদশা দ্বিতীয় ফয়সালের অপ্রাপ্তবয়স্কতার কারণে রাজপ্রতিভূ হিসেবে ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩৯ থেকে ২৩ শে মে, ১৯৫৩ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি ক্রাউন প্রিন্স উপাধিও লাভ করেন।

[৫১] পুরো নাম ফয়সাল বিন গাজি বিন ফয়সাল বিন হুসাইন বিন আলি। তাঁর মায়ের নাম রানি আলিয়া। তাঁর দাদা বাদশা প্রথম ফয়সাল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ২রা মে ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ই জুলাই, ১৯৫৮ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় ফয়সালের বয়স যখন মাত্র তিন বছর তখন তাঁর বাবা ইরাকের দ্বিতীয় বাদশা গাজি গাড়ি-দুর্ঘটনায় নিহত হন। ১৪ই এপ্রিল ১৯৩৯ সালে তিনি রাজা হলেও দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২রা জুন, ১৯৫৩ সালে। এর আগে তাঁর মামা আবদুল ইলাহ দায়িত্ব পালন করেন।

এখন আর কেউ জানে না ওই মুফতি সাহেব কোথায় আছেন।
গাদ্দাফি কী করেছিলেন? তিনি ব্যবসা নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং সুদ বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় মন্দাবস্থা শুরু হয়। তাঁরা তাঁদের কাছে সঞ্চিত সম্পদ ব্যয় করে বহুদিন পর্যন্ত জীবন ধারণ করেন। গাদ্দাফি ঘোষণা করেন, এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের প্রচলিত মুদ্রা পরিবর্তিত হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে যারা তাদের মুদ্রা পরিবর্তন করে নেবে না তাদের মুদ্রার মূল্য থাকবে না। এই ঘোষণা শুনে ব্যবসায়ীরা স্নায়বিক বৈকল্যে আক্রান্ত হন। তাঁরা ব্যাঙ্কগুলোর সামনে রাস্তায় রাত্রি যাপন করতে থাকেন। যাতে তাঁরা তাঁদের মুদ্রা পরিবর্তন করার সময় পান। যিনি ব্যাঙ্কে কয়েক মিলিয়ন [মুদ্রা/দিনার] জমা রাখেন ব্যাঙ্ক তাঁকে এই মর্মে একটি কাগজ ধরিয়ে দেয় যে আমাদের কাছে তোমার কয়েক মিলিয়ন [মুদ্রা/দিনার] জমা আছে। এরপর ব্যাঙ্ক তাঁকে প্রতি মাসে ২০০ লিবীয় দিনার করে দিতে থাকে। যাঁর ছেলে লন্ডনে পড়াশোনা করছে তিনি তাঁর ছেলের জন্যে ব্যয় করতে পারেন না। কিছুতেই পারেন না। কারণ মুদ্রা পরিবর্তন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মানুষের অবস্থা শোচনীয় হতে থাকে।
তারপর একদিন ঘোষণা করা হয় : বসবাসের ঘরটিই কেবল তার মালিকের জন্যে থাকবে। তাদের সব জমি সরকার অধিগ্রহণ করবে। ব্যস... আপনার ১০০ টুকরো জমি আছে, তার সব সরকার নিয়ে গেলো। আপনার জমি আছে ১০০০ টুকরো, সব নিয়ে গেলো সরকার। জমি আছে মাত্র ৫০ টুকরো—এক টুকরো কেবল আপনার বাকিটা অধিগ্রহণ করলো সরকার। এভাবেই চলতে থাকলো। যাঁর কয়েকটি ছেলেমেয়ে আছে তিনি আবেদন করলেন : আমার তো কয়েকটি বড়ো বড়ো ছেলেমেয়ে, আমার আরো জমি দরকার। না, জমি দেয়া হবে না। ব্যক্তির হাতে জমি রাখা নিষিদ্ধ। তোমার ছেলে কি বিয়ে করেছে? সে বিয়ে করলে আমরা তাকে এক টুকরো জমি দেবো। সরকার এভাবে সবাইকে পিষে ফেলে। মানুষ রুটি কেনার মত সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলে। কীভাবে তারা রুটি কিনবে? ডিম পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক জোটের কাছে গচ্ছিত। পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিচালিত ডিপার্টমেন্ট স্টোর এবং মুদি দোকানও রাষ্ট্রীয় মালিকানায়। কারো কাছে মেহমান এলো, যেমন আমাদের কাছে একদিন কয়েকজন মেহমান এসেছিলেন। কারো কাছে চারজন মেহমান এলো। তিনি চারজন মেহমানের জন্যে আটটি ডিম কিনতে চান, তাহলে তাঁর চার ছেলেকে চারটি মুদি দোকানে পাঠাতে হবে। কারণ একজন ক্রেতার জন্যে দুটি বা তিনটির বেশি ডিম ক্রয় করা নিষিদ্ধ। তারা একজনের কাছে দুটি-তিনটির বেশি ডিম বিক্রি করে না। আবার দুটি ডিম কেনার জন্যে একটি মুদি দোকানের সামনে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

চরিত্র... শিষ্টাচার... বিশ্ববিদ্যালয়... শিক্ষা... সব ওখানে শেষ হয়েছে। আবদুস সালাম একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে যান। সেখানে কয়েকটি বুলেট ছোঁড়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জাগরণ শুরু হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। ফেল-করা ছাত্রদের অনেকেই ওখানে কর্তৃপক্ষের ক্রীতদাস হয়ে জীবন কাটায়। এরা তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে। এরা আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাখাল; মারামারি ও আক্রমণেও দক্ষ। ডিন ও শিক্ষকদের ওপর এরা আক্রমণ করে। ডিন ও শিক্ষকরা নন; বরং বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে চোটপাট-হম্বিতম্বি করে। দেখা যায় আক্রমণ ও মারামারি শুরু হওয়ার পর নিহত ও আহত মিলিয়ে তিরিশেরও বেশি মানুষ পড়ে যায়। কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। এই হলো সাংস্কৃতিক জাগরণ। তারপর কী হয়? বিশ্ববিদ্যালয় কাদের অনুশাসনে পরিচালিত হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অনুষদে তিন-চতুর্থাংশ ছাত্র হতে হবে সমাজতান্ত্রিক জোটের; প্রতিটি অনুষদের তিন-চতুর্থাংশ আসন অবশ্যই বরাদ্দ থাকবে সমাজতান্ত্রিক জোটের সদস্যদের জন্যে। কর্মচারীদের মধ্যেও থাকতে হবে তাদের সদস্য।

অনুষদের রাজনীতি কেমন হবে সে-বিষয়ে ঘোষণা দিতে কোনো নেতা এসে অনুষদের বৈঠকে উপস্থিত হন। তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরিতে ব্যস্ত থাকা ফেল-করা ছাত্রটিও উপস্থিত থাকে। কারণ সেও অনুষদের সভার একজন সদস্য। এসব বৈঠকে এসে তারা তাদের মতামত ও সিদ্ধান্ত জানিয়ে যায়। তারা ঘোষণা করে, আমরা জুলাই মাসে পরীক্ষা গ্রহণ করতে চাই। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা তো সারা বছর কিছুই পড়ে নি। গোটা জীবন এরা ফেল-করা ছাত্র। তাদের কেউ হাত তুলে বলে, আমার সমস্যা আছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, সমস্যার কথা বলার জন্যে তারা পুরো হাতই ওঠায়, শুধু আঙ্গুল ওঠায় না। ঘাড় ঝুঁকিয়ে বলে, আমার সমস্যা আছে। আমি পরীক্ষা দিতে পারবো না। এরা আসলে ফেল-করা ছাত্র। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে শিক্ষা-রাজনীতি করে বেড়ায়। পড়াশোনার খোঁজ-খবর এরা রাখে না। এ-কারণেই এখন পশ্চিমা বিশ্ব ইরাক ও লিবিয়ার শিক্ষা-সনদের কোনো মূল্যায়ন করে না। কেনো করবে? এ-দুটি দেশে ছাত্ররা এমনকি বার্ষিক পরীক্ষা থেকেও ছাড় পায়। চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও তাদের অংশগ্রহণ করতে হয় না। ঘোষণা আসে, এই বছর কোনো পরীক্ষা হবে না। সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে পাশ করিয়ে দিতে হবে। এক বছর কেটে গেছে; কিন্তু ছাত্ররা পরাশোনা করে নি; তারা সমাজতান্ত্রিক জোট নিয়ে। তাদের জন্যে এটাই যথেষ্ট যে তারা প্রত্যেকে সমাজতান্ত্রিক জোটের সদস্য।

তারা চরিত্র, শিষ্টাচার সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা সমাজতান্ত্রিক সৈনিকশিবির স্থাপন করেছে। তরুণ প্রজন্মের জন্যে স্থাপিত এসব

সৈনিকশিবিরে অংশগ্রহণ না করে কোনো মেয়ের জন্যে মাধ্যমিক তৃতীয় স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক প্রথম স্তরে উন্নীত হওয়া নিষিদ্ধ। তরুণ প্রজন্মের সৈনিকশিবির হলো মূলত সহসৈনিকশিবির; কর্তৃপক্ষ তরুণ-তরুণীদেরকে এসব শিবিরে নিয়ে আসে এবং প্রশিক্ষণ দেয়। তারা একসঙ্গে এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ শিবিরে অবস্থান করে। কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণকারী মেয়েটিকে একটি সনদ প্রদান করে যে সে সমাজতান্ত্রিক সৈনিকশিবিরে অবস্থান করেছিলো। সুতরাং সে মাধ্যমিক তৃতীয় স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক প্রথম স্তরে উন্নীত হতে পারে।

উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর শুরু হয় আরো ভয়াবহ যন্ত্রণা। আগের চেয়েও বড়ো সামরিক শিবিরে ছেলেমেয়ের একসঙ্গে থাকতে হয় এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। এ-কারণে অধিকাংশ অভিভাবক তাঁদের মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়ে আসেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়ে আসলে কী হবে, সমাজতান্ত্রিক সামরিক শিবিরে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে, হবেই। তারা ঘোষণা দেয়, কোনো আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির মেয়ে সমাজতান্ত্রিক সামরিক শিবির থেকে সনদগ্রহণ না করলে তিনি তাঁর জন্যে কিছুতেই বিয়ের আক্‌দ করতে পারবেন না। মেয়ে বিয়ের ব্যবস্থাও করতে পারবেন না। হ্যাঁ, এসব নিকৃষ্ট ইতরেরা বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, রাষ্ট্রে প্রবেশ করে, দেশের সর্বত্র তাদের আনাগোনা এবং কর্মকাণ্ডের প্রচারপ্রসার। নারীরা হলেন এ-সমাজের অর্ধেক। তাঁরা ইসলামি অনুশাসন মেনে চলতে চান। ইসলামি রীতিনীতি অনুসারে জীবনযাপন করতে চান। মানুষের কাছে ইসলামি দাওয়াত পৌছে দিতে চান। উম্মে আতিয়্যা, উম্মে সালামা তাঁদের মতোই নারী। কিন্তু ইতরেরা সমাবেশের পর সমাবেশে নারীদের একত্র করে এবং ভাষণের পর ভাষণ দিতে থাকে। তারা বলে, আপনাদের মধ্যে কে কে দেশের সেবায় অংশগ্রহণ করতে চান? কারণ, আপনারা তো দেশের অর্ধেক। নারীদের মধ্যে যাঁরা দুর্বল চিত্তের, বিশ্বাসে যাঁদের দৃঢ়তা কম তাঁরা হাত তোলেন। শুরু হয়ে যায় তাড়াহুড়ো... নাম লেখো, নাম লেখো! গাড়ি বিদ্যালয়ের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে। যাঁদের নাম লেখা হয় তাঁরা গাড়িতে চড়ে বসেন। গাড়ি তাঁদের নিয়ে সোজা সেনাছাউনিতে গিয়ে উপস্থিত হয়। তাঁরা বাড়ি ফিরে যেতে পারেন না। তাঁদের পরিবারের লোকেরা বিদ্যালয়ে এসে তাঁদের ব্যাপারে খোঁজখবর করেন। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ বলে, আল্লাহর কসম, তোমাদের নারীদেরকে তো সেনাছাউনিতে নিয়ে গেছে। পরিবারের লোকেরা খোঁজখবর নেয়ার জন্যে সেনাছাউনিতে যান। তাঁরাও আর ফিরে আসতে পারেন না। সেনারা তাঁদের ধরে গারাগারে নিক্ষেপ করে এবং অভিযোগ তোলে, তোমরা হলে বিপ্লবের শত্রু; তোমরা বিশ্বাস করো না যে নারীরাও দেশগঠনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

কী জঘন্য! কী নির্মম! একটি নির্বোধ বালক দেশকে শেষ করে দিচ্ছে, অথচ মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কোথায় মুহাম্মদ বিন মুসলিমা! কোথায় আবদুল্লাহ বিন আতিক? কেউ কি তাকে খুন করতে পারে না! কেউ কি নেই?! প্রত্যেকেই একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে। কী লাভ এভাবে তাকিয়ে থেকে? তাদের কোনো যুবক যদি জিহাদে বের হয়, আপনি শত শত লোককে দেখবেন তাকে বলছে, আরে ব্যাটা, তুমি পাগল না-কি! করো কি...
একবার মুআম্মার গাদ্দাফি জর্ডানে এলেন। তাঁর চারপাশে সব মেয়ে দেহরক্ষী। এসব মেয়েদের নাম দেয়া হয়েছে বিপ্লব-রক্ষিতা। পোশাকপরিহিত, নগ্ন সব ধরনের মেয়ে তাঁর চারপাশে। হায়, চারপাশে সব মেয়ে... একজন পুরুষও নেই!! গাদ্দাফি তাঁর খাবার, এমনকি তরমুজও লিবিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি জর্ডানের কিছুই খান নি। কেনো খান নি? কারণ, তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে তাঁকে বিষ খাওয়ানো হতে পারে! জর্ডানের বাদশা হুসাইন তাঁকে বললেন, 'আপনার উচিত হাফিজ আল-আসাদের সঙ্গে চুক্তি করা। আপনি সময় নিন, চিন্তা করুন।' গাদ্দাফি তাঁকে বললেন, 'যে-কারণেই হোক আপনাকে আমার সঙ্গে হাফিজ আল-আসাদের কাছে যেতে হবে। আমরা সবাই একসঙ্গে চুক্তি করবো।' হুসাইন বললেন, 'ঠিক আছে, হাফিযের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। হাফিজ আল-আসাদ সম্ভবত এটা চাইবেন না।' গাদ্দাফি হাফিজ আল-আসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বললেন, আমি কিছুতেই আসবো না। আমি আপনার সঙ্গে চুক্তি করতে চাই না।' কী পাগলের মতো কথাবার্তা! এই গাদ্দাফি প্রথম দিন তিউনিসিয়ার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন; কিন্তু তার পরের দিনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কায়রোর সঙ্গে প্রথম দিন সংহতি প্রকাশ করলেন, দ্বিতীয় দিন রেডিওতে ঘোষণা দিলেন, 'আনোয়ার সাদাতের স্ত্রী জিহান আমাকে পরকীয়ায় প্ররোচিত করেছেন।' নষ্ট বালক। সম্পূর্ণ নষ্ট বালক। জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। আল্লাহর প্রতি যদি আমাদের অবিশ্বস্ততা না থাকতো তাহলে তিনি আমাদের ওপর এসব উৎপীড়ক স্বৈরাচারীকে চাপিয়ে দিতেন না। প্রবাদ :

وجدير إذا الليوث توارت

أن يلي ساحها جموع الثعالب

'সিংহেরা যখন আত্মগোপন করবে, শেয়ালের দল তাদের আঙ্গিনায় হামলে পড়বে—এটাই তো সঙ্গত।'
এ-ধরনের ঘটনা অনেক... অনেক... অনেক। আমরা যা বলেছি তাই যথেষ্ট। আল্লাহর কসম, তাদের সব দুর্দশার কাহিনি যদি আপনাদের বলতে চাই, তাহলে এমন কিছু বিষয় বেরিয়ে আসবে যেগুলো শুনে সত্যিকার অর্থেই মাথার চুল পেকে যাবে।

আবদুন নাসের সিরিয়ার সঙ্গে চুক্তি করলেন[৫২]। কেনো সিরিয়ার সঙ্গে চুক্তি করলেন? কারণ, আমেরিকা তাঁকে বলেছে, আপনি সিরিয়ার সঙ্গে চুক্তি করুন। কারণ, ইহুদিরা জর্ডান নদী দখল করে নিতে চাইছিলো। গোলান পর্বতমালার পাদদেশ থেকে জর্ডান নদী উৎসারিত হয়েছে। বাথ পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে এবং আবদুন নাসের সিরিয়ার সঙ্গে চুক্তি করার আগে যখনই ইহুদিরা নদীর উৎসস্থলের নিকটবর্তী হতো, সিরিয়ার [সেনাবাহিনীর] সাহসী যুবকেরা কামান দাগিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিতো। যুবকেরা তাদের ওপর ঈগলের মতো ছেয়ে থাকতো। আমেরিকা আবদুন নাসেরকে বলে, ইহুদিরা জর্ডান নদীতে তাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সুতরাং আপনাকে অবশ্যই এসব তরুণ অফিসারদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হবে। দ্বিতীয় কথা হলো, সিরিয়ার সেনাবাহিনীপ্রধান আফিফ আল-বাযারি—আমরা আশঙ্কা করি তিনি অভ্যুত্থান ঘটাবেন এবং দেশ দখল করে তা রাশিয়ার হাতে তুলে দেবেন। সুতরাং কমিউনিস্টদেরও মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিন। সাহসী সেনা-অফিসারদের খতম করে দিন।' [বার্থ পার্টি-গঠিত] সিরিয়ার সরকার আবদুন নাসেরের সঙ্গে একমত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করে। উভয়ে মিলে সেনা-অফিসারদের নির্মূল করে। কমিউনিস্টদেরও তারা নির্মূল করে। কমিউনিস্টদের ওপর এমন ভয়ঙ্কর নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয় যে সিরিয়া এর আগে কখনো তা প্রত্যক্ষ করে নি। একই কায়দায় সেনা-অফিসারদের ওপরও নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয়। অবশেষে তারা বলে, এসব তো আল্লাহর জন্যেই হচ্ছে। কমিউনিস্টরা তাদের কথা শুনে বলে, কোথায় তোমাদের আল্লাহ?

ইহুদিরা জর্ডান নদী দখল করে নেয়। এই নদী নাকাব পর্যন্ত পৌঁছেছে। জর্ডান নদীর দুটি শাখানদী হলো আদ-দান এবং আল-হাসবানি। শাখানদী দুটির পানি দিয়ে তরমুজ উৎপন্ন হতো। এ-দুটি নদীও ইহুদিদের দখলে চলে যায়। কাজশেষে আমেরিকা আবদুন নাসেরকে বলে, আপনি যা করেছেন, যথেষ্ট। আবদুন নাসের আমেরিকার নির্দেশে থেমে যান। সিরিয়াকে তিনি বিদায় জানান। সিরিয়া, তোমাকে বিদায়। বিদায়, আর কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। ব্যস... তিনি সবকিছু ঠিকঠাক সম্পন্ন করেছেন।

মিসরের উপরাষ্ট্রপতি আকরাম আল-হুরানি বলেন, 'আমি একবার একান্ত বৈঠকে আবদুন নাসেরের সঙ্গে মিলিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'আমাদের কাছে দাবি হলো পশ্চিমতীর এবং গাজার কিছু ভূখণ্ড ইসরাইলকে দিয়ে দিতে হবে।' শুনুন, এটা কতো সালের ঘটনা? ১৯৬৯ সালের ঘটনা এটা। আবদুন নাসেরের কথা শুনে আল-হুরানি হতভম্ব হয়ে গেলেন।

---

[৫২] ১৯৫৮ সালে সিরিয়া ও মিসর একত্র হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

বললেন, 'সেকি! এটা কীভাবে হবে?' আবদুন নাসের বললেন, 'শুনুন, আমার মনে হয় আপনার মগজ ঠিক জায়গায় নেই। আপনি আগে মগজ মাথার ঠিকঠাক জায়গায় বসান তারপর আমার কথা শুনুন। আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের কাছে দাবি হলো—আমাদের সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তার জন্যেই—পশ্চিমতীর এবং গাজার কিছু ভূখণ্ড ইসরাইলের হাতে তুলে দিতে হবে।' দাবি! দাবি এরকম! এ-কারণেই আমেরিকা ও রাশিয়া যখনই মধ্যপ্রাচ্যে কিছু করতে চেয়েছে আবদুন নাসেরকে হুমকি-ধমকি দিয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত চৌদ্দজন মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রতিবছর একত্রে মিলিত হতেন। মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন শাসক তাঁদের পাশে আছেন আর কোন কোন শাসককে পরিবর্তন করা জরুরি—এটা তারা আলোচনা করতেন। পঞ্চাশের দশকে আটজন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আবদুন নাসেরের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, আবদুন নাসের আমাদের পাশে আছেন। বাকি ছয়জন ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আবদুন নাসের আমাদের সঙ্গে নেই। ১৯৬৪-'৬৫-এর বছরে মার্কিন রাষ্ট্রদূতেরা আবদুন নাসেরের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং তাঁর পরিবর্তনের ব্যাপারে তাঁরা একমত হন। কারণ, তখন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ মধ্যপ্রাচ্যে ঠিক সফলতা পাচ্ছিলো না। আবদুন নাসের তা টের পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের কল্যাণে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামি আন্দোলনের বিনাশ ঘটাবো।' ঠিক তাই করেন। ইসলামি আন্দোলনের বিনাশ ঘটান যাতে আমেরিকা বুঝতে পারে আবদুন নাসের এখনো তাদের জন্যে নতুন নতুন উপঢৌকন প্রদানে সক্ষম। তিনি মস্কোতে গিয়ে ঘোষণা দেন, 'আমরা একদিনে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সতেরো হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছি। কারণ আমরা ষড়যন্ত্রের অলিগলি চিহ্নিত করতে পেরেছি। কিন্তু আমরা প্রথমবার ক্ষমা করেছি; দ্বিতীয়বার আর ক্ষমা করবো না।' আমি লেনিনের কবরের ওপর বসে থেকে নিজ কানে তাঁর এই ঘোষণা শুনতে পেরেছি—'আমরা ষড়যন্ত্রের অলিগলি চিহ্নিত করতে পেরেছি।' আবদুন নাসেরের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ[৫৩]। ক্রুশ্চেভ তাঁকে বললেন, 'আমরা চাই, আপনি ইখওয়ানুল

[৫৩] পুরো নাম নিকিতা সের্গেইয়েভিচ ক্রুশ্চেভ (ক্রুশ্চেভ লেখা হলেও উচ্চারণ ক্রুশ্‌শোফ)। ১৮৯৪ সালের ১৭ই এপ্রিল রাশিয়ার ডিমিট্রিইয়েভ্স্কি এলাকার কালিনভ্কা গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯১৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ পান। ১৯৩৮ সালে ইউক্রেনের আঞ্চলিক কমিটির ফার্স্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৩ থেকে ১৪ অক্টোবর ১৯৬৪ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট

মুসলিমিনের অন্তত পাঁচ হাজার কর্মী হত্যা করুন।' আমেরিকা তাঁকে বললো, 'আমরা চাই আপনি দুজনকে হত্যা করে তাদের হত্যাকাণ্ড শুরু করুন। সাইয়িদ কুতুব[৫৪] ও যয়নাব আল-গাযালিকে আগে হত্যা করুন।'

সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৫৮ সালে পার্টিপ্রধানের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী হয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। ১৯৬৪ সালে উভয় পদ থেকে অপসারিত হন। ১৯৭১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মস্কোতে তাঁর মৃত্যু হয়।

[৫৪] পুরো নাম সাইয়িদ কুতুব ইবরাহিম হুসাইন আশ-শারিবি। মিসরের আসইয়োত জেলার মুশা গ্রামে ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা উসমান হুসাইন এবং মা ফাতেমা। কুতুব তাঁর বংশীয় অভিধা। গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং কুরআন শরিফ হিফ্য করেন। ১৯২২ সালে কায়রোর মাদরাসাতুল মুআল্লিমিন আল-আওয়ালিয়্যা (আবদুল আযিয)-এ ভর্তি হন। ১৯২৪ সালে এখানে তিন বছরের কোর্স সমাপ্ত করে ১৯২৫ সালে মাদরাসা-ই-তাজহিযিয়্যাতে ভর্তি হন। এখানে চার বছরের শিক্ষা সম্পন্ন করে ১৯২৯ সালের শেষ দিকে দারুল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের পাঠ সম্পন্ন করেন। একই বছরের ডিসেম্বর তাহজিরিয়্যা দাউদিয়্যাতে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আরো তিনটি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এ-বছরের ১লা মার্চ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে মন্ত্রণালয় তাঁকে আমেরিকায় প্রেরণ করে। ১৯৫০ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন। ১৯৫২ সালের ১৮ই অক্টোবর তিনি মন্ত্রণায়লয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। কিন্তু মন্ত্রী তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন নি। ১৯৫৪ সালের ১৩ই জানুয়ারি সাইয়িদ কুতুবের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয় এবং অভিযোগ করা হয় যে তিনি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালে সরকারবিরোধী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

১৯৫০ সাল থেকেই সম্পৃক্ত থাকলেও সাইয়িদ কুতুব ১৯৫৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। ১৯৫৫ সালের ১৩ই জুলাই পিপল্স্ কোর্ট সাইয়িদ কুতুবকে পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। ১৯৬৪ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১৯৬৫ সালের ৯ই আগস্ট তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৬ সালের ২১ শে আগস্ট সাইয়িদ কুতুবসহ সাতজনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। ২৯ আগস্ট ভোর রাতে সাইয়িদ কুতুব ও তাঁর দুই সঙ্গীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

সাইয়িদ কুতুবের কর্মজীবনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড ও ইসলামি কর্মকাণ্ড। দারুল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের একটি তালিকা দেয়া হলো। **কবিতা** : আশ-শাতিউল মাজহুল/অজ্ঞাত তট; কাফেলাতুর রাকিক/অভিযাত্রীদল; হিলমুল ফাজ্‌র/ভোরের স্বপ্ন; দিওয়ানু সাইয়িদ কুতুব/সাইয়িদ কতুবের কাব্য। **সাহিত্যসমালোচনা** : কুতুব ওয়া শাখসিয়্যাত/গ্রন্থ ও ব্যক্তিত্ব; আন-নাকদুল আদাবি উসুলুহু ওয়া মানাহিজুহু/সাহিত্যসমালোচনা : নীতি ও পদ্ধতি। **ইসলামি শিক্ষা ও দর্শন:** আত-তাসবিরুল ফান্নি ফিল কুরআন/ কুরআনের শিল্পশৈলী; মাশাহিদুল কিয়ামাহ ফিল কুরআন/ কুরআনে বর্ণিত কিয়ামত-দৃশ্য; আল-আদালাতুল ইজতিমাইয়্যাতু ফিল ইসলাম/ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার; মারিকাতুল ইসলাম ওয়ার রাসমিয়্যাহ/ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব; আস-সালামুল আলামি ওয়াল ইসলাম/ইসলাম ও বিশ্বশান্তি; আমেরিকা আল্লাতি রাআইতু/যে-আমেরিকা

আবদুন নাসের আমেরিকাকে বললেন, 'যয়নাব আল-গাযালি একজন নারী। আমি তাঁকে যাবজ্জীবন কারাগারে বন্দি করে রাখবো। আর সাইয়্যিদ কুতুবকে হত্যা করবো।' আমেরিকা বলে, 'না, দুজনকেই হত্যা করতে হবে।' আমেরিকার প্রত্যাশা থাকলেও তারা অনুমতি দেয় যে, তিনি যয়নাব আল-গাযালিকে কারাগারে কঠিন শেকলে আবদ্ধ রেখে যাবজ্জীবন বন্দি করে রাখবেন এবং সাইয়িদ কুতুবকে হত্যা করবেন।

যাই হোক। ক্রুশ্চেভ তাঁকে বললেন, 'আপনাকে অবশ্যই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পাঁচ হাজার সদস্য হত্যা করতে হবে।' তিনি বললেন 'পাঁচ হাজার মানুষকে একসঙ্গে হত্যা করলে দেশ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে।' আবদুন নাসের ক্রেমলিনে তাদের মেহমান ছিলেন। এই কথা শুনে ক্রুশ্চেভ তাঁকে ক্রেমলিনের অতিথি-ভবন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে গণভবনে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর খাবারও পরিবর্তন করে দেয়া হলো। কাবাব, ফলমূল এসবের জায়গায় সাধারণ খাবার পরিবেশন করা হলো। আবদুন নাসের তিন-চার দিন গণভবনে বসে থেকে চিন্তা করলেন। ভাবনা-চিন্তা করে ক্রুশ্চেভকে বললেন, 'আমি হত্যা করতে প্রস্তুত।' ক্রুশ্চেভ বললেন, 'এখন তাঁকে ক্রেমলিনের অতিথি-ভবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসো।' হ্যাঁ, এভাবেই দাবি জানানো হয়—এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, ওটা করতে হবে।

ইহুদিবাদী (জায়নিস্ট) শাসকেরা প্রতিবছর ব্রুকলিনে সমবেত হন এবং মধ্যপ্রাচ্যের এসব নেতাদেরও সেখানে উপস্থিত করেন। এটা হলো জীতায় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফ্রীম্যাসন [ইহুদিদের একটি গুপ্তসঙ্ঘ]-এর সভা। এখানে অতি গোপনে তাঁরা বৈঠক করেন এবং পর্দার আড়ালে থেকে কথা বলেন। ফ্রীম্যাসন-এর একটি দপ্তর হলো জেনেভায় এবং আরেকটি দপ্তর হলো আমেরিকায়। মধ্যপ্রাচ্যের নেতাদের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার দাবিদার যাঁরা এবং একই সঙ্গে আমেরিকার বিরোধিতা করেন তাঁদেরকে ইহুদি নেতারা জেনেভায় নিয়ে যান। তারা প্রমাণ পেশ করেন যে ইনি অস্ত্রোপচার করাতে জেনেভায় যেতে চাচ্ছেন। অথবা প্রমাণ পেশ করেন যে ইনি মেরুদণ্ড বা পেটের চিকিৎসা করাতে জেনেভায় যেতে চাচ্ছেন। এভাবে

আমি দেখেছি; হাযাদ্ দীন/এই ধর্ম; মুস্তাক্বালু হাযাদ্ দীন/এই ধর্মের ভবিষ্যৎ; আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হাদারা/ইসলাম ও সভ্যতার সঙ্কট; নাহবা মুজতামায়িল ইসলামি/ইসলামি সমাজের অভিমুখে; তাফসির ফি যিলালিল কুরআন (৩০ খণ্ড); আল-জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ/আল্লাহর পথে জিহাদ। **অন্যান্য :** তিফলুন মিনাল কারইয়াহ/গ্রামীণ বালক (ছেলেবেলা); আল-আশওয়াক/আকাঙ্ক্ষা (ব্যক্তিজীবনের প্রেম); আল-মুদুনুল মাশহুরা/খ্যাতির নগরী (উপন্যাস); আল-আতইয়াফুল আরবাআ/চার ছায়ামূর্তি (চার ভাইবোনের চিন্তাধারা); আফরাহুর রুহ/আত্মার সুখ (চিঠির সংকলন); আল-খারিফ/শরৎকাল (আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস)।

তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যের নেতাদের জেনেভায় নিয়ে যান। পর্দার আড়াল থেকে তাঁদের নির্দেশ প্রদান করেন। ফ্রীম্যাসন-এর সঙ্গে যুক্ত বড়ো বড়ো ইহুদি পণ্ডিতেরা সেখানে সমবেত হন। এই পণ্ডিতেরাই বিশ্বজুড়ে ইহুদিবাদী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তাঁরাই মূলত পর্দার আড়াল থেকে মধ্যাপ্রাচের নেতাদের নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁরা বলেন, 'এই বছর আপনারা এই এই কাজ করবেন।' স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে মুখোমুখি হয়ে কথা বলেন না। নেতারা এসব নির্দেশ গ্রহণ করেন এবং দেশে ফিরে এসে বাস্তবায়ন করতে শুরু করেন। ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক বা জেনেভায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ফ্রীম্যাসনের সভা থেকে তাঁরা যে-নির্দেশ ও নীতিমালা পান, দেশে ফিরে এসে হুবহু তা পালন করার চেষ্টা করেন।

এসব কারণেই আঘাত, যন্ত্রণা, জিহাদ, আন্দোলন, বংশ, উত্তরাধিকার, সম্পর্ক এবং ঘাম-ঝরানো কঠোর নীতিমালার ভিত্তিতে নেতৃত্ব সৃষ্টি করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারণ, আমাদের রাষ্ট্রপতির ভিত্তিটা কোথায়, কীভাবে তিনি উঠে এসেছেন তা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। কেউ কি জানেন গাদ্দাফি কীভাবে উঠে এসেছেন? তাঁর বংশপরিচয় কী? কাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক? গাদ্দাফি যখন ক্ষমতা দখল করেন তার পরের ঘটনা। ঘটনাটি একজন প্রবীণ লিবিয়ান ব্যক্তি আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন, 'আমি ইতালিতে খলিফা আল-মুনতাসিরের সঙ্গে অধ্যাপনা করেছি। মুনতাসির দেশে ফিরে আসেন। তিনি মিলানের[৫৫] ইহুদি পাদরির কাছ থেকে গাদ্দাফিকে পাঠানো একটি চিঠি নিয়ে আসেন এবং চিঠিটি তাঁকে হস্তান্তর করেন। গাদ্দাফি তাঁর অভ্যুত্থানসঙ্গীদের বৈঠকে ইহুদি পাদরির চিঠির কথা উল্লেখ করেন এবং চিঠিটি পড়ার ব্যবস্থা করেন। সভাসদরা ইতালিয়ান ভাষা জানেন এমন একজনকে—খলিফা আল-মুনতাসিরকে—ডেকে আনেন। চিঠি পড়া হয়। পাদরি লিখেছেন, "আপনি অবশ্যই আপনার মাতুলবংশের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবেন।" সভাসদরা মুনতাসিরকে বলেন, "অবশ্যই এই চিঠির কথা গোপন রাখবেন, অন্যথায় আপনাকে জবাই করে ফেলা হবে।" অভ্যুত্থানকারীদের এই সভা থেকে এক সদস্য পালিয়ে কায়রোতে চলে আসেন। তাঁর নাম রায়েদ ওমর আল-মাহিশি। তিনি কায়রোর রেডিও স্টেশন থেকে ঘোষণা দেন : "আমাদের কাছে একটি পত্র এসেছে। তাতে বলা হয়েছে গাদ্দাফির মা হলেন ইহুদি।"' আমি অবশ্য এই খবর আম্মান রেডিও থেকে শুনেছিলাম। তাঁরা [এসব নেতারা] যখন মতবিরোধ করেন

[৫৫] ইতালির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

তখন আল্লাহপাক আমাদের প্রতি দয়া করেন। আর যদি তাঁরা একমত হন, তাহলে আমাদের জবাই করার ব্যাপারেই কেবল একমত হন।

এখন তাঁরা ইনতিফাদার জন্যে মিলিত হচ্ছেন। কেনো তাঁরা ইনতিফাদার জন্যে মিলিত হচ্ছেন? কীভাবে ইনতিফাদাকে নিভিয়ে দেয়া যায়—এজন্যেই কি তাঁরা মিলিত হচ্ছেন? ইনতিফাদার জন্যে মিলিত হওয়ার অর্থ তো এটাই হতে পারে। এ-কারণেই তো রিচার্ড নিক্সনের[৫৬] পাঠানো দূতকে একজন শাসক বলেছিলেন, 'আপনারা খুব দ্রুততার সঙ্গে ইনতিফাদাকে নিভিয়ে দিন। কারণ আপনারাই ভুল করছেন এবং বিলম্ব করছেন। ফলে তাদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রজ্জ্বলনশক্তি বেড়ে গেছে। অবশ্যই আপনাদের তা নিভিয়ে দিতে হবে। তা না হলে আমার ওপর পূর্বের অবস্থা আবার ফিরে আসতে পারে। আপনারা তখন দেখবেন, আমার মুখে দাড়ি, গায়ে ছোটোখাটো পোশাক, হাতে তসবিহ এবং আমি তাদের সঙ্গে হাঁটছি। আমি অস্থির হয়ে যাবো এবং তাদের চাটুবৃত্তি করতে শুরু করবো। তার ফলাফল তো আপনাদেরকেই বহন করতে হবে।'

তাহলে নেতৃত্ব কীভাবে তৈরি হওয়া উচিত। কীভাবে উঠে আসা উচিত নেতাদের? নেতৃত্ব কি সেনা-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৈরি হবে? কারা যে নেতা অবশ্যই আমাদের তা জানা উচিত।

আবদুন নাসের—তাঁর বংশপরিচয় কি আছে? কোত্থেকে শুরু হয়েছে তাঁর বংশ। কে জানেন আবদুন নাসেরের বংশপরিচয়? তাঁর নিকটাত্মীয়রা কোথায়? ছিন্নবংশ মানুষ এরা। কোনো-না-কোনোভাবে ক্ষমতায় চলে আসেন। তারপর যা ইচ্ছে করে যান।

গাদ্দাফি যেসব কর্মকাণ্ড করছেন—মুসলমানের বীজ শরীরে আছে এমন কারো পক্ষে তা করা সম্ভব হবে না। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি যে-প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করেন মুসলমানের বীজে জন্ম-নেয়া কারো জন্যে তেমন ঘৃণা প্রকাশ করা অসম্ভব। গাদ্দাফি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘৃণা করেন... রাসুলের নাম শুনলে তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে যায়, কাঁধের মাংস কেঁপে ওঠে; রাসুলের কথা শুনলে তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। এ-কারণেই তিনি ইসলামের ইতিহাস নতুনভাবে নির্ণয় করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর পর থেকে তিনি ইসলামি ইতিহাসের সূচনা নির্ধারণ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুকে তিনি এই জাতির জন্যে ঈদ হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি রাসুলের মৃত্যু থেকে ইতিহাসের সূচনা ধরেছেন। ফলে এখন লিবিয়ায়

---

[৫৬] রিচার্ড মিলহাউস নিক্সন আমেরিকার সপ্তত্রিংশ রাষ্ট্রপতি। তিনি রিপাবলিকান দলের এবং তাঁর সময়কাল ২০-০১-১৯৬৯-০৯-০৮-১৯৭৪।

ইতিহাসের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে? আমরা এখন ১৪০৮ হিজরি গণনা করছি; কিন্তু লিবিয়ায় এখন ১৩৯৮ হিজরি। অর্থাৎ তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিজরত থেকে নয়, বরং তাঁর মৃত্যুর পর থেকে হিজরি সন গণনা শুরু করেছে। যেসব লিবিয়ানরা বিষয়টি বোঝেন তারা ১৩৯৮ সালকে অন্যভাবে বলেন। এসব কর্মকাণ্ডই গাদ্দাফি করেছেন।

যাই হোক। প্রকৃত নেতৃত্ব গড়তে হলে অবশ্যই মূল্য দিতে হবে। মূল্য আদায় ছাড়া খাঁটি নেতৃত্ব তৈরি হবে না। যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আঘাত-যখম সহ্য করতে হবে। রক্ত ঢেলে দিতে হবে। জান কুরবান করতে হবে। বাবাকে, ভাইকে হারাতে হবে। যা করার সবই করতে হবে। তখনই এই নেতৃত্ব যে-দায়িত্ব পালন করবে তার মূল্য বুঝবে। যে-বিশ্বাস তারা নির্মাণ করবে তারও মূল্য তারা বুঝবে। এ-কারণে যে-চিন্তা-ভাবনা করা হবে তার গুরুত্বও তারা বুঝবে। তা না হলে কিছুতেই ইসলামের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

ভালো কথা। এবার অহুদ যুদ্ধের ঘটনায় ফিরে আসি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদে সবসময় অনড়-অবিচল ছিলেন। তিনি কখনো কোনো যুদ্ধে পরাজিত হন নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়ে গেলেন। আল্লাহর শত্রুরা তাঁর ওপর চারদিক থেকে উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। আবু দুজানা সিমাক বিন খারাশা ঢাল হাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে দাঁড়ালেন। তিনি শত্রুদের ছোঁড়া তীর ঠেকিয়ে দিচ্ছিলেন। আবু দুজানা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি মাথা উঠাবেন না, তাহলে তীরের আঘাত থেকে বেঁচে যাবেন। ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার জন্যে আমার বাবা-মা কুরবান হোক। আবু দুজানার শরীরে তীর পড়ছিলো এবং তিনি রাসুলের সামনে দাঁড়িয়ে তীরগুলো ঠেকিয়ে দিচ্ছিলেন। যুদ্ধশেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে এসে ফাতিমা রা.-এর কাছে তাঁর তরবারিটি দিলেন। রাসুল তাঁকে বললেন, 'এই তরবরি থেকে এই রক্ত ধুয়ে ফেলো। কারণ তা উত্তম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই বলেছিলেন। আলি রা.-ও তাঁর তরবারিটি ফাতেমা রা.-এর কাছে দিলেন। আলি রা.-ও তাঁকে একই কথা বললেন, 'এই তরবারি থেকে এই রক্ত ধুয়ে ফেলো। কারণ এই তরবারি উত্তম পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি যদি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকি, তাহলে আমার সঙ্গে সাহল বিন হানিফ এবং আবু দুজানাও (সিমাক বিন খারাশ) পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমাদের পক্ষে কারা প্রতিহত করবে?' কয়েকজন আনসারি যুবক তাঁর সামনে এগিয়ে এলেন। তাঁরা নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন। এভাবে একজন-

দুইজন করে সাতজন নিহত হলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমাদের সঙ্গীরা আমাদের সঙ্গে ন্যায়বিচার করে নি।' অর্থাৎ আমাদের কুরাইশ সঙ্গীরা; তিনি মুহাজিরদের উদ্দেশে এ-কথা বলেছেন। কারণ সাতজন আনসারি মুজাহিদ নিহত হয়েছিলেন আর মাত্র দুইজন মুহাজির তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গর্তে পড়ে গেলে উবাই বিন খাল্‌ফ তাঁর ওপর আক্রমণ করে। মক্কায় থাকতে উবাই বিন খাল্‌ফ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, হে মুহাম্মদ, আমার কাছে এই তাগড়া ঘোড়াটি আছে। একে আমি প্রতিদিন বারো রিতল শস্য খাওয়াই। এর ওপর চড়েই আমি তোমাকে হত্যা করবো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, 'বরং আমিই তোমাকে হত্যা করবো ইনশাআল্লাহ।'
উবাই বিন খাল্‌ফ তার ঘোড়াটি নিয়ে অহুদ যুদ্ধে এলো। রাসুল গর্তে পড়ে গেলে সে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'আমাকে মুহাম্মদের কাছে যেতে দাও। সে বেঁচে গেলে আমি বাঁচবো না।' পাশে থাকা সাহাবিরা বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, উবাই...।' এই উবাই সবার কাছে পরিচিত ছিলো। সে গাভী বা ষাঁড় বা উটের চামড়ার ওপর দাঁড়াতো এবং তার পায়ের নিচ থেকে চামড়াটি নাড়ানোর জন্যে দশজনের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতো। সে রাসুলের ওপর আক্রমণ করতে এগিয়ে আসতেই সঙ্গের সাহাবিরা বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, উবাই...।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাকে আমার কাছে আসতে দাও।' এই বলে তিনি হারেস বিন সিম্মা রা. থেকে একটি বর্শা নিলেন। উবাই এগিয়ে আসতে তিনি কিছুটা নড়ে উঠলেন। বর্ণনাকারীরা যেমন বর্ণনা করেছেন—উটের পিঠ থেকে মাছি তাড়াতে আমাদের যতটুকু নাড়ানোর প্রয়োজন হয় তিনি ততোটুকুই নড়ে উঠলেন। الشعر। [একবচন الشعراء।] চেনেন তো? এটি একপ্রকার মাছি। উটকে খুব কষ্ট দেয়; অন্যান্য প্রাণীকেও কষ্ট দেয়।
যাই হোক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বর্শা নিলেন এবং উবাই আক্রমণ করতেই তিনি কিছুটা লাফিয়ে উঠলেন। সাহাবিরাও নড়ে উঠলেন। তাঁরা ভয় পেলেন এবং দূরে সরে গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাইর গলায় [বা ঘাড়ে] আঘাত করলেন এবং সেখানে হালকা যখম হলো। রক্ত বেরিয়ে এলো। উবাই ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটতে লাগলো। লোকেরা বললো, 'তোমার ক্ষত তো হালকা। এতো চেঁচামেচি করছো কেনো?' উবাই বললো, 'বরং আমি এতেই মারা যাবো। কারণ মুহাম্মদ আমাকে বলেছিলো, 'বরং আমিই তোমাকে হত্যা করবো।'

সিরাত থেকে শিক্ষা : এক

আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহপাকের কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাই। শুরু করছি পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহর নামে : আল্লাহপাক বলেছেন—

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ () لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ()

'অবশেষে যখন রাসুলগণ নিরাশ হলেন এবং লোকেরা ভাবলো যে রাসুলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য এলো। এভাবে আমি যাকে চাই সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি প্রতিহত করা যায় না। তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে আছে শিক্ষা। এটা এমন বাণী যা মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু মুমিনদের জন্যে তা পূর্বগ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ১১০–১১১]

দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহর নীতিমালা

সুরা ইউসুফের শেষ দুটি আয়াত দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহপাকের নীতিমালা বিবৃত করেছে। এটা হলো দাওয়াত প্রদান ও তার ফলপ্রাপ্তি এবং ইসলামি আন্দোলনের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ঐশী বিধি-বিধান এবং আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ম-কানুন। এই নীতিমালা বলছে, ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারীদের নৈরাশ্য চলে আসা পর্যন্ত সঙ্কট, যন্ত্রণা, বিপর্যয় ও দুর্বিপাকের মুখোমুখি হতে হবে। তাঁদের অবশ্যই এই স্তরে উপনীত হতে হবে। নীতিমালার প্রথম পর্যায় বলছে, সমস্যা-জটিলতা দাওয়াত প্রদানকারীদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেবে, চারদিক থেকে সঙ্কট তাঁদের ওপর চেপে বসবে; তাঁরা চারপাশে তাকাবেন—আলোর কোনো রেখা দেখতে পাবেন না, আশার কোনো চিহ্ন দেখতে পাবেন না... তখনই তাঁদের জন্যে আল্লাহপাকের সাহায্য আসবে। প্রথম স্তরটি হলো কষ্ট ও যন্ত্রণার স্তর; নির্যাতন ও নিপীড়নের স্তর; ঘাম ও রক্তের স্তর। এ-স্তরে এসে মুজাহিদগণ, ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারীগণ এবং ইসলামি আন্দোলনের নেতাকর্মীগণ হতাশায় পড়ে যাবেন, নৈরাশ্য তাঁদের আক্রান্ত করবে।

কুরআন বিবৃত করছে, অবশেষে রাসুলগণ নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন... কারা নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলেন? নবী-রাসুলগণ (সালাতুল্লাহি ওয়াস সালামু আলাইহিম); আসমান থেকে তাঁদের কাছে প্রত্যাদেশ এসেছে; আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরা অবিচল-অনড় থেকেছেন; তাঁদের ওপর রহমত ও প্রশান্তি বর্ষিত হয়েছে। এসব সত্ত্বেও তাঁরা হতাশার স্তরে পৌছে গিয়েছিলেন। প্রথম স্তরটি হলো কষ্ট ও দুর্ভোগের স্তর; এখানে সবাই নৈরাশ্যের সীমায় পৌছে যায়।

দ্বিতীয় স্তরটি হলো সাহায্যপ্রাপ্তির স্তর। এখানে মুমিনরা মুক্তি পায় এবং অপরাধীরা ধ্বংস হয়; 'তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য এলো। এভাবে আমি যাকে চাই সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি প্রতিহত করা যায় না।' জাতিকে এই নীতিমালার সত্য অনুধাবন করতে হবে। প্রতিটি পর্যায়ে তরুণ সমাজকে এই নীতি নিয়ে ভাবতে হবে : 'তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে আছে শিক্ষা।'

আমরা যদি কুরআন শরিফে সুরা ইউসুফের দিকে তাকাই তাহলে এর বিন্যাস দেখি এরকম : প্রথমে সুরা ইউনুস, তারপর সুরা হুদ এবং তারপর সুরা ইউসুফ। এ-তিনটি মক্কি [মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া] সুরা। যিনি কুরআনুল কারিম পাঠ করেন তিনি অন্য দুটি মক্কি সুরা—সুরা আল-আনআম ও সুরা আল-আরাফ—পাঠ করার পর এই সুরা তিনটি অধ্যয়ন করেন। কুরআন সুরা ফাতিহা দিয়ে শুরু হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, সুরা ফাতিহা দুইবার নাযিল হয়েছে; একবার মক্কায় এবং আরেকবার মদিনায়। তার পরের সুরা বাকারাটি মাদানি [মদিনায় অবতীর্ণ হওয়া সুরা]। তারপর সুরা আলে-ইমরান মাদানি। সুরা নিসা মাদানি। সুরা মায়েদাও মাদানি। এ-সুরাগুলো সবচেয়ে বড়ো সুরা। এরপর পাঠ করতে হবে সুরা আল-আনআম ও সুরা আল-আরাফ। এ-দুটি সুরা মক্কি। তারপর আছে সুরা আল-আনফাল ও সুরা আত-তাওবা। এ-সুরা দুটির বিষয়বস্তু এক : আল্লাহর পথে জিহাদ। এ-কারণেই উসমান রা. সুরা দুটির মধ্যে বিসমিল্লাহ রাখেন নি; যেহেতু এ-দুটির বিষয়বস্তু এক। তিনি "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বাদ দিয়ে সুরা দুটিকে সংযুক্ত করেছেন এবং السبع الطوال-এর[৫৭] অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপর শুরু হয়েছে সুরা ইউনুস। তারপর সুরা হুদ, তারপর সুরা ইউসুফ। কুরআনে সুরাগুলোর এই হলো বিন্যাস। অবশ্য এভাবেই সুরা তিনটি নাযিল হয়েছে : প্রথমে সুরা ইউনুস, তারপর সুরা হুদ ও ইউসুফ।

---

[৫৭] কুরআনের প্রথমদিকের দীর্ঘ সাতটি সুরাকে আয়াতের সংখ্যানুসারে যে-নিয়মে রাখা হয়েছে, তাদেরকে السبع الطوال বলা হয়।

এই সুরা তিনটি কখন নাযিল হয়েছে?... নবুওতপ্রাপ্তির দশম বছরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন। এ-সময় কুরাইশের স্পর্ধা বেড়ে যায় এবং তারা রাসুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠিক এ-বছরেই খাদিজা রা. ইন্তেকাল করেন। দুজন আত্মার আত্মীয়কে হারানোর শোক এবং মুশরিকদের যন্ত্রণা রাসুলের ওপর তীব্র হয়ে ওঠার ফলে এ-বছরটিকে আমুল হুযন বা দুঃখের বছর বলা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পরেই কেবল কুরাইশরা আমার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পেরেছে।' একদিন রাসুল রাস্তায় হাঁটছিলেন। এ-সময় এক নির্বোধ তাঁর পথ আগলে দাঁড়ায় এবং তাঁর মুখে মাটি ছুঁড়ে মারে। এভাবেই রাসুল ঘরে আসেন। তাঁর এক কন্যা এগিয়ে গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চেহারা থেকে মাটি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যাকে বললেন, 'মা, তুমি দুঃখ করো না, কেঁদো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমার বাবাকে রক্ষা করবেন।'

তায়েফে যাত্রা

নবুওতপ্রাপ্তির দশম, একাদশ ও দ্বাদশ বছর। এই তিনটি বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তীব্র কষ্ট ও যন্ত্রণার বছর। এ-বছরগুলোতে মুসলমানদের শিরা-উপশিরা পিষে ফেলা হয়। ইসলামের দাওয়াত মক্কায় প্রচণ্ড বাধার মুখোমুখি হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফে চলে যান। তাদের কাছে তাঁর দাওয়াত পেশ করেন। তারা নির্বোধদের ও দুষ্ট ছেলেদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেয়। তারা উত্তেজিত হয়ে তাঁর গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারে। তাঁর পবিত্র গোড়ালি দুটিকে রক্তরঞ্জিত করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে রক্ষা করতে না পেরে রবিয়ার দুই পুত্র উতবা ও শায়বার বাগানে এসে আশ্রয় নেন। গ্রীষ্মকালে মক্কাবাসীরা তায়েফে যেতো। আজো যেমন মক্কাবাসী ও মক্কার অভিজাত শ্রেণি গ্রীষ্মকালে ওখানে যায়। তায়েফে মক্কার ধনী ও প্রধান ব্যক্তিদের বাড়িঘর ছিলো। তারা শীতকাল মক্কায় কাটাতো আর তায়েফে কাটাতো গ্রীষ্মকাল। উতবা ও শায়বারও ওখানে একটি বাগান ছিলো। তারা সেখানে গ্রীষ্মকাল যাপন করতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বাগানে আশ্রয় নেন। [বাগানে অবস্থান করা] মক্কার নেতারা তায়েফের দুষ্ট ছেলেদের তাড়িয়ে দেয়। তারা ফিরে যায়। রাসুল কিছুটা সুস্থির হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এই দোয়া সবার কাছে পরিচিত। যদিও আলেমগণ এটিকে দুর্বল হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন, তারপরও এটি গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গেই সিরাত ও অন্যান্য গ্রন্থে বিদ্যমান আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছিলেন—

اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت أرحم الراحمين، ورب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، وإن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আমার শক্তির দুর্বলতা, আমার কৌশলের স্বল্পতা এবং মানুষের নিকট আমার তুচ্ছতার ব্যাপারে অভিযোগ জানাই। হে আল্লাহ, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান, আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক এবং আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি কার কাছে আমাকে ঠেলে দিচ্ছেন? আপনি কি আমাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন যেখানে আমি পীড়িত হই? না-কি আমার দায়িত্বভার তুলে দিচ্ছেন শত্রুর হাতে? আমার প্রতি যদি আপনার ক্রোধ না থাকে তাহলে আমি কোনোকিছুর পরোয়া করি না। অন্যথায় আপনার ক্ষমাই হবে আমার জন্যে ব্যাপক কল্যাণকর। আসমান-জমিন আলোকিত-করা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়ের জন্যে যথাযথ আপনার নুরের দোহাই দিয়ে আমার প্রতি আপনার ক্রোধ বা আমার প্রতি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাই। [আমার] সন্তুষ্টি আপনার জন্যে, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। আপনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই, আপনি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই।'[৫৮]

কে এসব কথা বলেছিলেন? মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। কে তিনি? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বনু হাশিমের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। কুরাইশ তাঁকে তাদের জীবনে সবচেয়ে বিপজ্জনক ঘটনায় বিচারক বানিয়েছিলো। সবাইকে সন্তুষ্ট রেখে হজরে আসওয়াদ যথাস্থানে স্থাপনের ঘটনাটি ছিলো অনন্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরুণ বয়সে দক্ষতার সঙ্গে এই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সব মানুষের কাছে সৎ ও সত্যবাদী। এজন্যে তাঁর উপাধিই হয়েছিলো আল-আমিন বা বিশ্বস্ত। কোনো ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যদি তাঁকে দেখতো, সে গোটা দিনটাকে সৌভাগ্যময় মনে করতো। সে বলতো, 'আজকের দিনটি আমি আল-আমিনকে দেখে শুরু করেছি। দিনটি আমার জন্যে কল্যাণকর হবে।' এভাবেই তারা বলতো। কিন্তু তারপর কী ঘটলো? ছোটো ছোটো বালকেরা

---

[৫৮] আবদুর রহমান আস-সুয়ুতি, জামিউল আহাদিস, হাদিস ৩৮৪১৭; কানযুল উম্মাল, হাদিস ৫১২০।

হাতে পাথর নিয়ে তাঁর পেছনে লেগে গেলো। তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে এলো এবং তাঁর পবিত্র গোড়ালি দুটি রক্তাক্ত করলো। কারা তাঁকে আশ্রয় দিলো? দুজন কাফের। কিন্তু তাদের বংশকৌলীন্য ও গোত্রীয় আভিজাত্য অটুট ছিলো। এটাই কুরাইশের বৈশিষ্ট্য। আর তায়েফ থেকে যারা ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে রাসুলকে তাড়িয়ে আনলো, নির্যাতন করলো, তাঁর দীনের দওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলো তারা বনু সাকিফ গোত্রের। উতবা ও শায়বা—এই দুজন তাঁকে আশ্রয় দিলো। কারণ তাদের ও রাসুলের বংশপরিচয় অভিন্ন। তীব্র কৌলীন্যবোধ তাদের কঠোর করে তুললো। তারা দুষ্ট ছেলেদের তাড়িয়ে দিলো। উতবা বিন রবিয়া ও শায়বা বিন রবিয়া যখন রাসুলকে এ-অবস্থায় দেখলো—তিনি রক্তাক্ত হয়ে একটি আঙ্গুর গাছের নিচে বসে আছেন—তারা আদ্দাসকে দিয়ে তার কাছে এক থোকা আঙ্গুর পাঠালো। আদ্দাস একজন খ্রিস্টান বালক; তাদের ওখানে চাপরাশির কাজ করতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙ্গুর হাতে নিয়ে মুখে দেয়ার আগে বললেন, 'বিসমিল্লাহ।' আদ্দাস বললো, 'এটা তো এ-এলাকার মানুষজনের কথা নয়।' রাসুল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়?' সে বললো, 'আমার বাড়ি নিনাওয়া[৫৯]।' তিনি বললেন, 'ওটা তো আমার ভাই ইউনুসের দেশ।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাবার্তায় আদ্দাস খুব বিস্মিত হলো। সে মানসিকভাবে রাসুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো।

আদ্দাস যখন উতবা ও শায়বার কাছে ফিরে গেলো, তারা ভাবলো হয় সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে না হয় মুহাম্মদের দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'সে তোমাকে কী বলেছে?' আদ্দাস বললো, 'আমাকে এই এই কথা বলেছেন।' তারা বললো, 'আদ্দাস, তার ধর্মের চেয়ে তোমার ধর্মই উত্তম।'

কল্পনা করুন যে রাসুলের মতো একই অবস্থায় আপনি আছেন। আপনি আফগানদের সঙ্গে জিহাদ করার জন্যে আফগানিস্তানের একটি গ্রামে প্রবেশ করেছেন। তারাই আপনাকে বললো, আরে এটা তো ওহাবি। এই বলে আপনার পেছনে দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে দিলো। তারা আপনাকে তাড়িয়ে নিয়ে এলো এবং পাথর ছুঁড়ে আপনাকে রক্তাক্ত করে ফেললো। আপানাকে মেরেকেটে মাল-সামানা ও অস্ত্র ছিনিয়ে নিলো। অবশেষে আপনাকে পালিয়ে আসার সুযোগ দিলো এবং আপনি পেশোয়ারে চলে এলেন। তখন আপনি কী করবেন? আফগানদের সঙ্গে কী আচরণ হবে আপনার? অবশ্যই আপনি

---

[৫৯] নিনাওয়া (Nineveh) দাজলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি এলাকা। প্রাচীন আসিরিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিলো। বর্তমানে এটি বাগদাদ থেকে ৩৭০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।

বললেন, 'আমাকে টিকেট দাও, আমি দেশে ফিরে যাবে। এই জাতির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। তারা যা করছে তাতেও কোনো কল্যাণ নেই। এখানেই আমি সবকিছুর সমাপ্তি ঘটাতে চাই। আমি তাদের সঙ্গে মিলে জিহাদ করতে গেলাম, তা সত্ত্বেও তারা আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারলো। আমার পা দুটিকে ক্ষত-বিক্ষত করলো। আমার মাথা ফাটিয়ে দিলো।' অবশ্যই আপনি এসব কথা বলবেন। কারণ, মানবতার শ্রেষ্ঠ নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশে আপনি কে? কেউ না। রাসুল বলেছিলেন, 'আমার প্রতি যদি আপনার ক্রোধ না থাকে তাহলে আমি কোনোকিছুর পরোয়া করি না। অন্যথায় আপনার ক্ষমাই হবে আমার জন্যে ব্যাপক কল্যাণকর।... [আমার] সন্তুষ্টি আপনার জন্যে, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।' যখনই কোনো বিষয় জটিল হয়ে যেতো এবং সঙ্কট ঘনিয়ে আসতো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইভাবে দোয়া করতেন।

আবদু ইয়ালিলের ছেলেরা যখন রাসুলকে প্রত্যাখ্যান করে, তিনি তীব্র কষ্ট পান। সাইয়িদা আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে যে-হাদিস বর্ণিত আছে তা এখানে স্মরণযোগ্য। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অহুদের চেয়েও কি তীব্র কষ্টের দিন আপনার জীবনে অতিবাহিত হয়েছে?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, অতিবাহিত হয়েছে। আমি যখন নিজেকে আবদু ইয়ালিলের সন্তানদের কাছে পেশ করলাম, তারা আমাকে বাধা দিলো এবং প্রত্যাখ্যান করলো। আমি দিশেহারা হয়ে ফিরে এলাম। খুব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কারনুস সাআলিব[৬০]-এর কাছে পৌছলাম। তখনই জিবরাইল আ. আমাকে ডেকে বললেন, "হে মুহাম্মদ, ইনি মালাকুল জিবাল—পাহাড়-পর্বত তদারককারী ফেরেশতা। আল্লাহপাক তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি তাঁকে যা ইচ্ছা তাই আদেশ করতে পারেন।" এরপর মালাকুল জিবাল আমাকে ডাক দিলেন।'—এটা বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত সহিহ হাদিস। দ্বিতীয় হাদিসের একটি অংশ সহিহ; কিন্তু পুরোটা মিলিয়ে সহিহ কি-না তাতে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে দুটো হাদিস মিলিয়ে পুরোটাই সিরাত, স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা ও ফযিলতের গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।—'আল্লাহপাক আমাকে নির্দেশ নিয়েছেন, আপনি যা চাইবেন আমি তাই করবো। আপনি যদি চান আমি তাদের ভূমিতে ভূমিকম্প সৃষ্টি করি, তাহলে আমি তাই করবো। আর যদি আপনি আমাকে তাদের ওপর পাহাড় দুটি—অর্থাৎ আবু কুবাইস পাহাড়

---

৬০ এই স্থানকে কারনুল মানাযিলও বলা হয়। এটি নজদবাসীর মিকাত। মক্কা থেকে মাত্র দুই মনযিল দূরে অবস্থিত।

ও লাল পাহাড়, এ-দুটির মধ্যস্থলে মক্কা অবস্থিত—চাপিয়ে দিতে নির্দেশ দেন তাহলে আমি পাহাড় চাপিয়ে দেবো।' ফেরেশতা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু রাসুল তাঁকে অনুমতি দিলেন না। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি আশা করি আল্লাহপাক তাদের ঔরসে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।'[৬১]

---

[৬১] পুরো হাদিস ও তার তরজমা এখানে দেয়া হলো :

وعن عائشة أنها قالت : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال : لقد لقيت من قومك فكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال فلم يجبني إلي ما أردت فانطلقت – وأنا مهموم – على وجهي فلم أفق إلا في قرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم . قال : فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال : يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أطبق عليهم الأخشبين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا.

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, একবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার জীবনে অহুদের দিনের চেয়েও অধিক কষ্টের দিন এসেছিলো কি? তিনি বললেন, 'তোমার জাতি থেকে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। তবে তাদের থেকে তীব্রতম কষ্টদায়ক যা আমি পেয়েছি তা হলো আকাবার দিনের আঘাত; সেদিন আমি নিজে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে [তায়েফের বনু সাকিফ নেতা] ইবনে আবদু ইয়ালিল বিন কুলালের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি যা নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম, সে তাতে সাড়া দেয় নি। আমি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে [নিরুদ্দেশ] চলতে লাগলাম। কারনুস সাআলিব নামক স্থানে এসে কিছুটা সুস্থির হলাম। মাথা উপরের দিকে তুলে দেখতে পেলাম একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আবার লক্ষ্য করলে তাতে জিবরাইল আ.-কে দেখলাম। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "আপনি আপনার সম্প্রদায়ের কাছে যে-কথা বলেছেন এবং তার জবাবে তারা আপনাকে যা বলেছে তার সবই আল্লাহপাক শুনেছেন। এখন তিনি পাহাড়-পর্বত তদারককারী ফেরেশতাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন। সুতরাং সে-লোকদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাকে নির্দেশ দিতে পারেন।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তারপর মালাকুল জিবাল আমাকে ডাক দিলেন, সালাম করলেন এবং বললেন, "হে মুহাম্মদ, আল্লাহপাক আপনার সম্প্রদায়ের উক্তিগুলো শুনেছেন। আমি মালাকুল জিবাল [পাহাড়-পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা], আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার যা ইচ্ছা আমাকে নির্দেশ করতে পারেন; আপনি চাইলে এই পাহাড় দুটি আমি তাদের ওপর চাপিয়ে দেবো।" জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন '[আমি তা চাই না;] বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাআলা তাদের ঔরসে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।' [বুখারি ও মুসলিম]

আমি ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারী... আমার নীতি হবে—

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

'আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।' [সুরা শুআরা : আয়াত ১২৭]

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ

'অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা।' [সুরা গাশিয়া : আয়াত ২১]

দাওয়াত প্রদানকারীর পথ যতোই লম্বা হবে, প্রতিদান ততোই বাড়বে। দুর্বিপাক যতোই দাঁত বের করে হিংস্রভাবে হাসবে, তাঁর পুরস্কার ততোই বৃদ্ধি পাবে। বিপদ-আপদ যতো বৃদ্ধি পাবে, প্রতিদানও ততো বৃদ্ধি পাবে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, পরিশ্রম, ক্লান্তি যতো বাড়বে পুরস্কারও ততো বাড়বে। আমরা আল্লাহর জন্যে কিছু শর্ত করি নি, তিনিও আমাদের জন্যে কিছু শর্ত করেন নি; তবে আমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং যথাযথ তাকওয়া অবলম্বন করলে তিনি আমাদের পুরস্কার হিসেবে জান্নাত প্রদান করবেন। আর দুনিয়াতে, যদি আমরা জিহাদে জয়লাভ করি তাহলে তার ফল যা হওয়ার কথা তাই হবে। যদি আমরা মনে করি, সবাই আমরা সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত তাহলে অবশ্যই সাহায্য পাবো এবং এই পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবো; অন্যথায় আমাদের পরবর্তী বংশধর বিজয়ী হবে। তারাও যদি বিজয়ী না হয় তাহলে তাদের পরের বংশধর বিজয়ী হবে। এভাবেই চলবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই জমিনে আমাদের মিনার হিসেবে টিকে থাকতে হবে।

সুরা ইউনুস, সুরা হুদ ও সুরা ইউসুফ একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে পাশাপাশি অবতীর্ণ হয়েছে এবং পাশাপাশি কুরআনে স্থাপিত হয়েছে। সুরা তিনটির ঘটনাবলি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বিবৃত হয়েছে। রাসুলকে তাঁর অতীতের নবী ভাইদের কাহিনি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যাঁরা একই পথে হেঁটেছেন। ইউনুস আলাইহিস সালাম, হুদ আলাইহিস সালাম এবং—লক্ষ্য করুন—ইউসুফ আলাইহিস সালাম—রাসুলের সব ভাইয়ের একই নীতি, এই পথ, একই স্বভাব। যেনো দূরবর্তী ইঙ্গিতের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে সাহায্য অত্যাসন্ন। কেউ কি ধারণা করেছিলো যে হিংসায় উন্মত্ত হয়ে ইউসুফ আ.কে গভীর অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করা হবে, এরপর তিনি মিসরের শাসক হয়ে উঠবেন এবং প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গে গোটা এলাকা শাসন করবেন? তারপর তাঁর পরিবার ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে আসবে—

وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

'এবং তারা সবাই তার সম্মানে সিজদায়[৬২] লুটিয়ে পড়লো। সে বললো, হে আমার পিতা, এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করবার পরও আপনাদের মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ১০০]

আল্লাহপাক যেনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, ইউনুস যেভাবে মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছে, তার সম্প্রদায় যেভাবে শেষ মুহূর্তে রেহাই পেয়েছে ...

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

'তবে ইউনুসের[৬৩] সম্প্রদায় ব্যতীত কোনো জনপদবাসী কেনো এমন হলো না যারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো? তারা[৬৪] যখন ঈমান আনলো তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দূর করলাম এবং তাদের কিছু কালের জন্যে জীবনোপভোগ করতে দিলাম।' [সুরা ইউনুস : আয়াত ৯৮]

আল্লাহপাক সুরা হুদের আরেকটি আয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশে বলেছেন—

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

'আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁর নিকটই সবকিছু প্রত্যানীত হবে। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর ওপর নির্ভর করো। তোমরা যা করো সে-সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।' [সুরা হুদ : আয়াত ১২৩]

---

[৬২] সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এই সিজদা। পূর্ববর্তী শরিয়তে তা বৈধ ছিলো।

[৬৩] হযরত ইউনুস আ. নিনাওয়াবাসীদের নিকট দীন প্রচার করেছিলেন; কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। তাদের কর্মফলের শাস্তি হিসেবে আযাব এলে তারা অনুতপ্ত হয় এবং তওবা করে। আল্লাহপাক তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তাদের আযাব থেকে মুক্তি দেন।

[৬৪] ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়।

সুরা ইউসুফে রাসুলের উদ্দেশে আল্লাহপাক বলেছেন—

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ

'অবশেষে যখন রাসুলগণ নিরাশ হলো এবং লোকেরা ভাবলো যে রাসুলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য এলো। এভাবে আমি যাকে চাই সে উদ্ধার পায়।'

পথে পথে ও পদে পদে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ছেয়ে থাকবে, দুর্ভাগ্য ও দুর্বিপাক চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে, সঙ্কট ও জটিলতা মরণকামড় বসাবে। তারপর মানুষ নৈরাশ্যের স্তরে পৌঁছাবে এবং তারপরই আসবে আল্লাহর সাহায্য। তখন আল্লাহ মুমিনদের উদ্ধার করবেন এবং অপরাধীদের ছিন্নভিন্ন করবেন। কারণ তিনি বলেছেন, 'আপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তিকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।' এটি একটি বংশধরের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। পরবর্তী বংশধরেরা তাদের কাহিনি থেকে শিক্ষা নেয়।

আফগান জিহাদে আল্লাহর নীতিমালা

বর্তমান আফগান জিহাদে আমরা কীভাবে এই নীতিমালা প্রয়োগ করবো? পাথর ও লাঠি দিয়ে আফগান জিহাদ শুরু হয়েছিলো আপনারা তা জানেন। একটি ইসলামি আন্দোলন দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। এই ইসলামি আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিরা ছিলেন শায়খ রব্বানি, হেকমতিয়ার, সাইয়াফ, গোলাম মুহাম্মদ নিয়াযি এবং আবদুর রহিম মুহাম্মদ নিয়াযি। এরা সবাই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ও যুবক। কেউ ছাত্র ছিলেন, কেউ ছিলেন শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা একটি শক্তিশালী প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ইসলামি আন্দোলনকে শেষ করে দেয়ার জন্যে জহির শাহকে বিতাড়িত করে ক্ষমতায় আসা দাউদ খাঁর বিপ্লব সম্পন্ন হয়। ইসলামি আন্দোলন দাউদ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ড. মুহাম্মদ উমর মাত্র একটি রিভলবার ও দুটি বোমা নিয়ে বদখশান যান। তিনি এই একটি রিভলবার ও দুটি বোমা দিয়েই বদখশানে আক্রমণ করতে চান। আফগানরা দুর্‌রাতে[৬৫] যেতেন। সেখান থেকে তাঁরা বন্দুক সংগ্রহ করতেন। তারপর আফগানিস্তানে ফিরে আসতেন।

তাঁরা আসলে ছিলেন খুবই দরিদ্র। কোনোকিছুই তাদের অধিকারে ছিলো না। একটি ঘরের ভাড়া ঠিকমত পরিশোধ করার মতো সামর্থ্য তাঁদের ছিলো না। তাঁরা ওখানে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। প্রতিদিন তাঁদের একজন শাক-সবজির বাজারে যেতেন এবং এক রুপি দিয়ে শাক-শবজি কিনে পরে তা দুই রুপিতে বিক্রি করতেন। দুই রুপির এক রুপি ঘরের মালিককে পরিশোধ

---

[৬৫] পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী একটি এলাকা।

করতেন, যাতে সে ও তার ভাইয়েরা খেতে পারে। আরেক রুপি দ্বিতীয় দিনের জন্যে নিজের কাছে রেখে দিতেন। এই রুপি দিয়ে পরের দিন আবার সবজি কিনে দুই রুপিতে বিক্রি করতেন। এ-ধরনের উদাহরণ অনেক। অধিকাংশ দিন রব্বানি রাতে ফিরে এসে তাঁদের বলতেন, 'তোমাদের কাছে কি ঘরে কোনো খাবার আছে, রুটি বা অন্য কিছু?' তাঁরা বলতেন, 'না, আমাদের কাছে খাবার তো কিছু নেই।' কী আর করা, সবাই তাঁরা উপোস রাত্রি যাপন করতেন।

হেকমতিয়ার আফগানিস্তানের ভেতরেই থাকতেন। পরে অবশ্য পাকিস্তানে এসেছিলেন। অধ্যাপক রব্বানি তাঁর আসার ছয় মাস আগেই পেশোয়ারে আসেন। হেকমতিয়ার তখন পাকতিয়ায় আত্মগোপন করে ছিলেন। এ-সময় পুলিশ তাঁর ছবি সঙ্গে নিয়ে পুরো রাস্তায় গাড়িতে গাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে। হেকমতিয়ারকে গ্রেপ্তার করার জন্যে পুলিশ সতেরোটি পয়েন্টে অভিযান চালায় এবং ব্যর্থ হয়। এ-সময় তাঁর ছবিই কেবল তাদের সঙ্গে ছিলো।

জিহাদ শুরু হয়। ১৯৭৮ সালে নুর মুহাম্মদ তারাকির সময়ে জিহাদ বিশালরূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৭৯ সালে এপ্রিল মাসে তারাকির বিপ্লব শেষ[৬৬] হয়ে যাওয়ার পর মানুষজন ইসলামি আন্দোলনের নেতাদের দিকে তাকাতে শুরু করে। তারা দুজনকে পায়—গুলবদন/গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার এবং অধ্যাপক বুরহানউদ্দিন রব্বানি। মানুষ দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়; একদল হেকমতিয়ারের নেতৃত্বে হিয্‌বে ইসলামিতে যোগ দেয় আরেক দল যোগ দেয় রব্বানির নেতৃত্বাধীন জমিয়তে ইসলামিতে। জমিয়তে ইসলামি ও হিয্‌বে ইসলামি দিন দিন লোকবলে বেড়েই যাচ্ছিলো এবং গর্জনও করছিলো; কিন্তু তাদের কাছে কিছু ছিলো না। আশির দশক শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারপরও আমি মনে করতে পারি হেকমতিয়ার আমাকে বলেছিলেন, 'কোনারে আমাদের সতেরো হাজার মুজাহিদ রয়েছেন। আমরা তাঁদেরকে মাসে মাত্র ১৬ হাজার রুপি দিতে পারি।' মানে একজন মুজাহিদ প্রতিমাসে এক রুপিরও কম পেতেন।

হ্যাঁ, তাঁদের অধিকারে সহায়-সম্পত্তি ছিলো না, টাকা-পয়সা ছিলে না। তাঁরা তাঁদের অফিসঘরের ভাড়াও ঠিকমত পরিশোধ করতে পারতেন না। হেকমতিয়ার বলেছিলেন, 'আমরা কেবল অফিসগুলোর ভাড়া ঠিকঠাক পরিশোধ করতে চাই।' হ্যাঁ, পার্থিব কোনোকিছুই তাঁদের অধিকারে ছিলো না। এই যে আমরা জুতা পরছি, এই জুতা তারা কখনো দেখেন নি। আমরা যখন আফগানিস্তানে গেলাম, দেখলাম যে তাঁরা বরফের ওপর চটিজুতা পরে

---

[৬৬] নুর মুহাম্মদ তারাকি ১৯৭৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল থেকে ১৯৭৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন।

হাঁটছেন। এখন তাঁরা যা পরছেন তা নতুন; মাকতাবুল খিদমাহ [সেবা দপ্তর] প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা দেয়া হয়েছে। আমরা তাঁদের জন্যে সৌদি রেড ক্রিসেন্ট থেকে, কুয়েতের রেড ক্রিসেন্ট থেকে অর্থ ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেছি। এর আগে তাদের পায়ে কখনো জুতা ছিলো না। আর যাকে বলে জ্যাকেট এই জিনিসটাও তাঁদের ছিলো না। ঘুমের পোশাকও তাঁদের ছিলো না। সাধারণ পোশাক পরেই তাঁরা বরফের ওপর ঘুমিয়ে থাকতেন। তাঁদের কাছে কিছু ছিলো না। আহমদ শাহ মাসউদ আমাকে বলেছেন, 'অনেক দিন গিয়েছে, প্রায় তিন মাস—এই তিন মাস আমাদের কাছে কেবল একটি পাত্র ও শুকনো বরবটি ছাড়া কিছু ছিলো না। শুকনো লাল বরবটি আমরা সিদ্ধ করে খেতাম। তিন মাস সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা আমরা এই বরবটিই খেয়েছি। এটা ছাড়া খাওয়ার মত আর কিছু ছিলো না; না রুটি, না ভাত না অন্য কিছু। আমরা রুশ বাহিনী থেকে আত্মগোপন করার জন্যে পালিয়ে বেড়াতাম। আমাদের মধ্যে আর রুশ সেনাবাহিনীর মধ্যে অপরিহার্যভাবে যুদ্ধ লেগেই থাকতো। আমরা উপত্যকায় থাকি আর পাহাড়ের ওপরে থাকি, আমাদের সঙ্গে পাত্রটি থাকতো আর কাঁধে থাকতো বরবটির বস্তা। যখনই আমরা সময় পেতাম, বরবটি সিদ্ধ করে খেতাম। একবার দশটা দিন এমনভাবে কাটলো যে শুকনো তুঁত ফল ছাড়া আর কিছু আমাদের কাছে ছিলো না। আমরা প্রত্যেকেই পকেটে করে একমুঠো শুকনো তুঁত ফল নিয়ে নিতাম। কয়েক মাস এমন কেটেছে যে আমরা প্রতিবেলা একটি করে আলুসিদ্ধ খেয়েছি। সকালে একটি আলুসিদ্ধ, দুপুরে একটি, সন্ধ্যায়ও একটি আলুসিদ্ধ।'

আহমদ শাহ মাসউদ আমাকে আরো বলেছেন, 'আমরা যখন কোনো অপারেশনে বের হতে চাইতাম, যারা বিশ্রামে থাকতো, অপারেশনে বের হওয়া মুজাহিদরা তাদের পা থেকে জুতা খুলে নিয়ে যেতো। কারণ সবার জুতা ছিলো না। আবার ফিরে আসার সময় প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর জুতা ফিরিয়ে নিয়ে আসতো।'

কী ভীষণ আশ্চর্যজনক কষ্টের দিন সেগুলো! অনেক ঋণ ছিলো তাঁদের। তাঁরা যে-খাবার খেতেন তার পুরোটাই ছিলো ঋণ। মাসউদ আমাকে এভাবেই বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের এলাকায় ঘোড়ায় চড়ে কেউ এলে আমরা ভাবতাম যে-ব্যবসায়ী আমাদের বাকিতে খাবার দিয়েছেন তিনিই বুঝি তাঁর পাওনা আদায় করতে এসেছেন।'

জেনেভায় সম্মেলন হওয়ার পর সিদ্ধান্ত হলো যে মুজাহিদরা তাঁদের নিজ নিজ দেশ বা এলাকায় ফিরে যাবেন। এ-কথা শুনেই ব্যবসায়ীরা কাঁদতে কাঁদতে হেকমতিয়ার ও রব্বানির কাছে এলেন। রব্বানি আমাকে বলেছেন, 'ব্যবসায়ীরা কাঁদতে কাঁদতে আমাদের কাছে এলেন। তাঁদের বাড়িঘর বিরান

ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আফগানিস্তানের ভেতরে খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী বয়ে নিয়ে আসা গাধাগুলোর ভাড়াবাবদই তাঁদের পাওনা দাঁড়িয়েছে একশো বিশ মিলিয়ন রুপি।' ব্যবসায়ীরা বললেন, 'আমাদের ঘরবাড়ি সব বিনাশ হয়ে গেছে। আপনারা যদি এখন ফিরে যান তাহলে কীভাবে আমাদের ঋণ উদ্ধার করবো?' তাঁরা ব্যবসায়ীদের বললেন, 'আপনারা শান্ত হোন। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। আমরা ফিরে যাবো না। মুহাজিররাও ফিরে যাবেন না।'

১৯৮০ বা ১৯৮১ সালের দিকে শায়খ সাইয়াফ যখন আফগানিস্তানে এলেন তখন মুজাহিদরা লাঠি হাতে ঘাঁটি পাহারা দিতেন। রাতের প্রহরী মুজাহিদ বন্দুক হাতে নিয়ে পাহারা দেয়ার বদলে লাঠি হাতে সতর্ক থাকতেন। কারণ তাঁদের কাছে বন্দুক ছিলো না।

আফগানরা যখন নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেলো এবং বিশ্বকে নিশ্চিতভাবে বোঝাতে পারলো যে তারা রাশিয়াকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে, তখন পশ্চিমা দেশগুলো বললো, এই জাতির তো সম্মান পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সুতরাং হে পাকিস্তান, তোমরা ওদের সাহায্য করো। কোনো বাধা নেই। হে সৌদি আরব, তোমরাও ওদের সাহায্য করো। কোনো সমস্যা নেই। হে বিশ্ব, তোমরা সবাই ওদের সাহায্য করো। সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার নিশ্চিত অধিকার ওদের রয়েছে। তখনই সৌদি আরব ও পাকিস্তান আফগানদের সহায়তা দিতে শুরু করে। এটা কখন? ১৯৮৩ সালের পর। অথচ তারা ইতোমধ্যে পাঁচ-পাঁচটি বছর তীব্র যন্ত্রণা ও দুর্দশায় কাটিয়েছে। পশ্চিমাদের ঘোষণা শুনে তারা চাল পাঠাতে থাকে, আটা পাঠাতে থাকে। ব্যবসায়ীরাও আসতে শুরু করেন। সৌদি ও কুয়েত রেড ক্রিসেন্টের কথা যদি বলি—সৌদি রেড ক্রিসেন্ট আফগানিস্তানে প্রবেশ করে ১৯৭৯ সালে এবং ১৯৮১ সালে প্রবেশ করে কুয়েত রেড ক্রিসেন্ট। কিন্তু জিহাদের শুরুতে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো না। এরপর পর্যায়ক্রমে ব্যবসায়ীরাও আসতে থাকেন। মানুষ আফগানদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে শুরু করে। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হয়। আরবরাও আফগানিস্ত ানের প্রকৃত অবস্থা জানতে শুরু করে। সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়... আফগানরা বিজয়ী হয়।

মার্কিন ষড়যন্ত্র

পশ্চিমা দেশগুলো চেয়েছিলো আফগানিস্তানের ঘটনার মধ্য দিয়ে রুশ ভল্লুকের শক্তি নিঃশেষ করে দেবে, তাকে ক্ষতবিক্ষত করবে এবং উষ্ণ জল ও পেট্রোল-কূপগুলোর কাছে পৌছতে বাধাগ্রস্ত করবে। আমেরিকা পেট্রোল-কূপ স্পর্শ করতে চায় নি। আমেরিকা জানে পেট্রোল-কূপের নাগালে যাওয়া

যে-পথ তা উন্মুক্ত। কারণ, ট্যাঙ্কবহর নিয়ে কান্দাহার থেকে পেট্রোল-কূপের কাছে পৌঁছতে মাত্র দুই দিনের পথ। কান্দাহার ও হেলমান্দ এবং আরব উপসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে আছে কেবল বেলুচিস্তানের মরুভূমি। পাকিস্তানের সীমানার আওতাধীন বেলুচিস্তানের মরুভূমি দেখে বোঝা যায় না যে এটা কি আসলেই পাকিস্তানের না রাশিয়ার। এখানকার বাড়িঘরগুলোতে লাল পতাকা ওড়ে। বেলুচিস্তান বিশ্ববিদ্যালয়েও ওড়ে লাল পতাকা। কোয়েটাতে যুবকেরা লাল শার্ট ও ক্যাপ পরে। গাড়িগুলোতেও ওড়ে লাল নিশান। ওখানে যতো উৎসব হয় তার সবই সাম্যবাদী [কমিউনিস্ট] বিপ্লবের উৎসব। ২৭ শে ডিসেম্বর তারা পালন করে 'আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীর প্রবেশ দিবস' উৎসব; ২৭ শে এপ্রিল (১৯৭৮) পালন করে তারা 'আফগানিস্তানে সাম্যবাদী বিপ্লব দিবস' উৎসব; 'লেনিন সাম্যবাদী বিপ্লব দিবস' উৎসব পালন করে ১৭ই অক্টোবর। এসব উৎসবই উদ্‌যাপিত হয় বেলুচিস্তানে। মিরি, পাকতি, মিনজাল প্রতিটি গোষ্ঠী সেখানে সাম্যবাদের বাচ্চা ফুটিয়ে চারপাশ ভরে ফেলেছে। ওখানে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্রছাত্রী সাম্যবাদে দীক্ষা নিয়ে বড়ো হয়ে উঠছে অথবা বলছে, সাম্যবাদ দীর্ঘজীবী হোক। গতবছর তারা বেলুচিস্তানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মুসলমান অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের বহিষ্কার করেছে । তাহলে বোঝা গেলো বেলুচিস্তান আসলে পাকিস্তানের নয়; বরং তা কমিউনিস্ট রাশিয়ার।

বেলুচিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হলো বিজেঞ্জো। সে টানা চুয়ান্ন বছর বেলুচিস্তানের ভেতরে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালনা করেছে।[৬৭] সে ১৯৩৫ সালে ভারত থেকে পড়াশোনা শেষ করে বেলুচিস্তানে যায়। ১৯৩৫ সাল থেকে গত বছর ১৯৮৮ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে। এই কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে আসছিলো : 'হে পাকিস্তান, তোমরা রাশিয়ার সামনে আরব উপসাগরে পৌঁছার পথ উন্মুক্ত করে দাও। কারণ, তোমরা সন্তুষ্ট থাকো আর অসন্তুষ্ট হও—তারা ওখানে পৌঁছবেই। সুতরাং তোমরা কপালের ঘাম ঝরিয়ে ক্লান্ত হয়ো না; বরং রাশিয়ার ট্যাঙ্কগুলোকে ভালোয় ভালোয় উপসাগরে পৌঁছতে দাও।' যারা পাকিস্তানকে এই উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিলো

---

[৬৭] এ-বিষয়ে একটি গ্রন্থ হলো *ইন সার্চ অব সল্যুশনস : অ্যান অটোবায়োগ্রাফি অব মির গাউস বক্স বিজেঞ্জো*, মির গাউস বক্স বিজেঞ্জো, ইউনিভার্সিটি অব করাচি এবং পাকিস্তান লেবার ট্রাস্ট, করাচি, ২০০২। গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান সম্পাদিত ত্রৈমাসিক *প্রতিচিন্তার* অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১ সংখ্যায় *বালুচদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিজেঞ্জোর আত্মানুসন্ধান* নামে একটি চমৎকার আলোচনা করেছেন কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান।

তারা কল্পনাও করতে পারে নি আফগান জিহাদের অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

আফগান জিহাদের কমান্ডাররা আমাদের যেমন বলেছেন, '১৯৮০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্যে তাদের কর্মপরিকল্পনা ছিলো আফগানিস্তান দখল এবং সেখানে জিহাদের সমাপ্তি ঘটানো। আর ১৯৮১ সালের মধ্যে বাস্ত বায়নের জন্যে কর্মপরিকল্পনা ছিলো বেলুচিস্তান দখল এবং আরব উপসাগরের পানিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। এ-কারণেই তারা ফারাহর শানদানাদ বিমানবন্দরকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। কারণ, বিমান ফারাহ থেকে আরব উপসাগরে পৌঁছতে মাত্র পনেরো মিনিট সময় নেয়। বিমান, ট্যাঙ্ক, সেনা—সবকিছুই প্রস্তুত ছিলো উপসাগরে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে।'

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপ্রস্তুতিতে আমেরিকা খুব ভয় পেয়ে যায়। তখন তারা যে-বিষয়গুলো চাচ্ছিলো তা সুস্পষ্ট :

১. রাশিয়া যাতে আরব উপসাগরে পৌঁছতে না পারে কঠোরভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা;
২. রাশিয়ার যাবতীয় 'ক্যারিজমা ও কারামত' কাবুল ও হেলমান্দ নদীর আশেপাশেই ধুলো ও পাথরের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া;
৩. তৃতীয় যে-বিষয়টি তারা চাচ্ছিলো তা হলো আফগানিস্তানের প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন : হতাহতদের ছবি, এতিম বালক-বালিকাদের ছবি, বিধবা ও সন্তানহারাদের ছবি, বাড়িঘর ও আবাসভূমির ধ্বংসযজ্ঞের ছবি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে বিশ্ব-পরিমণ্ডলে রাশিয়ার সুনাম লুণ্ঠিতকরণ।

আমেরিকা যা চেয়েছিলো তা অর্জিত হয়েছে : রাশিয়ার 'ক্যারিজমা ও কারামত' ধূলিসাৎ হয়েছে; যুদ্ধ শুরু করার আগে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তাদের যে-ভাবমূর্তি ও সম্মান ছিলো তা বিনষ্ট হয়েছে; তাদের ক্ষমতা ও দাপট চূর্ণ হয়েছে।

আল্লাহর কসম, আমরা যখন ১৯৬৯ সালে ফিলিস্তিনে জিহাদ করছি তখন যদি রাশিয়া—সোভিয়েত ইউনিয়নের—নাম শুনতাম, শরীর কেঁপে উঠতো! রাশিয়া—সোভিয়েত ইউনিয়ন! পৃথিবীর বুকে কার দুঃসাহস আছে তাদের বিরোধিতা করে! এমনকি মানুষজনকে যখন বলতাম, ইসলামি দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত হবে, ইসলাম ও ইসলামের নীতি বাস্তবায়িত হবে, তারা বলতো, রাশিয়া এবং আমেরিকা যদি আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে তাহলে কীভাবে ইসলামি দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত হবে, ইসলাম ও ইসলামের নীতি বাস্ত বায়িত হবে!?

আফগান জিহাদের ভয়

রাশিয়া পরাজিত হলো। আমেরিকা তার শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়নের দম্ভ চূর্ণ হোক তা চাইলেও মুজাহিদদের হাতে তাদের শোচনীয় পরাজয় এবং মুজাহিদদের চরম বিজয় তারা কামনা করে নি। তাই তারা রাশিয়াকে শোচনীয় পরাজয় থেকে বাঁচাতে অনেক কৌশল অবলম্বন করেছে। তারা চায় নি মুজাহিদরা বিজয়ী হোক। কিন্তু তারা পারে নি। জেনেভার ষড়যন্ত্র-সম্মেলনও ছিলো রাশিয়াকে মুজাহিদদের কাছে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বিজিত হওয়া থেকে বাঁচানোর একটা প্রচেষ্টা। কেনো?... কারণ, কেউই চায় নি পৃথিবীর মুসলমানরা একটি বৃহৎ পরাশক্তির বিরুদ্ধে মুসলিম আফগান জাতির বিজয় নিয়ে গর্ব করুক।

আমেরিকা কয়েক বছর যাবৎ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে[৬৮] হত্যা করতে বা ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। তারা বলেছে, 'আপনি বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা না করলে আপনাকে কোনো ধরনের সহযোগিতা করবো না। আপনি নাগরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করুন যাতে তারা দেশের ভেতর থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে।' আমেরিকা জিয়াউল হকের সরকারকে নিয়ে আশঙ্কা করতো। কারণ, সেনাবাহিনী সাধারণত পাপাচারী হয়ে থাকলেও তাদের ভেতর কিছুটা সৈনিকসুলভ পৌরুষ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু নাগরিক সমাজ সেনাবাহিনীর চিন্তা-চেতনায় ভয় পায়। তারা কখনো যুদ্ধে যায় না, গুলি-অস্ত্র চেনে না। তাই তাদের ভয়টা সবসময় থেকেই যায়। মৃত্যুর অপচ্ছায়া তাদের বেষ্টন করে রাখে। যারা একটি বা দুটি বা তিনটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং মৃত্যু থেকে বেঁচে যায়, অনেক দিন পরেও এদের ভেতরে কিছুটা হলেও পৌরুষ থাকে। আত্মগরিমা ও আত্মসম্মানবোধ থাকে এবং অহমিকা ও প্রত্যাখ্যান-প্রবণতা থাকে। নাগরিক সমাজ যা করতে পারে তারা তা করতে পারে না।

এ-কারণেই আমেরিকা কয়েক বছর যাবৎ জিয়াউল হককে হত্যা বা ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করেছে। তারা যখন দেখেছে আফগান জিহাদ বিজয়ের পথে, তিনবছরব্যাপী অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে গেছে। তারা জিহাদ থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে ইহুদিরা এবং তাদের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ জিহাদ থামিয়ে দিতে দৌড়-ঝাঁপ অব্যাহত রেখেছে। ইহুদিরা আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে। জিমি কার্টার ও রিচার্ড নিক্সন এখানে এসেছিলেন। ইহুদিরা তাদের কাছে রিপোর্ট পেশ

[৬৮] মুহাম্মদ জিয়াউল হক। পাকিস্তানের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট। মেয়াদকাল ৫ জুলাই, ১৯৭৭ থেকে ১৭ আগস্ট, ১৯৮৮। এ-দিনই তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্ম ১৯২৪ সালের ১২ আগস্ট।

করেছে। কার্টার পোপের সঙ্গে দেখা করেছেন। বিশ্ব-ইহুদি এবং বিশ্ব-খ্রিস্টান সম্প্রদায় এই ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে যে তুরান অঞ্চল থেকে আবারও আফগান জাতির উত্থান ঘটবে এবং তারা গোটা বিশ্ব শাসন করবে।

তুরানেই তুর্কি জাতির গোড়াপত্তন হয়েছিলো। এটি তুর্কিস্তানের একটি অঞ্চল এবং আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এই তুরান অঞ্চল থেকেই উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছিলো। তারা পাঁচ শতাব্দীব্যাপী এক-তৃতীয়াংশ বিশ্ব শাসন করেছে। এই অঞ্চল থেকেই (চীন ও মঙ্গোলিয়া থেকে) মোগলদের উত্থান ঘটেছিলো এবং তারা বিশ্বের অধিকাংশ ভূখণ্ড শাসন করেছে। এ-অঞ্চল থেকেই চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব ঘটেছিলো। এসব কারণেই পশ্চিমা বিশ্ব ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ করছে।

আবুল হাসান আল-মাদানি বলেন, আমাকে যিনি আফগানিস্তানে নিয়ে এসেছেন তিনি বলেছেন, আমরা আমেরিকায় মধ্য এশিয়ার অঞ্চলগুলোর ওপর চার মাসের একটি কোর্স গ্রহণ করেছি। প্রফেসর দুই মাস এই অঞ্চলগুলোর ওপর বক্তৃতা করেছেন। আর বাকি দুই মাস শুধু আফগানিস্তান সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন। তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেছেন, এই অঞ্চল থেকে বিশ্ব-মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা অনেক।

'মদিনার পথে' গ্রন্থের প্রণেতা মুহাম্মদ আসাদ একজন ইহুদি প্রাচ্যবিদ ছিলেন এবং তাঁর নাম ছিলো লিওপোল্ড উইস (Leopold Weiss)। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর ইসলামগ্রহণ কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে। তিনি 'মদিনার পথে' গ্রন্থটি লিখেছেন। আসাদ আফগানিস্তানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি পায়ে হেঁটে আফগানিস্তানের গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি।' আফগান জিহাদের পর তিনি এই কথা বলেছেন। আরবের এক সম্মানিত ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, আমি মুহাম্মদ আসাদের পাশে একদিন বসেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছেন, 'আরবরা আফগানিস্তানের বিষয়টি নিয়ে নানা খেলা খেলছে। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র বিষয়টি নিয়ে তারা ছিনিমিনি করছে। আফগান জাতির প্রতি ভ্রূক্ষেপই করছে না তারা। পাত্তাই দিচ্ছে না। আরবরা যদি আফগানদের বিষয়টিতে মনোযোগ দিতো তাহলে গোটা বিশ্ব জয় করতে পারতো।' তিনি আরো বলেন, 'পৃথিবীর বুকে এই জাতির দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ-কারণেই গোটা বিশ্ব তাদের ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

একজন মার্কিন ব্যক্তি বলেন, 'আফগান জিহাদের বিজয়ে আমরা অনেক ভয় পেয়েছি। সত্যিই তা ভয় পাওয়ার মতো ব্যাপার।' তারা যখন জেনেভায় সম্মেলন করে এবং জিয়াউল হককে ঐ সম্মেলনের সিদ্ধান্তে সম্মতি জানিয়ে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে, তখন ভেবেছিলো কয়েক মাসের মধ্যেই আফগান জিহাদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে ফেলতে পারবে। কিন্তু জেনেভা

সম্মেলনের পর আল্লাহপাক এই জিহাদকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। ওই সম্মেলনের পর মুজাহিদরা যেসব বিজয় অর্জন করেছেন তা তার আগের কয়েক বছরের মধ্যে অর্জিত বিজয়ের তুলনায় কয়েক গুণ। সোভিয়েত বাহিনী যখন আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, মুজাহিদরা ভেবেছিলেন যে-মাসে রুশরা বেরিয়ে যাবে ঠিক সে-মাসেই নাজিবুল্লাহ সরকারের পতন ঘটবে। তাঁরা ভেবেছিলেন ফেব্রুয়ারি মাসেই আফগানিস্তানের মাটিতে কমিউনিস্ট শাসনের বিলুপ্তি ঘটবে। আসল কথা হলো, কমিউনিস্ট শাসন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো এবং তাদের মনোবলও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। এ-সময় রুশরা [তাদের সহযোগী] আফগানদের বিক্রি করতে শুরু করে। যে-বড়ো আফগান অফিসারটি বড়ো কমিউনিস্ট গোয়েন্দা গ্রুপে ছিলো এবং যার কুফরি ছিলো চরম পর্যায়ে রুশরা তাকে পনেরো ডলারে বিক্রি করে। যে-আফগান অফিসারটি কমিউনিস্ট গোয়েন্দা গ্রুপে ছিলো না তাকে বিক্রি করে দশ ডলারে এবং প্রতিটি আফগান কমিউনিস্ট সৈনিককে বিক্রি করে আড়াই ডলার থেকে পাঁচ ডলারে।[৬৯]

আফগান কমিউনিস্ট পার্টির মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। যদিও কমিউনিস্টরা, নাজিবুল্লাহ এবং তার সরকার তাদের শেষ চেষ্টাটুকু চালিয়ে যাচ্ছে। আরব বিশ্বের কমিউনিস্ট দলগুলো শেভার্দনাদজের (এডুয়ার্ড আমভ্রোসিয়েভিচ শেভার্দনাদজে)[৭০] কাছে রিপোর্ট পাঠাচ্ছিলো যে তারা যেনো অবশ্যই আফগানিস্তান ছেড়ে যেতে আরো বিলম্ব করে। কিন্তু শেভার্দনাদজে তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেন। আরব কমিউনিস্ট নেতারা শেভার্দনাদজেকে বলে, 'তাহলে তো আরব কমিউনিস্ট দলগুলো আপনাদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়বে এবং আপনাদের ওপর তাদের আর কোনো আশা-ভরসা থাকবে না।' কিন্তু শেভার্দনাদজে তাদের কথা শুনতেই অস্বীকৃতি জানান।

---

[৬৯] সোভিয়েত বাহিনী ১৯৮৯ সালে ১৫ই ফেব্রুয়ারি চলে যাওয়ার আগে তাদের সহযোগী আফগান কমিউনিস্ট সেনাদের মুজাহিদ ও অন্যান্য লোকদের কাছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে। যেখানে একটি গাধার দাম আড়াইশো ডলার সেখানে একজন সৈনিকের দাম আড়াই ডলার।

[৭০] Eduard Amvrosiyevich Shevardnadze: জর্জিয়ার বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ ছিলেন। ১৯৮৫-৯০ ও ১৯৯১ সালে তিনি তৎকালীন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গর্বাচেভের শাসনামলে তিনি অনেক সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর ১৯৯২ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০০৩ সালে রক্তপাতহীন গোলাপ বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। ২০১৪ সালের ৭ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাস্তবতা হলো, মুজাহিদরা এমন পর্যায়ে চলে আসেন যে তাঁদের ধোঁকায় পেয়ে বসতে শুরু করে... 'এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে[৭১] যখন তোমাদের উৎফুল্ল করেছিলো তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসে নি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্যে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলো ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।' [সুরা তওবা : আয়াত ২৫]

মুজাহিদরা স্পষ্ট বলতে শুরু করেন, 'দু সপ্তাহের মধ্যেই জালালাবাদের পতন ঘটবে। আমরাই কাবুলে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদ্‌যাপন করবো।' চারপাশের সবকিছু ইঙ্গিত দিচ্ছিলো যে কমিউনিস্ট সরকার আর ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহপাক জালালাবাদের বিষয়টি জটিল পর্যায়ে নিয়ে গেলেন, যাতে তিনি মুজাহিদদের শিক্ষা দিতে পারেন যে সাহায্য একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।

বাস্তবতা হলো, স্বাভাবিকভাবেই কাবুলের সরকারের জন্যে সাহায্য-সহযোগিতার স্রোত বয়ে গেলো। চতুর্দিক থেকে তাদের জন্যে সাহায্য আসতে লাগলো। অন্যদিকে আফগান জিহাদের সহায়তা কমে গেলো, এমনকি বন্ধ হয়ে গেলো। বন্ধু রাষ্ট্রগুলো থেকে আফগান জিহাদের জন্যে প্রাপ্ত ১৯৮৮ সালের সাহায্য-সহযোগিতার সঙ্গে যদি ১৯৮৯ সালের সাহায্য-সহযোগিতা মিলাতে চাই তাহলে কিছুতেই মিলানো যাবে না। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে মুজাহিদদের জন্যে ২৪০০ টন সামগ্রী আসে। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক (আল্লাহপাক তাঁর প্রতি দয়া করুন) জীবিত ছিলেন। কিন্তু ১৯৮৯ সালে মার্চ মাসে আসে মাত্র ১০০ টন সামগ্রী। আগের বছরের মার্চ মাসের তুলনায় তা চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। ১৯৮৮ সালের জুন মাসেও জিয়াউল হক জীবিত ছিলেন। সেই জুন মাসে তিনি মুজাহিদদের জন্যে ৭০০০ টন সামগ্রী পাঠান। কিন্তু ১৯৮৯ সালের জুন মাসে আসে মাত্র ৫০০ বা চারশো আটানব্বই টন সামগ্রী, যা আগের বছরের তুলনায় চৌদ্দ ভাগের এক ভাগ।

আর ওদিকে প্রতিদিন তিরিশটি বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী-বোঝাই বিমান কাবুল বিমানবন্দরে অবতরণ করছে। কমিউনিস্ট সরকারের জন্যে এ-বছরের [১৯৮৯] জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত আকাশপথে ৪০০০ ট্রিপ মালামাল এসেছে। তিন মাসে ৪০০০ ট্রিপ—এর মানে হলো বিমানযোগে প্রতিমাসে

---

[৭১] মক্কা বিজয়ের পরপরই (অষ্টম হিজরি) হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্র দুটির সঙ্গে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১২ হাজার মুজাহিদ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনী সুবিধা করতে পারে নি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই জয় লাভ করেছিলেন। তাঁদের সংখ্যাধিক্যে নয়, বরং আল্লাহর সাহায্যেই তারা সফলতা লাভ করেছিলেন।

প্রায় ১৪০০টি ট্রিপ মাল-সামগ্রী এসেছে। শুধু কাবুল নয়, বাগরাম বিমানবন্দরেও সামগ্রী এসেছে। ট্রান্সপোর্টট্যাঙ্ক এয়ারক্রাফ্‌টের মাধ্যমে এসব মালামাল পাঠানো হয়েছে। এগুলো এতোবড়ো বিমান যে ভেতরে করে ট্যাঙ্কও নিয়ে আসা যায়। যে-পরিমাণ সামগ্রী আফগানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, এতে রাশিয়া আফগানিস্তানের জন্যে প্রতিদিন সাত মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। এভাবে তারা দুর্বলচিত্ত আফগানদের কিনে ফেলতে চেয়েছে।
আমরা যদি তুলনা করি তাহলে বলতে পারি, মুজাহিদরা এখন মালামাল বহন করে নিয়ে আসা গাধা-ঘোড়ার ভাড়াও যোগাড় করতে পারছেন না। কমিউনিস্ট সরকারের জন্যে চারদিক থেকে বৃষ্টির মতো যে-পরিমাণ মাল-সামগ্রী আসছে তাতে আমরা কেবল ধৈর্যের তিক্ততাই অনুভব করতে যাচ্ছি।
এখন মুজাহিদদের মধ্যে ছোটো ছোটো বাক্স, ছোটো ছোটো কৌটা বিলানো হচ্ছে। প্রতিটি কৌটায় আছে নির্দিষ্ট পরিমাণ চিনি, চাল বা আটা এবং অন্যান্য বস্তু এবং কৌটার ওপর লেখা আছে : এটি এক সপ্তাহের জন্যে তিনজন মুজাহিদের জন্যে যথেষ্ট—মার্কিন জাতির পক্ষ থেকে আফগান জাতির জন্যে উপঢৌকন।
এখন উত্তরাঞ্চলেও একই সমস্যা। ওটা শহরে বাযরাক যুদ্ধ-এলাকা। ওখান থেকে আমাদের কাছে এক যুবক আসে। সে আমাদের মাহাদুল আনসার থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। সে আমাকে বলে, 'উস্তাদ, আল্লাহর কসম, তাঁরা এখন জিহাদের অস্ত্রই বিক্রি করে দেয়ার জন্যে প্রস্তাব করছেন। তাঁদের কাছে খাবার বলতে কিছু নেই। কয়েক বছর ধরে বৃষ্টি হয় না। জমিন শুকিয়ে ঊষর হয়ে গেছে। রাশিয়া থেকে দলে দলে পঙ্গপাল এসে বাদগিস ও ফারইয়াব এলাকা ছেয়ে ফেলেছে। এখন প্রকৃত অর্থেই মানুষ খাবার পাচ্ছে না। উত্তারাঞ্চলের বদখশান থেকে হেরাত কোথাও মানুষ খাবার পাচ্ছে না।'
ভাই আবুল জুনাইদ (আবু উমামা) আমাকে বলেন, 'রমযান মাসে আমরা প্রতিদিন ভাত খেতাম। রমযানের পর রাশিয়ার সীমান্তবর্তী ফারইয়াব যুদ্ধ ফ্রন্টের জন্যে সাহায্য-সহযোগিতা আদায় করতে আমি এখানে [পেশোয়ারে] ফিরে আসতে চাই। সে-সময় আমাদের কাছে সামান্যই টাকা-পয়সা ছিলো। আমি ফ্রন্ট-কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোনটা ভালো হয়—আমাদের কাছে যে-টাকা-পয়সা আছে তা কি ফ্রন্টের তহবিলে দিয়ে দেবো না এতিম, বিধবা ও দরিদ্র মানুষকে দান করে দেবো?" কমান্ডার বললেন, "ভাই, আল্লাহর কসম, আমাদের কাছে কখনো চাল কেনারও টাকা ছিলো না।" আমি বললাম, "কিন্তু রমযান মাসে যে আপনারা প্রতিদিন আমাদের ভাত খাইয়েছেন?" কমান্ডার বললেন, "আমি বাবুর্চিকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, প্রতিদিন আরব ভাইদের জন্যে যে-পরিমাণ চাল প্রয়োজন তা যেনো সে বাজার থেকে বাকিতে ক্রয় করে নিয়ে আসে। তাকে বলেছিলাম, রুটিগুলো

যেনো আপনাদের থেকে লুকিয়ে রাখে। আবু উমামা, তাই সত্য নয় কি?"
আমি বললাম, "হ্যাঁ।"'

আসলেই অবস্থা খুব ভয়াবহ। এখন আমাদের যে-বিষয়টি অজানা তা হলো—ওখানে বরফ পড়ছে, মুজাহিদদের কাছে খাদ্যসমগ্রী পৌঁছাচ্ছে না, যুদ্ধ-সরঞ্জামও পৌঁছাচ্ছে না। বিশেষ করে কাবুলের আশেপাশে তো নয়ই। কান্দাহারেও খাবার পৌঁছাচ্ছে না; পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী না থাকার ফলে যুদ্ধ-সরঞ্জাম যে-পরিমাণ তাঁদের কাছে যাচ্ছে তা নিয়ে বাগমান ও শুকরদারা পাহাড়ের ওপরে প্রতিরোধ-লড়াইয়ে টিকে থাকা যাচ্ছে না। এই মাসের মধ্যে আমরা যদি তাঁদের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম পৌঁছাতে না পারি তাহলে তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য হবেন। বাগমান ও শুকরদারা থেকে মুজাহিদদের পিছু হটে আসার মানে হলো কমিউনিস্ট সরকার অগ্রসর হবে এবং সে-অঞ্চল দখল করে নেবে। আগামী বসন্তের এপ্রিল মাসে অর্থাৎ ছয় মাস পর বাগমান ও শুকরদারা পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্যে মুজাহিদদের নতুন করে যুদ্ধ শুরু করতে হবে।

জিহাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা

আমরা সৌদি আরবে গিয়ে লোকজনকে বললাম, 'আপনারা আফগানিস্তানের জিহাদ ও মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতা করুন। তাঁদের জন্যে খাদ্য-সামগ্রী পাঠান।' তাঁরা বললেন, 'অর্থাৎ আপনি চাচ্ছেন আমরা আফগানিস্তানে আমাদের টাকা-পয়সা পাঠাই আর বুরহানউদ্দিন রব্বানি সেটা দিয়ে অস্ত্র ক্রয় করে হেকমতিয়ারের দলকে হত্যা করুক আর হেকমতিয়ার সেটা দিয়ে অস্ত্র কিনে শেষ করুক রব্বানির দলকে?' তাঁরা আরো বললেন, 'শুনুন আপনারা, তুখারের ঘটনার কথাই ধরুন। ওখানে কী ঘটেছে? একদিনে ২৮ জন কমান্ডারকে হত্যা করা হয়েছে। ওদিকে আহমদ শাহ মাসউদ একদিনে ৩০০ জনকে হত্যা করেছেন। পত্র-পত্রিকায় তো এভাবেই সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। মুজাহিদরা নিজেরাই তো এভাবে বিবৃতি দিচ্ছেন।' আমি তাঁদের বললাম, 'পত্র-পত্রিকায় মিথ্যা সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে এবং মুজাহিদরা মিথ্যা বিবৃতি দিচ্ছেন। যাঁরা এভাবে বিবৃতি দিচ্ছেন—চাই তাঁরা হিযবে ইসলামির সদস্য হোন বা জমিয়তে ইসলামির সদস্য হোন—অবশ্যই মিথ্যা বলছেন। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ঘরবাড়ি-ভিটেমাটি ধ্বংস করছেন। পাঁচ জনের বেশি কমান্ডার নিহত হন নি এবং আহমদ শাহ মাসউদ যখন সাইয়িদ জামালকে ধরেছেন, দশজনকেও হত্যা করেন নি।'

হিযবে ইসলামি ও জমিয়তে ইসলামির অনেক যুবক সদস্য পাওয়া যাবে যারা প্রচণ্ড একগুঁয়ে ও উত্তেজিত। এরা চায়, তাদের চোখ দুটি বন্ধ করতেই যদি অপর দলের সদস্যরা ধ্বংস হয়ে যেতো অথবা মাটি তাদের নিয়ে ধসে যেতো বা জমিন ফাঁক হয়ে যেতো এবং তাদের গিলে ফেলতো।

সাংবাদিকদের স্বভাবও একই রকম। বিশেষ করে বিবিসি—এটি পিচ্ছিল ও বহুরূপী সাপ। ভয়েস অব আমেরিকাও কিছু ব্যতিক্রম নয়। এরা এক দলের অফিস থেকে আরেক দলের অফিসে ছুটে বেড়ায়। সাইয়্যিদ জামালের কী হলো? আহমদ শাহ মাসউদের কী হলো? এখানে কী হলো, ওখানে কী হলো? কতো কাণ্ডজ্ঞানহীন, অপরিণামদর্শী ও হঠকারী ঘটনা তাঁরা ঘটান, কথা তাঁরা বলেন, লেখেন বা বিবৃতি দেন—এসব ঘটনা, কথা ও বিবৃতির পেছনে সাংবাদিকরা ছুটে বেড়ান।
এসব সংবাদ ও বিবৃতি মুসলিম বিশ্বজুড়ে জিহাদের সুনামের ওপর অনেক অনেক অনেক খারাপ প্রভাব ফেলেছে। তাঁরা বলছেন, এটা গৃহযুদ্ধ, এটা গৃহযুদ্ধ। দ্য নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌, ওয়াশিংটন পোস্ট, শিকাগো এক্সপ্রেস, গার্ডিয়ান, দ্য সানডে টাইমস—সব পত্রিকা গৃহযুদ্ধ গৃহযুদ্ধ বলে একই কথা জপতে থাকে। তাই মুসলিম বিশ্বেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সৌদি আরবের লোকজন তাই আমাদের বললেন, 'তাহলে আপনারা গৃহযুদ্ধ করছেন বলে বলবো না? অমুক কী বলছে শুনুন। তমুক কী বলছে শুনুন। হিযবে ইসলামির লোকেরা কী বলছে তাও শুনুন, জমিয়তে ইসলামির লোকেরা কী বলছে সেটাও শুনুন।' বিভ্রান্তিকর অবস্থা! হাসবুনাল্লাহ ও নি'মাল ওয়াকিল—আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক।
মানুষ আমাদের কথায় বিরক্ত বোধ করছিলো। আমি মক্কায় শায়খ বিন উসাইমিন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি তাঁর চাচাতো ভাইয়ের বাসায় ছিলেন। আমি সেখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন শায়খ? তিনি আমাকে মুবারকবাদ জানালেন। বললেন, 'আমি আফগান জিহাদের ব্যাপারে এক গোলমেলে অবস্থায় আছি। এ-কারণেই আমি ও-ব্যাপারে নীরব রয়েছি। সবকিছু আসলে আমার কাছে স্পষ্ট না।' বিন উসাইমিন যখন বললেন আমি ও-ব্যাপারে নীরব আছি, সৌদি আরবের কোনো ব্যবসায়ীই সাহায্য প্রদান করতে প্রস্তুত হলেন না। অবশ্য সামান্য কিছু তাঁরা হাতছাড়া করেছিলেন। পরে আবদুল আযিয বিন বায ও বিন উসাইমিন-এর বিবৃতি আফগান জিহাদের জন্যে সাহায্য-সহযোগিতার অনেক বড়ো ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলো। আমি বিন উসাইমিনকে বললাম, 'আলহামদুলিল্লাহ, জিহাদ ভালোভাবেই চলছে। মুজাহিদরা কাবুলের চারপাশে রয়েছেন। প্রতিদিনই সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে। কাবুল এখন গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। এর সমুদ্র-পথগুলোও বিচ্ছিন্ন। কাবুলের বিমানবন্দরগুলোও বিপর্যস্ত। আফগানিস্তানের সব বিমানবন্দরই বিপর্যস্ত। পত্র-পত্রিকা ও প্রচারমাধ্যমে যা প্রচার করা হচ্ছে সব মিথ্যা। তারা অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা চালিয়ে আফগান জিহাদকে ব্যর্থ

করে দিতে চায়। তার নেতৃত্বকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়।' আমি তাঁকে আরো বললাম, 'আপনারা কীভাবে জিহাদকে এই অবস্থায় রেখে তা ছেড়ে দিতে পারেন। কাবুলের ফটকে মুজাহিদদের নগ্ন-দেহ, নগ্ন-পা ও ক্ষুধার্ত রেখে কীভাবে আপনারা তাদের ত্যাগ করতে পারেন। এটা আপনাদের ওপর দায়িত্ব, আপনাদের ওপর আমানত। কম করে হলেও আপনারা মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করুন।' শায়খ বিন উসাইমিন বললেন, 'আল্লাহপাক আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।'

এরপর আমি শায়খ আবদুল মজিদ যানদানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমার কথাবার্তা শোনার পর তিনি বললেন, 'আল্লাহপাক আপনার বক্ষকে উন্মোচিত করে দিন যেভাবে আপনি আমার বক্ষকে উন্মোচিত করে দিলেন।'

তাঁরা ফিরে যান এবং বলেন, 'আফগানরা তো কিছুই চায় না।' আপনারা ভাবুন তো, তারা তাওহিদ বিষয়ক কিতাব গ্রহণ করতে চায় না। চিন্তা করে দেখুন, তারা শায়খ মুহাম্মদ আবদুল ওহ্হাব-এর লিখিত কিতাব গ্রহণ করতে চায় না। সৌদি আরবের আলেম-উলামা ও সাধারণ লোকজন এতে খুবই বিস্ময়বোধ করেন : কীভাবে একজন মানুষ শায়খ আবদুল ওহ্হাব-এর কিতাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে! সে কি মুসলিম!?

আফগানরা আমাদের সমস্যা-অসুবিধাগুলো বুঝতে চেষ্টা করতো না; তারা জানতোও না আমরা কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হই। আরবের লোকদের কাছে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে তা বলি। একটি লোক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে থেকে চাষাবাদের কাজ করে দিতো। ভালো মানুষটি ডাল চাষ করতেন। কৃষি-কামলা ডালের ফসল ফলিয়ে তা মাড়াই-বাছাই করলো। আসলে এই কামলাটি ছিলো খারাপ। একদিন সে ভালো লোকটির বাড়িতে হামলা চালালো। তাঁর পরিবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাড়ির মালিক পিস্ত ল হাতে বেরিয়ে এলেন। তিনি কামলাটিকে ধাওয়া করলেন এবং হত্যা করতে চাইলেন। কামলাটি একমুঠো ডাল হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। সে দৌড়াচ্ছে এবং তার পেছনে বাড়ির মালিকও দৌড়াচ্ছেন। লোকেরা দেখলো, একজন বেশ উত্তেজিত, চেহারা টকটকে লাল, আরেকজন তার থেকে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে, চিৎকার করছে এবং ভয়ে কাঁপছে। তারা জিজ্ঞেস করলো, 'কী ঘটনা?' কামলাটি বললো, 'একমুঠো ডাল। আমি তাঁর থেকে এই একমুঠো ডাল নিয়েছি বলে তিনি আমাকে ধাওয়া করেছেন এবং হত্যা করতে চাইছেন।' মালিক বললেন 'আমাদের এখানে কৃষকদের মধ্যে একটি প্রবাদ চালু আছে :

اللي يدري يدري واللي ما يدري بقول كف عدس

'যে জানে সে তো জানেই আর যে জানে না সে বলে "কারণ হলো একমুঠো ডাল।"'

তারা ভালো মানুষদের প্ররোচিত করে। উত্তেজিত করে তোলে। চিন্তা করে দেখুন, তারা আফগানিস্তানে তাওহিদ সংক্রান্ত কিতাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ওহাবিয়্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই আমরা বলি, যে জানে সে তো জানেই আর যে জানে না সে বলে কারণ হলো একমুঠো ডাল। [ফিলিস্তিনি কবি ইবরাহিম তাওকান মিসরীয় কবি আহমদ শাওকির বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেন]—

شوقي يقول وما درى بمصيبتي

قم للمعلم وفه التبجيلا

'শাওকি বলেন,—যদিও তিনি আমার সমস্যা বুঝতে পারেন নি—"গুরুর উদ্দেশে দাঁড়াও এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করো।"'

দুঃখের বিষয় হলো, তারা জানে না পাকিস্তান, আফগানিস্তানের পূর্ব এশীয় অঞ্চল, ইরান, এই এলাকাগুলো, তুরস্ক ও তুর্কিস্তানে ওহাবিয়া শব্দটা কী অর্থ বহন করে। এই শব্দ দিয়ে কী বোঝানো হয় সেটাও তারা জানে না। তারা জানে না এখনো পাকিস্তানে ওহাবিয়া-বিরোধী পুস্তিকা প্রচার করা হয়। এসব পুস্তিকায় লেখা থাকে : ওহাবিরা ইহুদিদের চেয়ে নিকৃষ্ট, খ্রিস্টানদের থেকেও নিকৃষ্ট; বরং এরা কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা জানে না, মক্কার পবিত্র কাবা শরিফের ইমাম আবদুল্লাহ বিন সাবিল যখন পাকিস্তানে এসেছিলেন, ওখানে কী ঘটেছিলো। তিনি ইসলামাবাদের এক মসজিদে লোকদের নামায পড়িয়েছিলেন। এই সংবাদ শুনে ওখানকার ব্রেলবিপন্থী নামকরা বিচারপতি শুজাআত আলি কাদেরি ফতোয়া দিয়েছেন, 'যারা আবদুল্লাহ বিন সাবিলের পেছনের নামায পড়েছে তাদের নামায বাতিল এবং তাদের স্ত্রী তালাক।' 'তাদের স্ত্রী তালাক' কথাটা বেশ গুরুত্ব বহন করে।

আরব থেকে যেসব যুবকেরা আফগানিস্তানে আসে তারা বিভিন্নভাবে ধাক্কা খায়। তারা নানান সমস্যা-জটিলতার মুখোমুখি হয়। তাদের সামনে পরিষ্কার পথ খোলা থাকে না। আবার তাদের যদি ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারীদের এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তাহলে হিতে বিপরীত হয়। উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়। তারা যদি মুসলিম সম্প্রদায়গুলোর স্বভাব-চরিত্র না জানে; তাদের মধ্যে কৃশকায় যেমন আছে, স্থুলকায়ও আছে, সৌভাগ্যবান যেমন আছে, দুর্ভাগাও আছে, বুদ্ধিমান যেমন আছে, নির্বোধও আছে, বন্ধুত্ব-ভাব যেমন আছে, শত্রুতা-ভাবও আছে, পরহেযগার যেমন আছে, পাপাচারীও আছে—এসব যদি তাদের জানা না থাকে তাহলে বিপদ অনেক। এই যুবকেরা আফগানিস্তান থেকে দেশে ফিরে গিয়ে খারাপ প্রচারণা করে। জিহাদের অনেক ক্ষতি করে।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আমরা নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত যে মুমিনদের জন্যে সাহায্য আসবেই এবং তারাই বিজয়ী হবে, ইনশাআল্লাহ।

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

'অবশেষে যখন রাসুলগণ নিরাশ হলেন এবং লোকেরা ভাবলো যে রাসুলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য এলো। এভাবে আমি যাকে চাই সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি প্রতিহত করা যায় না।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ১১০]

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

'নিশ্চয় আমি রাসুলগণকে ও মুমিনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে।' [সুরা মুমিন : আয়াত ৫১]

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

'আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হবো এবং আমার রাসুলগণও। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।' [সুরা মুজাদালা : আয়াত ২১]

এই পৃথিবীতে আমরা রাব্বুল আলামিনের ভাড়া-করা কামলা। আমাদের মুজুরি মানুষ থেকে নয়; আমরা মুজুরি পাবো দয়াময়ের কাছে। এখানকার এক দিন আমাদের নিজ দেশে এক হাজার দিনের সমান। দুঃখ-যন্ত্রণা যতো বাড়বে, পৃথিবী আমাদের জন্যে যতো সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠবে, সব সম্প্রদায় আমাদের দিকে তাকিয়ে যতো ভ্রূকুঞ্চিত করবে, হতাশা ও নৈরাশ্য যতো দাঁত খেলিয়ে হাসবে—এগুলো আমাদের প্রতিদান বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে। এগুলো দাবি করে যে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের পথে অগ্রসর হই। যখন আমরা হতাশ হয়ে পড়বো বা নৈরাশ্য আমাদের গ্রাস করবে, তার অর্থ হলো আমরা সাহায্য ও বিজয়ের দরজায় পৌঁছে গেছি। এটা আমাদের কাছে দাবি করে যে আমরা যেনো দুঃখ-দুর্দশায় আরো বেশি ধৈর্য ধারণ করি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্য-ধারণে প্রতিযোগিতা করো এবং সবসময় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ২০০]

আমরা এখানে আগন্তুক; কিন্তু আমরা এই ভূমির সন্তান। এটা ইসলামি ভূমি এবং এই যুদ্ধ ইসলামের যুদ্ধ। সুতরাং আমরা তার বেশি হকদার এবং উপযুক্ত।

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'এবং তাদের কী বা বলবার আছে যে আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না, যখন তারা লোকদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করে? তারা তার [কাবার]

তত্ত্বাবধায়ক নয়, শুধু মুত্তাকিগণই তার তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা অবগত নয়।' [সূলা আনফাল : আয়াত ৩৪]

মুসলমানরা সবাই এই জিহাদের অধিকারী

আমরা এই বিষয়ের অধিকারী। অধিকারী এবং উপযুক্ত। স্বার্থবাদী আফগানরা নয়, কমিউনিস্টরা নয়, ধূর্ত কৌশলবাজরা নয়, রক্ত ও সম্ভ্রম নিয়ে যারা ব্যবসা করে তারাও নয়, যারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে তারাও নয়—তাদের কেউই এই বিষয়ের অধিকারী নয়। কেবল মুত্তাকিরাই তার উপযুক্ত। সুতরাং আমরা এই বিষয়ের উপযুক্ত। আপনাদের অধিকাংশই আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করার জন্যে এখানে এসেছেন। জান্নাতে প্রবেশের অভিপ্রায়ে শাহাদাত অর্জনের জন্যে এসেছেন। এটা হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে না। আমরা যা চাচ্ছি তা সহজেই আমাদের কাছে এসে যাবে না। আমাদের ভাগ্য দয়াময়ের হাতেই রয়েছে। তিনি মহামহিম ও পবিত্র।

আমরা যদি আল্লাহর দীনের বিজয়ের লক্ষ্যে এসে থাকি, তাহলে খুব উপযুক্ত জায়গায় এসেছি যেখানে আল্লাহর দীনের বিজয়ের সম্ভাবনা অত্যধিক। এটাই হলো আফগানিস্তানের জিহাদ। আমরা যদি জান্নাত পাওয়ার জন্যে এসে থাকি তাহলে এটাই উপযুক্ত কেন্দ্র যার মধ্য দিয়ে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তবে আফগানিস্তানের বিষয়টিকে আমাদের একনিষ্ঠতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। আমরা যদি অধিক পুণ্যের আশায় এসে থাকি, তাহলে উপযুক্ত ভূখণ্ডেই এসেছি, যেখানে অনেক অনেক বেশি পুণ্য অর্জন করা সম্ভব। আফগানিস্তানের জিহাদের মাধ্যমে আমরা এই পূণ্য অর্জন করতে পারি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

قيام ساعة فى الصف للقتال فى سبيل الله خير من قيام ستين سنة

'আল্লাহর পথে লড়াইয়ের উদ্দেশে এক ঘণ্টা [সৈনিকের] সারিতে দাঁড়ানো ষাট বছর নফল নামাযের চেয়েও উত্তম।'[৭২] এটা বিশুদ্ধ হাদিস।

আল্লাহর পথে এক ঘণ্টা লড়াই করাকে ষাট বছরের ইবাদতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন—

رباط يوم فى سبيل الله كصيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا جرى عليه عمله الذى كان يعمل وأمن الفتان ويبعث يوم القيامة شهيدا

'আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারা দেয়া একমাস রোযা ও নামাযের চেয়ে উত্তম। কেউ যদি পাহারাদার থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে যে-আমল

---

[৭২] জালালুদ্দিন সুয়ুতি, জামিউল আহাদিস, হাদিস ১৫৩৩৮; কানযুল উম্মাল, হাদিস ১০৬০৯; হাদিসটি ইবনে আদি ও ইবনে আসাকির আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

করছিলো সেই আমলের সওয়াব তার জন্যে চলমান থাকবে, তাকে ফেতনা থেকে বাঁচানো হবে এবং কিয়ামত দিবসে সে শহীদরূপে উত্থিত হবে।'[৭৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন—

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها

'আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারা দেয়া পৃথিবী ও তার ওপরের সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম।'[৭৪]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে—

'আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারা দেয়া হাজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে শবে কদরে নফল নামায আদায় থেকে উত্তম।'[৭৫]

অমুক মালামাল চুরি করছে, অমুক অমুকের সঙ্গে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে, অমুক অমুকের সঙ্গে হানাহানি-মারামারি করছে—আপনি যদি এসব অজুহাত পেশ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া ভালো মনে করেন, নিঃসন্দেহে এটা সঙ্গত হবে না। আরবরা ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের, আফগানদের স্বভাব-চরিত্রও একরকম নয়। আর মানুষ তো মুনাফিক। সুতরাং যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে আল্লাহপাকের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো অজুহাত থাকতে পারে না। এটা আপনার কষ্ট ও কর্তব্য আরো বাড়িয়ে দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ

'সুতরাং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্যে দায়ী করা হবে এবং মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করো।' [সুরা নিসা : আয়াত ৮৪]

শুধু আপনি নিজে, আপনি যদি একা থাকেন, তবু আপনাকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। বারা বিন আযেব থেকে আহমদ যে-হাদিস বর্ণনা করেছেন তাতে এই বক্তব্য স্পষ্ট রয়েছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আবু ইসহাক, কেউ যদি একাকী থাকে, সে কি মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, সমস্ত মুশরিকদের ওপর? এটা কি নিজেকে ধ্বংস করা নয়? তিনি বললেন, না। বরং তা হলো [নিজের জন্যে] ব্যয়। কারণ, আল্লাহপাক তাঁর নবীর ওপর নাযিল কলেছেন, 'সুতরাং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্যে দায়ী করা হবে এবং মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করো।' সাহাবিরা সবাই এই বাহ্যিক অর্থ বুঝেছিলেন এবং সেটা গ্রহণ করেছিলেন।

---

[৭৩] জালালুদ্দিন সুয়ুতি, জামিউল আহাদিস, হাদিস ১২৬৭৩; ইবনুল মুবারক, কিতাবুল জিহাদ, হাদিস ১৮২; আবুল কাসেম আত-তাবরানি, আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস ৩১২৩।

[৭৪] সহিহুল বুখারি, হাদিস ২৭৩৫, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস ৩৬১৭।

[৭৫] জালালুদ্দিন সুয়ুতি, জামিউল আহাদিস, হাদিস ২৪৩৪৮; কানযুল উম্মাল, হাদিস ১০৫৬০।

عجب ربنا من رجل انكشفت فئته فعلم ما عليه فرجع فقاتل حتى قتل

'আমাদের প্রতিপালক এমন ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্যবোধ করেন, যার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সে তার কর্তব্য বুঝে নেয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যায়। তারপর নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করে।'[৭৬]

মানুষ আলজিরিয়ায় গেলো, কেবল আপনি একা থেকে গেলেন। মানুষ জর্ডানে ফিরে গেলো, কেবল একজন নদীর পেছন দিয়ে ফিলিস্তিনে ফিরে আসতে চাইলো বা একজন ইরাক থেকে সিরিয়ায় ফিরে আসতে চাইলো। একজনই ফিরে এলো, কারণ সে জিহাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইনশাআল্লাহ, হয়তো সে বিশ বছর পরে হলেও অমুক ভূখণ্ডে বা অমুক অঞ্চলে জিহাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। আল্লাহপাক তার জন্যে সহজ করে দেবেন।

এখানে জান্নাতের পথ খোলা আছে। পৃথিবীতে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্যে এখানে সবচেয়ে সুবিধাজনক, সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র আছে। আপনার কোনো অজুহাত থাকতে পারে না। 'দেখুন, অমুকে সম্পদ চুরি করছে, দেখুন, ওরা টাকা-পয়সা অপচয় করছে, দেখুন, ওরা উল্টাপাল্টা কাজ করছে—এসব কথা বলে আপনি আপত্তি দাঁড় করাতে পারেন না। আপনার ওজর থাকতে পারে না। কারণ, আল্লাহপাক বলেছেন, 'সুতরাং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্যে দায়ী করা হবে এবং মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করো।' [সুরা নিসা : আয়াত ৮৪]

আমার ভাইয়েরা, সর্বশেষ স্তরে—জিহাদের স্তরে—আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদানকারীদের ওপর যন্ত্রণা-দুর্দশা তীব্রতর হবে। ক্লান্তি-বিরক্তি বেড়ে যাবে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সাহাবিরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। সাহাবিদের বহুভাবে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে। নৃশংস নিপীড়ন করা হয়েছে। সাহাবিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের নির্দেশ দিন।' তিনি একটি দলকে হাবশায় [আবিসিনিয়া] হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁদের একটি কাফেলা[৭৭] হাবশায় হিজরত করেছিলেন। এরপর দ্বিতীয় দফায় হাবশায় হিজরত করেছিলেন তিরাশি জন। মুষ্টিমেয় সাহাবি মক্কায়

---

[৭৬] এই হাদিস দুটির উৎস আমি খুঁজে পাই নি।

[৭৭] তাঁরা নবুওতের পঞ্চম বছর রজব মাসে শুআয়বা বন্দর থেকে জাহাজে আরোহণ করে আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। এই কাফেলায় ছিলেন ষোলো জন : হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান, হযরত রুকায়্যা, হযরত আবু হুযায়ফা, হযরত সাহলা, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম, হযরত মুসআব বিন উমায়ের, হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ, হযরত আবু সালামা, হযরত উম্মে সালামা, হযরত উসমান বিন মাযউন, হযরত আমির বিন রবিআ, হযরত লায়লা বিনতে আবু হাম্‌সা, হযরত আবু সাবরা, হযরত আবু হাতিব বিন আমর, হযরত সুহায়ল বিন বায়যা এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.।

থেকে গিয়েছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিলো অল্প। তাঁদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন আরো বহুগুণে বেড়ে যায়। তাঁদের গিরিসঙ্কটে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। কুরাইশরা তাঁদের খাদ্য-পানীয় সংগ্রহের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়। ক্ষুধার জ্বালায় তারা জ্বলতে থাকেন । তৃষ্ণার আগুনে পুড়তে থাকেন। কুরাইশরা একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লিপিবদ্ধ করে কাবার দেয়ালে টানিয়ে দেয়।[৭৮] তিন বছর তাঁরা অবরুদ্ধ ছিলেন। এ-সময়ে তাঁরা এমন কি العلهز। [ইলহিয] পর্যন্ত খেয়েছেন। ইলহিয হলো পশমমিশ্রিত পশুমল বা রক্তমিশ্রিত[৭৯] পশম।[৮০]

উতবা বিন গাযওয়ান থেকে বর্ণিত : 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সাত-সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। গাছের পাতা ছাড়া আমাদের খাদ্যবস্তু কিছু ছিলো না। আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে গিয়েছিলো।' গাছের পাতা বলতে মরুভূমির গাছের পাতা বোঝানো হয়েছে। আপনারা মরুভূমির গাছ চেনেন। তিনি আরো বলেন, 'আমার একটি লুঙ্গি ছিলো, সেটি ছিঁড়ে দু টুকরো করলাম। তার এক খণ্ড সা'দ বিন মালিককে—মানে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাসকে—দিলাম আরেক খণ্ড আমি লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করলাম। সেদিন আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম আমির। আমি নিজের চোখে বড়ো এবং আল্লাহর চোখে ছোটো হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।'[৮১]

যখন আপনার ক্লান্তি-বিরক্তি বেড়ে যাবে, পরিবারের কথা খুব বেশি মনে পড়বে, চারপাশে সমস্যা-জটিলতা বেড়ে যাবে, আপনার উচিত হবে কুরআন

---

[৭৮] কুরাইশরা নবুওতের সপ্তম বছরের ১লা মুহাররম রাতে বনু কিনানার খায়ফে এক গোপন সভা আহ্বান করে স্থির করলো যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সমর্থনকারী আত্মীয়-স্বজন ও শিষ্যবৃন্দকে পূর্ণ বয়কট করে রাখতে হবে। তারা সবাই মিলে এই মর্মে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করলো। এই প্রতিজ্ঞাপত্রের লেখক ছিলো মনসুর বিন ইকরামা। এতে লেখা হলো : ১. মুসলমানদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক আদান-প্রদান, চলা-ফেরা, আলাপ-আলোচনা সব বন্ধ থাকবে। ২. কেউ তাঁদেরকে কন্যাদান করতে বা তাঁদের কন্যাগ্রহণ করতে পারবে না। তাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যাবে। ৩. যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো অবস্থায় তাঁদের যে-কোনো প্রকার সাহায্য করবে, সে অপরাধী হিসেবে কঠোর দণ্ডের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

[৭৯] আরবের অধিবাসীরা রক্ত খেতো। ক্ষুধার সময় উটের শরীরে সিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত বের করতো এবং পশমের সঙ্গে মিশিয়ে খেতো। এটাকে তারা বলতো ইলহিয। এছাড়া তারা পশুর অন্ত্র-আঁতড়ি রক্তে পরিপূর্ণ করে সেগুলো ঝলসে খেলো। 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্যে মৃত পশু, রক্ত হারাম করেছেন।' [সুরা বাকারা : আয়াত ১৭৩] এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগের ঘটনা এগুলো। দেখুন : শায়খ মুহাম্মদ তাহের বিন আশুর, আত-তহারির ওয়াত তানবির, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০।

[৮০] العلهز الشعر مع البعر أو الوَبَر بالدم.

[৮১] সহিহু মুসলিম : হাদিস ২৯৬৭।

তেলাওয়াত করা, যিকির-আযকার করা, রাতে নামায পড়া, নফল রোযা রাখা, জিহ্বা পবিত্র রাখা। কারণ, আল্লাহ যখন কোনো মানুষ থেকে প্রতিশোধ নিতে চান, তার জিহ্বাকে মুমিনদের ওপর লেলিয়ে দেন, ফলে তার ভালো আমলগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর অন্যদের খারাপ কাজগুলো তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় এবং তার হৃদয়ের মৃত্যু ঘটে। বিন আসাকির বলেছেন—

واعلم على أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار من نهشها معلومة، ومن أطلق لسانه على العلماء بالثلب أصابه الله بموت القلب

'জেনে রাখো, আলেম-উলামার গোশত হলো বিষাক্ত, যে [অন্যের] গোপন বিষয় ফাঁস করে বেড়ায়, তার গোপন বিষয় ফাঁস করার ব্যাপারে আল্লাহর নীতি বিদিত, যে-ব্যক্তি তার জিহ্বাকে আলেম-উলামার সমালোচনায় ব্যস্ত রাখে, আল্লাহপাক তার হৃদয়ের মৃত্যু ঘটান।'[৮২] তাহলে মুজাহিদদের গোশত সম্পর্কে আপনাদের কী ধারণা?

সুতরাং আপনাদের সতর্ক হওয়া উচিত। অনেক পুণ্য অর্জন করেছেন, অনেক সওয়াব হাসিল করেছেন। কিন্তু পেশোয়ারে সেগুলোকে ধূলিসাৎ করে দেবেন না। সংশোধনের নামে, বুঝে ফেলার নামে বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নামে অনর্থক কথা বলে নিজের পুণ্য ধ্বংস করবেন না। অমুক কমান্ডার, অমুক ব্যক্তি, অমুক বিষয়—এদের সম্বন্ধে অহেতুক কথা বলায় সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

নিজের ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকবেন। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لأن أرابط يوما في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود

'আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারা দেয়া আমার কাছে শবে কদরে হাজরে আসওয়াদের কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়া থেকেও প্রিয়।'[৮৩] মুমিন ও মুজাহিদদের সমালোচনা করে নানা কথা বলে আপনার এই মহাপ্রতিদান বিনষ্ট করবেন না। আরবে প্রবাদ প্রচলিত আছে :

رب كلمة تقول لصاحبها دعني

'অনেক কথা তার কথককে বলে আমাকে বলো না।'[৮৪]

---

[৮২] আবু যাকারিয়া ইয়াহয়া, আত-তিবইয়ান ফি বায়ানি আদাবি হামালাতিল কুরআন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১। ইবনে আসাকিরের পুরো নাম আবুল কাসেম আলি বিন হাসান বিন হিবাতুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন হুসাইন বিন আসাকির।

[৮৩] আবু সানাদ মুহাম্মদ, আওনুল ওয়াদুদ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯; মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, সিলসিলাতু আহাদিসিস্ সহিহা, হাদিস ২৮৫৭।

[৮৪] ফায়যুল কাদির আল-মানাবি, ষষ্ঠ খণ্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

وان الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار

'মানুষ এমন অর্থহীন কথা বলে যা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।'[৮৫]

সৎ ও সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন, মুমিনদের সহায়তা, জিহাদ ও শাহাদাতবরণে নিয়তের নবায়ন, পেশোয়ারে অবস্থান কমিয়ে দেয়া এবং বেশি বেশি যুদ্ধফ্রন্টে যাওয়া আপনার জন্যে আবশ্যক কর্তব্য। আমরা আপনাকে বলছি না যে আপনিই প্রথম ব্যক্তি যে কাফেরদের মোকাবিলা করবে। আমরা তা পছন্দ করি না—যদিও আমরা আমাদের ভাইদের জন্যে জান্নাত প্রত্যাশা করি—কিন্তু আমরা চাই আমাদের আরব ভাইরা আফগানদের মধ্যে থাকুক। তবে তারা আফগান ভাইদের কাছে আবেদন ও প্রার্থনার পর্যায়ে পৌছে যাবে না। কারণ আমরা খাবারে লবণের মতো। আমাদের সংখ্যা অল্প। তাই আমরা স্বাভাবিকভাবেই বাহ্য উপকরণের পৃথিবীতে নিজেদের সংরক্ষিত রাখতে চাই। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন—

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا

'আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু তার সময়সীমা অবধারিত।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪৫]

কিন্তু বাহ্য উপকরণ গ্রহণের অর্থ হলো কিছু সংখ্যক আরব আফগানদের বিরাট দলের সঙ্গে তাদের আক্রমণ, প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধে একত্রে থাকবে।

---

[৮৫] সহিহুল বুখারি, হাদিস ৬১১৩; কানযুল উম্মাল, হাদিস ৭৮৫৯; মুসনাদে আহমদ, হাদিস ৮৩৯২; আবু মুহাম্মদ আল-মিসরি, আল জামিউ ফিল হাদিস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭।

সিরাত থেকে শিক্ষা : দুই
বাহ্য উপকরণ গ্রহণ

আমি খবর পেয়েছি যে আমাদের কিছু ভাই শত্রুর অবস্থান থেকে তিনশো বা চারশো মিটার দূরে তাদের কামানের নিশানার আওতায় পরিখা খনন করে সেখানে অবস্থান করছিলেন। ফলে শত্রুর গোলা এসে তাঁদের আঘাত করে এবং তিন ভাই নিহত হন। এ-ধরনের যুদ্ধ বৈধ হতে পারে না; শরিয়তের দৃষ্টিতে এ-ধরনের যুদ্ধ কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। কোনোভাবেই জায়েয হবে না যে আমরা আমাদের ভাইদের শত্রুর সামনে এভাবে পরিবেশন করি। একটি গোলা তিনজনকে হত্যা করলো! কী আশ্চর্য! আমাদের অবশ্যই [যুদ্ধের] উপকরণ গ্রহণ ও অবলম্বন করার ব্যাপারে জবাবদিহি থাকতে হবে। তাঁরা শহীদ হবেন, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু উপকরণ গ্রহণের অর্থ হলো আমাদের অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহপাক নির্দেশ দিয়েছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا

'হে মুমিনগণ, তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো; তারপর দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও।' [সুরা নিসা : আয়াত ৭১]

আমরা যদি এমনভাবে গুলি বা কামানের মোকাবিলা করি যে কামানের গোলা বিস্ফোরিত হয়ে বা মেশিনগানের গুলি বিদ্ধ হয়ে আমাদের একদল নিহত হয়—শরিয়তের আলোকে এটা কিছুতেই জায়েয হবে না।

আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে আমাদের কিছু ভাই তাঁদের সাহসিকতা ও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার কারণে শত্রুর নিশানার মধ্যে অবস্থান করেন। তাঁরা শত্রু ও কমিউনিস্টদের বলেন, 'এখানে আক্রমণ করো, ওখানে আক্রমণ করো।' শরিয়তের দৃষ্টিতে এটা পাপাচার। অবশ্যই পাপাচার। নিহত হওয়ার জন্যে নিজেকে সঁপে দেয়া আপনার জায়েয হবে না, যদিও আপনি জানেন যে তাতে শত্রুর কিছুটা ক্ষতি করা যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, আমরা কখনো কখনো দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেবো। আমরা যদি তাদের আক্রমণ করতে চাই, সহসা বের হয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ করে ফিরে আসবো। কিন্তু তাদের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নিহত হওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকা কিছুতেই জায়েয হবে না। পৃথিবীর কোনোও সমরবিশেষজ্ঞ আপনাকে এ-ধরনের পরামর্শ দেবে না। শত্রুর সামনে এভাবে অবস্থান নেয়া সামরিক জ্ঞান ও যুক্তির বাইরে।

আমরা আত্মগোপন করে থাকবো, যখনই তারা চোখে পড়বে তখনই আক্রমণ করবো। আমরা যদি সাহসী আফগান ভাইদের মতো পদক্ষেপ

করতে চাই, যেমন তাঁরা শত্রুর মেশিনগান চালু হলেও মাটিতে শুয়ে পড়তে লজ্জাবোধ করেন—শরিয়তের আলোকে তা হবে পাপকাজ। কারণ এতে উপকরণ অবলম্বন করা হয় না। অবশ্যই আমাদের বুকে ভর দিয়ে হাঁটতে হবে এবং প্রয়োজনে অবশ্যই শুয়ে পড়তে হবে। অবশ্যই আমাদের ট্রেঞ্চ ও বাঙ্কারে অবস্থান করতে হবে। আমরা অবশ্যই বাঙ্কারের সংখ্যা ও গভীরতা বাড়াবো যাতে আমাদের ভাইদের রক্তের প্রতিটি ফোঁটা রক্ষা করতে পারি। যখন আমাদের লড়াই করতে হবে এবং লড়াইয়ের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে, আমরা যুদ্ধের জন্যে একটি সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করবো। একটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করে চারপাশে বালু দিয়ে দেয়াল তৈরি করবো। এরপর তাদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করবো। কিন্তু আমরা যদি এমনভাবে শত্রুর মোকাবিলা করি যে এদিকে আমাদের একজন মেশিনগানের পেছনে দাঁড়ালো, ওদিকে আমাদেরই একজন মেশিনগানের পেছনে দাঁড়ালো এবং আমরাই আমাদের হত্যা করলাম এটা তো বৈধ হবে না। এ-ধরনের যুদ্ধ কিছুতেই বৈধ হবে না। কেউ এটাকে যুক্তিসঙ্গত বলতে পারবে না যে যুদ্ধের ময়দানে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন সৈনিক অথচ তার সঙ্গে অস্ত্র নেই, খাবার নেই, যুদ্ধ-সরঞ্জাম নেই বা মুজাহিদদের কাছে এগুলোর কী মূল্য আছে? আমরা আফগানদের সঙ্গে কার ও ফার যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম। একদিন শত্রুদের বিশাল ট্যাঙ্কবহর এলো। সে-এলাকায় আক্রমণ করার জন্যে জঙ্গি বিমান আকাশ ছেয়ে ফেললো। আমরা সে-অঞ্চল ছেড়ে ফিরে এলাম। যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করতে এবং দলে স্থান নিতে এটা আমাদের প্রয়োজন ছিলো।[৮৬] আমরা লড়াইয়ের জন্যে ভিন্ন পথে এগিয়েছি এবং অন্য দিকে ঘুরে গিয়েছি। আত্মগোপন করে থেকেছি। নিজেদের গুনে দেখেছি এবং পরে আবার শত্রুর ওপর আক্রমণ করেছি। আমরা কি ট্যাঙ্কের মুখ থেকে সরে দাঁড়াবো না? জঙ্গি বিমানের গোলাবর্ষণ থেকে দূরে সরে যাবো না? যে-অঞ্চল শত্রুরা দখল করে নেবে, আমাদের উচিত হবে সে-অঞ্চল থেকে ফিরে আসা এবং তাদের উদাসীন করে ফেলা, পরে সুযোগমতো তাদের ওপর আক্রমণ করা।

আজকের দিনটিতে আমি শহীদদের কথা লিখছি। অর্থাৎ একটি গোলা আমাদের তিন ভাইয়ের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আফগানিস্তানে যে-দলটি জিহাদ করতে এসেছে, আরব বিশ্ব থেকে তাদের মধ্যে কয়জন আছে? আরব বিশ্ব থেকে কতোজন এসেছে? তাদের সংখ্যা এক হাজার। এক হাজার

---

[৮৬] আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ 'সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন বা দলে স্থান লওয়া ছাড়া কেউ তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহর বিরাগভাজন হবে।' [সুরা আনফাল : আয়াত ১৬]

মিলিয়ন থেকে এসেছে এক হাজার জন। মানে এক মিলিয়ন মুসলমান থেকে এসেছে মাত্র একজন। আমরা কি তাদের মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করবো? আমরা কি তাদের শত্রুর হাতে তুলে দেবো? তাহলে তো একটি গোলা এসে এভাবে খুব সহজে একসঙ্গে তিনজনের প্রাণ কেড়ে নেবে। এমনকি আমাদের হত্যায় শত্রুদের আরামপ্রিয় করে তুলবে।

আমরা চাই যে আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকুন, লড়াইয়ে অবতীর্ণ হোন এবং লড়াই চালিয়ে যান। আমরা ভালোবাসি এবং আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি তিনি যুদ্ধের ময়দানে আমাদের শাহাদাত দান করবেন। আল্লাহপাক যদি চান, আমরা শাহাদাতবরণ করবো। কিন্তু নিজেদের একটি দলকে শত্রুর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া বা শত্রুর কামানের গোলার আওতায় অবস্থান করা কিছুতেই জায়েয হবে না। কোনো সমরবিশেষজ্ঞ কখনো এ-ধরনের যুদ্ধের কথা বলেন নি।

মুজাহিদদের শিবির ও ঘাঁটি শত্রুর অবস্থানের পেছনে থাকবে। সবকিছু বিন্যস্ত ও উপস্থিত রাখার জন্যে আপনি প্রস্তুত থাকবেন। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিকল্পনা করবেন এবং ওত পেতে থাকবেন। তারপর হঠাৎ শত্রুর ওপর আক্রমণ করবেন। এসব এ-কারণে যে আমরা সংখ্যায় অল্প এবং আমাদের যুদ্ধ-সরঞ্জাম সামান্য।

জিহাদের নিয়তের উপস্থিতি

আমার ভাইয়েরা, আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন, কারণ প্রতিদান অনেক বিশাল এবং আমাদের বিজয়—ইনশাআল্লাহ—অবশ্যম্ভাবী ও অত্যাসন্ন। যখনই আমাদের কষ্ট, মনঃপীড়া, নিসঙ্গতাবোধ, ক্লান্তি, বিরক্তি বেড়ে যাবে, আল্লাহপাক আমাদের প্রতিদানও বাড়িয়ে দেবেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো ওজর আমাদের নেই। কেউ যদি জিহাদের ময়দানের সঙ্গে প্রতারণা করে, আফগানিস্তানের ভূমির সঙ্গে প্রতারণা করে, এই অভিপ্রায়ে যে সে এখানে আর ফিরে আসবে না তাহলে এটা হবে যুদ্ধ থেকে পলায়ন। আর যতোদিন কেউ আফগানিস্তানে বা তার আশপাশে থাকবে এবং তার অভিপ্রায় হলো আল্লাহ তাকে বিজয়ী করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, এমতাবস্থায় সে যদি এক বছর বা দুই বছরের ব্যবধানে পরিবারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্যে বাড়িতে যায় এবং আবার জিহাদে ফিরে আসার নিয়ত রেখে তার দেশের পথে বা পরিবারের কাছে মারা যায়, আল্লাহর অনুগ্রহে সে নিশ্চয় শহীদ হবে। কেউ যদি আফগানিস্তান ত্যাগ করা এবং জিহাদে ফিরে না আসার অভিপ্রায়ে বাড়িতে ফিরে যায় তাহলে সে যুদ্ধ থেকে পলায়নকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। সাতটি বড়োপাপের মধ্যে সে একটি করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তার কোনো ওজর থাকতে পারে না।

আমার ভাইয়েরা, আপনারা সবকিছু জেনেছেন, সুতরাং দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। আল্লাহপাক বলেছেন—

وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'আল্লাহর অনুগ্রহ আসবার পর কেউ তার পরিবর্তন করলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।' [সুরা বাকারা : আয়াত ২১১]

আমার ভাইয়েরা, আপনাদের আবশ্যক কর্তব্য হলো কুরআন তেলাওয়াত করা, যবান হেফাযত করা, নফল নামায ও তাহাজ্জুদ পড়া, বেশি বেশি যিকির-আযকার করা, ইসলামি গ্রন্থ পাঠ করা, মুমিনদের ভালোবাসা এবং তাদের সমালোচনা ও কটু কথা না বলা, তারা যেভাবেই আছে এবং যেখানেই আছে; তাদের সহায়তা করার নিয়ত রাখা।

এই ভূমি হলো আল্লাহপাকের সাহায্য পাওয়া এবং বিজয়ী হওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। আমরা আল্লাহর কাছে আকাঙ্ক্ষা করি যে তিনি আমাদের সবাইকে বিজয়ী করুন, আফগানিস্তানের মুজাহিদদের বিজয়ী করুন, তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করুন, তাদের মধ্যে সদ্‌ভাব সৃষ্টি করুন এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

'হে আল্লাহ, তুমি আমাদের নেতা মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার ও সঙ্গীবর্গের ওপর দয়া ও রহমত বর্ষণ করো।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'তারা যা আরোপ করে তা থেকে পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসুলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।'[৮৭]

ওয়া আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

---

[৮৭] সুরা সাফ্‌ফাত, আয়াত ১৮০-১৮২।